মরা নদী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম—তিনটাকা আটআনা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ক্ষয়িষ্ণু নির্য্যাতিত হিন্দু সমাজের

দরদী বন্ধুদের হাতে—

ভূমিকা

নির্য্যাতিত ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের অধঃপতনের অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ আছে—দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা এ সম্বন্ধে বহুবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপন্যাস লিখিতে বসিয়া নূতন করিয়া বলিবার আর কিছু নাই, তবুও মনে হয় যাঁহারা এ বিষয়ে চিন্তা করেন তাঁহারা সমাজের দুঃখ দৈন্য ও অভাবকে প্রত্যক্ষভাবে যেন দেখিতে সাহস পান নাই।

যে কোন গ্রামে গেলে আজ শোনা যায়—এইটা মোহনের ভিটা, ওটা নবীনের ভিটা, সেটা কেদারের ভিটা। তাহার সুপরিষ্কার অর্থ এই যে একদা এই সব ভিটা কলকোলাহলে মুখরিত ছিল কিন্তু আজ তাহা হয় জঙ্গলাকীর্ণ, না হয় নামান্তর গ্রহণ করিয়া অন্যরূপ পল্লীনামে অভিহিত হয়। এই সমস্ত ভিটায় যাহারা একদিন ছিল তাহারা আজ উজাড় হইয়া নির্ব্বংশ হইল কি করিয়া? হিন্দুসমাজ আগে যাহাদিগকে অনুন্নত রাখিয়া, যাহাদের উপরে নিভর করিয়া শক্তিশালী ছিল, আজ তাহারা নাই, তাই সমাজ-শৃঙ্খলার তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস লইলে দেখা যায় ইহাদের অনেকে বিবাহ করিতে পারে নাই, অনেকে বিপত্নীক অবস্থায় দিনাতিপাত করিয়া আপনার রক্তধারাকে জগতের মাঝে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে নাই।

আজও সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর মাঝে এই একই ইতিহাস চলিয়াছে। কন্যাপণ প্রথাহেতু দরিদ্র ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে নাই, অথবা বিপত্নীক বা অনূঢ় অবস্থায় কোন বালবিধবার সহিত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সমাজ তাহার গৃহকে অস্বীকার করে নাই, কোন রকম একটা অজুহাতে ক্ষমা করিয়াছে কিন্তু উহার সন্তানকে কখনও স্বীকার করে নাই—তাই হিন্দু-পল্লী ক্রমশঃ পোড়ো ভিটায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ

প্রথা এবং বিধবাবিবাহের অপ্রচলন, একসঙ্গে মহামারীর মত পল্লীর পর পল্লীকে শ্মশানে পরিণত করিয়া চলিয়াছে—সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু দুর্ব্বল হইয়া অত্যাচারকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম হইলে ইহা হয় ত সম্ভব হইতে পারিত কিন্তু অনুন্নত হিন্দুর গৃহ আজ বধূহীন অথচ গ্রাম বিধবা-প্রাচুর্য্যে কলুষিত।

যাহারা আজ নানাকারণে দেহকে পণ্য করিয়া সমাজের অঙ্গে পচনশীল ক্ষতের মত অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে তাহাদের কতজন হিন্দু এবং কেনই বা তাহারা গৃহকে ফেলিয়া আসিয়াছে তাহা জানিবার মত কোন নথিপত্র নাই, তবুও অনুমানে বলা যায় হিন্দু সমাজের দান সর্ব্বাধিক।

যে রোগীর হাত পা ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতেছে এবং মুখে অত্যুষ্ণ রক্তধারা প্রবাহ রহিয়াছে, তাহার অবস্থা যে আশাপ্রদ নহে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাপ একস্থানে পুঞ্জীভূত হইলে তাহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে বরং রোগের লক্ষণ বলা যায়। সমাজকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, হাত পা কাটিয়া ফেলিয়া বাঁচা চলিবে না, হাত পা'কে সবল স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলিতে হইবে। এ দুরূহ কার্য্যের ভার আপনাদের উপর—দেশবাসীর উপর ন্যস্ত আছে। সে কর্ত্তব্যকে অস্বীকার করা কাপুরুষতা মাত্র। যে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে পারে না, তাহাকে ঠেক্‌নো দিয়া কতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখা চলে? শক্তি কেহ কাহাকেও দেয় না, শক্তি অর্জ্জন করিয়া লইতে হয়।

এই উপন্যাসে ব্যক্তিগত মত ও অভিজ্ঞতাই বর্ণিত হইয়াছে—অপ্রিয় সত্য বলিবার মধ্যে শালীনতা না থাকিতে পারে কিন্তু পৌরুষ আছে।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৫২

বিনীত—
গ্রন্থকার

মরা নদী

ভোর রাত্রির শিশির-ভেজা হাওয়ায় গুরুচরণের ঘুম হালকা হইয়া আসিয়াছিল, পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলিয়া দেখে, তাহার পিতা যষ্ঠিচরণ তামাকু সাজিতেছে। গুরুচরণ সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিল।

ষষ্ঠী বলিল—গুরো, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, শিগ্‌গির বেরো, আমি গরু বের করে রেখেছি।

গুরুচরণ বাড়ীর ভিতরে চোখে মুখে জল দিতে যাইয়া দেখে, তাহার বালিকা স্ত্রী দিগম্বরী মাথায় ঘোমটা দিয়া, কোমরে আঁচল জড়াইয়া দুই হাতে উঠান ঝাট্‌ দিতেছে। রহস্য করিয়া গুরুচরণ তাহার ঘোমটা ফেলিয়া দিল। দিগম্বরী ক্রোধে চক্ষু পাকাইয়া বলিল—বদমাইস্‌, ইয়ারকি?

গুরুচরণ কহিল—ছিঃ তুই হ'লি গেরস্ত-বৌ। তুই, কার বৌ?

দিগম্বরী মুখ ভেংচাইয়া জবাব দিল—যার খুশী তার, তোর তা'তে কি?

গুরুচরণ আপন মনে বলিল—বেকুব, কিচ্ছু বোঝে না। তাহার রাগ হয়—দিগম্বরীর বয়স মাত্র বার, সে গুরুচরণের সঙ্গে তাহার রসঘন সম্বন্ধটার কিছুই বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চায় না। গুরুচরণ পঁচিশ বছরের জোয়ান, তাহার উন্মুক্ত উদার যৌবনের উচ্ছ্বাস দিগম্বরীর শিশু-মনের দ্বারে প্রহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

গুরুচরণ ভাল গান গাহিতে পারে—বারমাসী, বাউল, সারি, অষ্টক শোলক, সব গানেই সে সমান নিপুণ, অধিকন্তু সে একতারাও বাজাইতে

জানে। এই ক্ষুদ্র নন্দনপুরে তাই সে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এ গ্রামে কবি ও গায়কের সম্মানের একচেটে অধিকার একমাত্র তাহারই।

শীর্ণ ইছামতী নদীর পূর্ব্বতীরে এই গ্রাম। গুরুচরণের পূর্ব্বপুরুষগণ কবে এখানে আসিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস জানা নাই। পঞ্চাশ ঘর চাষী শূদ্র লইয়াই গ্রাম, অদূরে পূব-পাড়ায় কয়েক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস।

নদীর ধার দিয়াই মাঠে যাইবার পথ। গুরুচরণ লাঙ্গল কাঁধে, গরু খেদাইতে খেদাইতে মাঠে যাইতেছিল। নদী তীরে বটগাছের তলায় আসিয়া সে আপন মনেই গান ধরিল—

বিদেশেতে গেলি ও প্রাণ বন্ধু রে,
আমার অজানা বন্ধু না জানে সাঁতার রে—

এ গান গুরুচরণের স্ব-রচিত।

গ্রামের ভিতর হইতে একটা প্রশস্ত ভাগাড় নদীর সবুজ চরে আসিয়া নামিয়াছে। দুই পাশের ঘন বাঁশবন ঝুঁকিয়া পড়িয়া পথটিকে চন্দ্রাতপের মত ছায়াযুক্ত করিয়া রাখে। নদী তীর হইতে দেখা যায়, রাস্তাটা ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণ হইয়া বাঁশবনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গ্রামের ঝি-বৌ সন্ধ্যা-সকাল এই পথ দিয়া ঘাটে আসিয়া কলসী কক্ষে ফিরিয়া যায়, তাই এই গ্রাম্য পথটুকু, অনেক অতীত ইতিহাসের পুণ্যতীর্থ। এই পথের ধূলায় গ্রামের জন্ম, মৃত্যু, প্রেম-বিরহের অশেষ স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে। গ্রামের মণ্ডল ষষ্ঠিচরণ তাহার কিছু কিছু জানে—

একদল গ্রাম্য বধূ কলসীকক্ষে নদীর ক্ষীণ জলরেখার দিকে যাইতেছিল। গুরুচরণ গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া একেবারে তাহাদের

সামনে পড়িয়া গেল। গ্রামের সার্ব্বজনীন বৃদ্ধা রাঙাদি ছিলেন, তাই গুরুচরণ সুর করিয়া পরিহাস করিল—ও—ও রাঙাদি, ঐ দিন ঐ দিন ঐ দিন করে রে আমার সুদিন দিল না রাধা।

রাঙাদি খানিকটা তামাকের গুড়াযুক্ত পিচ্‌ ফেলিয়া বলিল—মর্ মুখপোড়া, তোর সুদিন দেব আমি!

গুরুচরণ কহিল—উহুঁ রাধা।

—আমি তোর রাধা?

—লোকে তাই ত বলে।

রাঙাদি ক্ষেপিয়া গুরুচরণকে তিরস্কার করিতে লাগিল কিন্তু গুরুচরণ হাসিতে হাসিতে চাহিয়া দেখে—ঘোমটার আড়ালে দু'টি বড় বড় কৌতুক-উজ্জল চোখ তাহারই মুখের পানে চাহিয়া আছে। চোখ দু'টির মালিকের মুখখানা স্বচ্ছন্দ যৌবনের লজ্জারুণ কোমলতায় অনিন্দ্য, দেহ প্রস্ফুট মঞ্জরীর সুবাস-মদির, কিন্তু সে নিরাভরণা-বিধবা।

গুরুচরণ ক্ষুদ্র একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিল—ও কে রাঙাদি? এ গ্রামের কোন বধূ বা কন্যা তাহার অপরিচিত হইতেই পারে না।

রাঙাদি বলিল—ওই রসিকের শালী! আহা, তার বৌ মরে যাওয়ার পরে কি কষ্টেই সে গেরস্থালি চালিয়েছে, হাত পুড়িয়ে খেয়ে চাষ-আবাদ দেখেছে। যা হোক শালীটি এসে যদি তার দুঃখ ঘোচে—

রাঙাদি কটাক্ষে কি যেন কহিতে চেষ্টা করিয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল—এই হাসিটুকু গুরুচরণের নিকটে সমস্ত প্রচ্ছন্ন কথাই সুস্পষ্ট করিয়া দিল—গ্রাম্য বধূগণও সবখানিই বুঝিয়া লইল।

গুরুচরণ বলিল—ঠাকুরঝির নামটি কি?

—কুসুম।

গুরুচরণ প্রলুব্ধ নেত্রে আর একবার কুসুমের মুখের পানে চাহিয়া

দেখিল—কুসুম ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। রাঙাদি বলিল—চল্ রে কুসুম, চল্—

বধূর দল ধীরে ধীরে নদীতে নামিতেছে—গুরুচরণ আর একবার ফিরিয়া দেখে কুসুমের শুভ্র পা দুইখানি সবুজ তৃণের গালিচা মাড়াইয়া চলিয়াছে।

গুরুচরণ গান ধরিল—আমার বন্ধুরে যে করিবে পার, দিব তারে আমি গলার হার—গানের মাঝে একবার ফিরিয়া গেলে কুসুম যেন ফিরিয়া আর একবার ফিক্ করিয়া হাসিল।

চলিতে চলিতে সে ভাবিল—রসিক তাহার চেয়ে সাত আট বৎসরের বড় হইলেও বন্ধু, সংসর্গের নৈকট্যে বয়সের দূরত্ব এখন তার নাই, কিন্তু রসিক তাহাকে একথা বলে নাই কেন? তাহার পর সে আবার ভাবে—কুসুমের মত সুন্দরী বাস্তবিকই এ গাঁয়ে নাই। চলিবার পথে, পদে পদে সেই দু'টি কৌতুকময় বিলোল আঁখির কথা তাহার মনে হয়, ওই চাহনির মাঝে কি মাদকতা, কি যেন একটা রহস্য মানুষকে উন্মনা করিয়া দেয়। কুসুম কেন ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া গেল? এ জীবনে গ্রামের সমস্ত ঝি-বৌকেই ত সে দেখিয়াছে কিন্তু এমন প্রগল্‌ভতা ত কোনদিন দেখে নাই। অথচ ওই দু'টি আঁখির আকর্ষণকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

চৈত্রের ধূসর মাঠ ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। গুরুচরণ একটু তামাক খাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল, আজ সে তামাকের সরঞ্জাম আনিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সূর্য্যের পানে চাহিয়া দেখে, ষষ্ঠীচরণের 'নাস্তা' আনিবার এখনও অনেক দেরী। অদূরে গ্রাম দেখা যায় কিন্তু যাইয়া

আনিতে সময় লাগিবে। সে কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু এ মাঠে আজ কেহ চাষ দিতে আসে নাই।

কিছুক্ষণ পরে মাঠের একপ্রান্তে একজোড়া লাল বলদ ও দীর্ঘাকৃতি একটি লোককে দেখিয়া সে বুঝিল—এ রসিক। রসিক তাহারই দিকে আসিতেছে।

রসিক নিকটবর্ত্তী হইলে ছুটিয়া গিয়া সে বলিল—দে ভাই হুঁকাটা, পেট ফুলে উঠেছে।

রসিক হুঁকাটা তাহাকে দিয়া অকারণেই বলিল—ও মাঠের পাঁচ কাঠা দু'চাষ হ'য়ে গেল, তাই এই দত্তমশার ভুঁইখানা ভাঙ্তে এলাম।

গুরুচরণ জবাব না দিয়াই অত্যন্ত আগ্রহে তামাক খাইয়া যাইতেছিল—মুখ নাক দিয়া একরাশ ধোঁয়া বাহির করিয়া দিয়া সে বলিল—ঘরে যে একটু লক্ষ্মীর কৃপা হ'য়েছে তা তামাকের স্বাদেই বুঝলাম।

রসিক রসিকতা কহিল—হ্যাঁ, লক্ষ্মী হঠাৎ কৃপা যখন ক'রেই ফেল্লেন, তখন আর গেরণ না ক'রে করি কি?

গুরুচরণ প্রশ্ন করিল—গেরণটা ক'রলে কেমন ক'রে সেইটেই বল না।

রসিক হাসিয়া বলিল—সবই শুন্‌বি। গুরুচরণের নিকট হইতে হুঁকাটা হাত বাড়াইয়া লইয়া সে আবার বলিল—বিয়ে ক'রতে কত চেষ্টা ক'রলাম, তা এক শ' টাকার কম আর হয় না। দত্তমশায় বলেন, পাঁচ বিঘে গিরফী দিলে তবে এক শ' টাকা দেবেন। পাঁচ বিঘে দিলে খাব কি! শ্বশুর বাড়ী গিয়ে দেখি কুসুম বেশ ডপ্‌কা হ'য়েছে—সেই কবে সাত বছর বয়সে ও বিধবা হয়েছে। দুই একদিন থাকি, ও দেখি কেমন যেন চায়, ফিক্ ক'রে হাসে—আমি ক্ষেতে কাজ ক'রতে ক'রতে গান করি। তারপর একদিন—

রসিক হাসিয়া ফেলিল। বলিল—এখন কি বলার সময়, আর

একদিন শুন্‌বি। ও আস্‌তে চাইল, শ্বশুরমশায়, শাশুড়ীও বল্‌লেন, ভালই ত—তা—ই।

গুরুচরণ হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—সেই ভাল।

অকস্মাৎ চাহিয়া দেখে ষষ্ঠিচরণ আসিতেছে। গুরুচরণ তাড়াতাড়ি বলদ দু'টিকে তাড়া দিয়া লাঙ্গলের মুঠা চাপিয়া ধরিল।

ষষ্ঠিচরণ 'নাস্তা' লইয়া আসিয়াছে। গুরুচরণ আইলের উপর বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল, ষষ্ঠিচরণ হুঁকা টানিয়া টানিয়া তামাকের আগুন রাখিতেছিল, হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—বৌমাকে কি ব'লেছিস্ গুরো?

গুরুচরণ অবাক হইয়া বলিল—কি? কি বলেছি!

ষষ্ঠি দন্তহীন মুখের অপ্রাকৃত শব্দ সহযোগে খানিক হাসিয়া লইয়া বলিল—জানি রে জানি। গুরুচরণ লজ্জিত নতমুখে ভাত খাইয়া যাইতেছিল। ষষ্ঠি তামাক টানিতে টানিতে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—কিচ্ছু বোঝে না, একেবারেই ছেলেমানুষ—না?

ষষ্ঠি হয় ত বা নিজের অতিক্রান্ত যৌবনের কথা ভাবিয়াই হাসিয়া উঠিয়াছে! তাহার বিবাহ হইয়াছিল আঠার বৎসর বয়সে, তখন স্ত্রীর বয়স ছিল তিন বৎসর, কি আগ্রহেই সে গুরোর মা'র বয়ঃসন্ধির অপেক্ষা করিয়াছে! সেও বালিকা বয়সে এমনি করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

ষষ্ঠিচরণ আড়চোখে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—বৌমা ত রাগ ক'রে খাবেই না, তা শেষে বুঝিয়ে বললুম—কিন্তু সোয়ামী কি, তা কি সে বোঝে! ষষ্ঠিচরণ আবার তেমনি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুচরণ পিতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার খাইতে লাগিল। ষষ্ঠি নির্ব্বিকার চিত্তে, চোখ বুজিয়া তামাকু সেবন করিতেছে এবং মাঝে মাঝে আনমনে একটু একটু হাসিতেছে। ষষ্ঠি আবার বলিল—চৈত পূজার আড়ং থেকে চিরুণী আর কাঁটা কিনে এনে দিলেই রাগ সেরে যাবে।

গুরুচরণ তবুও কিছু বলিল না। আহার সমাপনান্তে পিতার হাত হইতে হুঁকাটা লইতেই ষষ্ঠি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি হাল ধরছি, তুই জিরিয়ে নে—

ষষ্ঠি হাল চালাইতে আরম্ভ করিল, গুরুচরণ তাড়াতাড়ি হুঁকায় দুই টান দিয়া বলিল—তুমি ছাড়ো বাবা, ওই বড় বলদটা বড় পাজি।

ষষ্ঠি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু গুরুচরণ কোন বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি হালের মুঠা চাপিয়া ধরিল।

চৈত্রের তপ্ত দ্বিপ্রহরের ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠ খাঁ খাঁ করিতেছে—তপ্ত উনানের উপরে কম্পমান বায়ুস্তরের মত অদূরের পাণ্ডুর মৃত্তিকা যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। গুরুচরণ কপালের ঘর্ম্মকণা মুছিয়া আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল বেলা হইয়াছে। সে লাঙ্গল ছাড়িয়া রওনা দিল।

নদীর তীরে বটগাছের ছায়ায় বসিয়া সে বিশ্রাম করিতেছিল, পিপাসার্ত্ত বলদ দুইটি নদীতে জলপান করিতে গিয়াছে। গুরুচরণ লুব্ধনেত্রে একবার ঘাটের পানে আর একবার বাঁশবনে ঢাকা গ্রাম্য পথটির পানে চাহিল কিন্তু তাহা বিশুষ্ক প্রান্তরের মত জনহীন, তপ্ত মৃত্তিকার মত মমতাহীন। বলদ দুইটী আপন মনে গৃহের দিকে চলিয়াছে, তাহারাও

গৃহের স্নিগ্ধ আশ্রয়কে চিনিয়াছে। গুরুচরণ ক্ষুদ্র একটু দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া, লাঙ্গল কাঁধে তুলিয়া নিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া সে দেখে পিতা আহারান্তে তামাকু সেবন করিতেছে এবং তাহার সামনে বসিয়া নবীন বৈরাগী। নবীনের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, তাহার মাঝে ভিক্ষালব্ধ চাউল এবং কিছু ফল এবং ডান হাতে একটা একতারা। নবীনের বাড়ী অদূরেই, একাকী গ্রামের প্রান্তে সে তাহার কুটীরে বাস করে, কখনও গান করে কখনও ভিক্ষা করে, কখনও খোস গল্প করিয়া সময় কাটায়। নবীন বৈরাগী কোন কোন স্থানে নবীন পাগলা বলিয়াও খ্যাত।

গুরুচরণ লাঙ্গল রাখিয়া, পিতার নিকট হইতে হুঁকা লইয়া নবীনকে প্রশ্ন করিল—আজ কোন্ গাঁয় গিয়েছিলে?

নবীন কহিল—শ্যামপুর, চন্দনা, মঙ্গলগঞ্জ।

গুরুচরণ অকারণেই প্রশ্ন করিল—তার পর—

নবীন তাহার সম্বন্ধ নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া চলিল—শ্যামপুরের বসুবাবুরা আজ নগদ চার পয়সা খয়রাৎ ক'রেছে—

—কেন?

—বোসবাবুর বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক হ'য়েছে, এই বোশেখেই বিয়ে হবে। ফুটফুটে মেয়েটি; রাজা জমিদারের ঘরে যেমন রাজকন্যা জন্মায় এও তেমনিই হবে ত। ছোটকালে একরাশ ঝাকড়া ঝাকড়া চুল নিয়ে ও আমারই গান শুনতে আসতো, তারপর বড় হ'ল। দু'হাত এক কোষ চাল নিয়ে এসে বসে ফরমাইস ক'রে গান শুনতো—

বলিতে বলিতে নবীনের কণ্ঠস্বর যেন ব্যথিত হইয়া আসিয়াছিল, সে

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সহসা চুপ করিল। গুরুচরণ বলিল—তা'তে তোমার কি ?

নবীন হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—আমার আবার কি! তবে আর ত সে ভিক্ষা দেবে না, গানও শুনবে না। বিয়ে হ'লে কোথায় কোন দূর দেশে যাবে—মা'র কোলে ওকে কাঁদতে দেখেছি, আর আজ বড় হ'য়ে ও কোথায় যাবে—সে বাড়ীতে কে আর ভিক্ষা দেবে!

গুরুচরণ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—ভিক্ষা দেওয়ার লোকের অভাব হবে নাকি ?

—না, অভাব হবে কেন ? ভিক্ষা আমি পাব, তবে ভিক্ষার ঝুলিটা তাতে পূর্ণ হবে না। ওকে গান শুনিয়ে যেন আমার বড় তৃপ্তি হ'ত। ভিক্ষা ত সকলেই দেয়, গান কে শোনে! সে চলে গেলে আর গান শোনাবো কা'কে ?

গুরুচরণ বলিল—তাই ব'লে তার বিয়ে হবে না!

নবীন হাসিয়া বলিল—হবে না ত কি। বাপের বাড়ী বেড়াতে ত আসবে।

সে হাত পাতিয়া কলিকাটা লইয়া আনমনে টানিতে লাগিল। আশে পাশের গ্রামগুলি তাহার লোকজন, শিশু, বৃদ্ধ, গাছপালা, পথের ধূলাকে নবীন ভালবাসে, তাহারা যেন সহস্র বাহু মেলিয়া তাহাকে আকর্ষণ করে। কোথায়ও কাহারও অভাব হইলে তাহার মন ব্যথিত হইয়া উঠে, সে এই ক্ষুদ্র পারিপার্শ্বিক পৃথিবীটুকুর সবখানিকে চিরন্তন সুন্দর করিয়া পাইতে চায়।

নবীনের পাকা চুলগুলি খররৌদ্রতপ্ত বাতাসে কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সেগুলিকে সমান করিয়া, শুভ্র দাড়ির গোছাকে একত্র করিয়া সে আবার বলিল—চন্দনার মাঠের পারে, একটা বকুল গাছ

আছে দেখেছ? কতদিন সেই গাছের ছায়ায় বসে জিরিয়েছি, বিকেলে গ্রামের ছেলেমেয়ে এসে ফুল কুড়োতো। সে গাছটা কেটে ফেলেছে—ছায়াও নেই—ফুলের সাজি নিয়েও আর তারা আসে না।

নবীনের চোখ দুইটি আবার সজল হইয়া আসিতেছিল। গুরুচরণ বলিল—বকুল গাছ কেটে ফেলেছে, তাতে তোমার কি?

—আমার কি? কিন্তু কেউ ফুল কুড়োতে আস্‌বে না আর। তার ছায়ায় বসে জিরিয়ে নেওয়াও আর হবে না।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিল—নবীনদা, তোমার যত সব পাগলামি! তোমার শিউলি ফুলের গাছটা সেবার বর্ষায় মরে গেল, তুমি কেঁদেই অস্থির। গাছ ত চিরদিন থাকে না।

নবীন লজ্জিত হইয়া বলিল—যাঃ—কাঁদলাম আবার কবে? তবে ঠাকুরের পুজোটার জন্যে ফুল পাই কোথা এই ভেবে একটু—

—ভিক্ষার চালগুলো ঘুঘুগুলোকে দিয়ে খাওয়াও কেন?

নবীন বলিল—ওরা খেতেই ত আসে আমার উঠানে, নইলে আসবে কেন? ওরা আমার বন্ধু সব—

গুরুচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে স্নান করিতে যাইবে—নবীন বলিল—হ্যাঁ যাও বেলা গ'ড়ে গেছে, আমিও দু'টো রাঁধবো ত!

নবীন একতারাটায় একটা শব্দ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্নানান্তে গুরুচরণ আহারে বসিয়াছিল তাহার স্ত্রী ভাত দিতেছিল। গুরুচরণ আড় চোখে চাহিয়া বলিল—এই, বাবার কাছে কি ব'লেছিস

স্ত্রী একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিল—সব বলে দিয়েছি।

—বাবাকে বল্‌তে হয়, ঐ সব কথা ?

—আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিস্ কেন ?

—তুই যে আমার বৌ—

—বৌ, তাই ইয়ারকি দিবি ?

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিয়া বলিল—লক্ষ্মীছাড়ী, তুই কিচ্ছু বুঝিস্ নে। বৌএর সঙ্গে ত ইয়ারকিরই সম্পর্ক, তা জানিস্ ?

—তোর বাবা মা'র সঙ্গে ইয়ারকি দেয় ?

—ওরা যে বুড়ো হ'য়েছে তাই এখন দেয় না।

—থাক্, আমাকে আর বোকা বোঝাতে হবে না, আমি ওসব বুঝি।

গুরুচরণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে—বুঝিস্ তোর মাথা। লক্ষ্মীছাড়ী গরু কোথাকার—

বধূ তর্জ্জনী দোলাইয়া বলিল—আমাকে গালাগালি দিস্ ত এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠ্‌বো—

গুরুচরণ দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল—তা ত উঠবিই, আমার গুণের বৌ যে !

গুরুচরণের মা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—বৌমা, ভাত দেওয়া হ'ল ? এদিকে এসো।

বধূ দিগম্বরী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া চলিয়া গেল। গুরুচরণ রাগিবে না হাসিবে, বুঝিয়া পাইল না। এই মুখরা বালিকার সহিত সে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। তাহার পিতামাতাও সর্ব্বদাই দিগম্বরীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া থাকে। গুরুচরণ ভাত খাইয়া যাইতেছিল।

যষ্ঠি বৌমাকে ডাকিয়া বলিল—গুরো তোমার সোয়ামী, ওর সঙ্গে কি

ঝগড়া করে বৌমা, ওর সঙ্গেই তোমার ঘর ক'রতে হবে। ওই তোমার সব—

বৌমা জবাব দিল—তাই ব'লে যা তা ব'লবে? আমার সঙ্গে বাধায় কেন?

ষষ্টিচরণ আপন মনে হাসে, কোন প্রশ্ন করে না. নীতি বাক্যও বলে না; ষষ্টির স্ত্রী বলিল—বৌমা, তোমার কি বুদ্ধি সুদ্ধি হবে না? যার ঘর ক'রবে তাকে চিন্‌লে না। ঘরটাও ত বুঝলে না, কেবল ঝগড়াই কর—

দিগম্বরী বলিল—আমি ঝগড়া করি!

—গুরোও ঝগড়া করে, তবে সে ত তোমারই জন্যে—এই ধর তোমার সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় ক'রতে তার ত ইচ্ছে হয়।

—ওই নাকি আলাপ পরিচয়?

—তবে আবার কি?

ষষ্টিচরণ হাসে, বলে—তুমি পান ছেঁচে দাও একটা, দরকার নেই তোমার ও কথায়।

দিগম্বরীর অভিমান হয়—এত বড় সাক্ষাৎ অন্যায়েরও প্রতিকার হয় না দেখিয়া সে ভাবে, এ বাপ-মা তার নয় তাই। তাহার চোখ দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসে, এরা কেবল দেখিল সেই ঝগড়া করে, আর ওদের ছেলে যে কি অসভ্য তাহা তাহারা দেখে না। সে অভিমানে গুম হইয়া বসিয়া থাকে।

ষষ্টি বলিল—যাও বৌমা, তোমার কোন দুঃখ নেই। গুরোকে আমি আচ্ছা ক'রে আজ বকে দেব, সে ভারী অসভ্য হ'য়েছে।

ষষ্টি ও তাহার স্ত্রী পরস্পরের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিল। দিগম্বরী বোঝে না, তাহারা অকারণ হাসে কেন?

*

গুরুচরণ একটু ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে, বেলা আর নাই। গরু কয়েকটিকে 'জাব' দিয়া অবশ্য কর্ত্তব্যগুলি শেষ করিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে পূবের প্রদীপ্ত আকাশের কোণে সিলিউট্ নারিকেলগাছের পাশ দিয়া থালার মত চাঁদ উঠিয়াছে। গুরুচরণের বাড়ীর উঠানে, বারান্দায়, ঘরের চালে এবং অদূরে গৃহকর্ম্মরতা দিগম্বরীর গালে মুখে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। গাছের পাতায় চাঁদের আলো পড়িয়া ঠিকরাইয়া যাইতেছে। গুরুচরণ তাহার একতারাটা বাহির করিয়া আনিল, অনেকদিন ব্যবহার না করায় মাঝে ধূলা জমিয়াছে। গামছায় মুছিয়া তাহার কান মোড়াইয়া গুরুচরণ সুর বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে—একাগ্রমনে সুরের ঝঙ্কার শুনিতে শুনিতে হঠাৎ চাহিয়া দেখে দিগম্বরী কখন তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কথা কহিল না।

দিগম্বরী বলিল—একটা গান কর না।

গুরুচরণ মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই—এমনি করিয়া দিগম্বরী তাহাকে কখনও অনুরোধ করে নাই কিন্তু দ্বিপ্রহরের অভিমানের রেশটুকু তখনও সঞ্চিত হইয়াছিল তাই সে বলিল—বদমাইসের গান শুন্‌বি ?

দিগম্বরী ওষ্ঠ উল্টাইয়া বলিল—ও বাবা, দেমাক্ কত ? চাই না শুন্‌তে।

দিগম্বরী হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। গুরুচরণ অনুতপ্ত হইয়াছিল —একটা গান গাহিলেও হইত, ও যখন শুনিতে চাহিয়াছে, কিন্তু এখন আর তাহার উপায় নাই। এখন নিজের সম্মান বজায় রাখিয়া আর গান গাওয়া চলে না।

গুরুচরণ জ্যোৎস্নালোকিত দিগম্বরীর বালিকা দেহের পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণিক তাকাইয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রসিকের বাড়ী, বিশেষতঃ তাহার মাঝে নবাগতা ওই দু'টি সুন্দর চোখের মাদকতা তাহাকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টানিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহার কৌতূহল, সে আজ এমনি ফিক্ করিয়া একবার হাসিল কেন? তাহার গান শুনিয়া, না তাহার রসিকতাকে সে ঠাট্টা করিয়াছে। গুরুচরণ গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে তরুচ্ছায়ায় স্বল্পালোকিত পথে আসিয়া নামিল।

শীর্ণ পথরেখার উপর পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কপত্র মর্ম্মরিয়া উঠিতেছে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রালোক আসিয়া পড়িয়াছে। পথের দুই ধারে প্রতিবেশীর বাড়ী, রান্নাঘর হইতে সম্ভারের শব্দ ও গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে—কেদারের স্ত্রী কূপ হইতে জল তুলিতেছে, বালতিটা কূপের গায়ে প্রহৃত হইয়া ঠন্ ঠন্ শব্দ করিতেছে—কে যেন প্রশ্ন করিল—কোথায় যাও গুরুচরণ ঠাকুরপো?

গুরুচরণ মুখ তুলিয়া বলিল—এই যে বৌঠাকরুণ, একটু ওপাড়া যাই রসিকের বাড়ী।

—একটা গান কর না শুনি।

—ফিরবার মুখে আস্‌বো।

কেদারের স্ত্রী অর্থব্যঞ্জক ভাবে বলিল—হুঁ। তা আর আসবে কেন?

গুরুচরণ চলিয়াছে। রসিক বাড়ীর উঠানে বসিয়া ঝুড়ি বুনাইবার জন্য কঞ্চি চিরিয়া প্রস্তুত করিতেছিল। আলো নাই, কিন্তু জ্যোৎস্নায় বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, কাজেই অসুবিধা নাই। গুরুচরণ বলিল—রসিকদা কি কর? প্রশ্নটা অবান্তর।

ঝুড়ি নেই, একটা তৈরী করি।

গুরুচরণ কটাক্ষ করিল—একবার কি পাড়ায় বেরুতে নেই,

একেবারেই যে ঘরকুনো হ'য়ে গিয়েছ। এমন রাত, চরে বসে দু'টো গান ত ক'রতে পারতে।

রসিক হাসিয়া বলিল—একা ফেলে যাই কি ক'রে ?

গুরুচরণ অদৃশ্য রহস্যের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে সহসা কহিল—ঠাকুরঝি, পান তামাক দাও, তোমার বাড়ীতে এলাম।

রসিক সঙ্গে সঙ্গে বলিল—পান দে কুসুম, এক ছিলিম তামাকও—

গুরুচরণ বারান্দায় উঠিয়া তামাক সাজিতেছিল, কুসুম তামাকের ডিবাটা বাহির করিয়া দিল। মালসার আগুন তুলিতে তুলিতে গুরুচরণ চাহিয়া দেখিল, ঘরের মাঝে ল্যাম্প জ্বলিতেছে, তাহার শীর্ণ শিখা ও ধূম বাতাসে কাঁপিয়া উঠিতেছে—প্রচ্ছন্ন আলোয় বসিয়া কুসুম সশব্দে সুপারী কাটিতেছে।

রসিকের সামনে বসিয়া গুরুচরণ হুঁকা টানিতেছিল, কুসুম পান লইয়া উপস্থিত হইল। পান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গুরুচরণ কুসুমের হাতখানির ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত একটু স্পর্শ লাভ করিয়া কেমন যেন উন্মনা হইয়া উঠিল। রসিক বলিল—গুরোর সঙ্গে কথা বলিস্ কুসুম, ও ত আমার ভাইএর মত।

গুরুচরণ জ্যোৎস্নায় কুসুমের মুখখানি স্পষ্ট দেখিল। কুসুম বলিল—ও ত গান গায়—না ? কথাটা বলিল সে রসিককে, কিন্তু গুরুচরণের পানে চাহিয়া একটু হাসিল। গুরুচরণ লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল। রসিক কহিল—গান কর গুরো, কুসুম গান ভালবাসে।

কুসুম আবার হাসিয়া বলিল—পরাণ বন্ধু বিদেশেতে গেছে কিনা, তাই গান ত গাইতেই হবে।

রসিক বুঝিল না, কিন্তু গুরুচরণ বুঝিল সকালে এই গানটিই সে

গাহিতে গাহিত যাইতেছিল, এই গান শুনিয়াই কুসুম হাসিয়াছিল। রসিক বলিল—'পরাণ বন্ধু' গাইতে ফরমাস হ'ল তা হ'লে। গুরো সেইটেই আরম্ভ কর্।

গুরুচরণ গান গাহিতেছিল।

রসিক ঝুড়ি বুনাইতে বুনাইতে গুণ গুণ করিয়া গুরুচরণের সুরের অনুসরণ করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে অতি উৎসাহে ঝুড়ির উপরই তেহাই দিয়া নিজের স্ফূর্ত্তিকে প্রকাশ করিতেছে। কুসুম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল—"আমার অজান বন্ধু না জানে সাঁতার রে। আমার বন্ধুরে যে করিবে পার, দিব তারে গলার হার, আমি দান করিব সকলি আমার রে।"

কুসুম হয় ত দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, কবে কোন বিরহী প্রিয়া এমনি করিয়া তাহার অনভিজ্ঞ প্রেমিকের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কুসুম ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া, বঁটি ও তেঁতুল লইয়া রসিকের পাশে আসিয়া বসিল। জ্যোৎস্নায় বসিয়া সে তেঁতুলের বিচি ছাড়াইতেছিল!

গুরুচরণ একতারায় দীর্ঘ তিনটি আঘাত করিয়া তাহার গান সমাপ্ত করিল। রসিক উৎসাহে বলিয়া উঠিল—বাহবা। দাঁড়া তামাক সেজে আনি।

রসিক বারান্দায় তামাক সজিতেছিল, গুরুচরণ গামছা দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে অনুভব করিল কি যেন তাহার গায়ে আসিয়া পড়িল। হাতড়াইয়া দেখে তেঁতুলের বিচি, কুসুমের দিকে চাহিতেই কুসুম ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া একমনে তেঁতুল কাটিতে লাগিয়া গেল। গুরুচরণের কাছে এই একটু হাসি, ওই জ্যোৎস্নালোকে শুভ্রাম্বিত কুসুমের মুখখানি অত্যন্ত মোহময় বলিয়া মনে হইল। সুস্থ সবল যৌবনোজ্জ্বল দেহে অকস্মাৎ

যেন আজ নূতন রোমাঞ্চ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গুরুচরণ নিম্নকণ্ঠে কহিল—এ বুঝি গানের বকসিস্?

কুসুম মাথা নীচু করিয়াই কহিল—বকসিস্ চাই? পরাণবন্ধুটা কার?

—যে নেবে তার বলেই ত গান গাই—রসিক আসিয়া পড়িল কথাটা সমাপ্ত হইতে পারিল না।

রসিক বলিল—কুসুম, গান কি রকম শুন্‌লি?

কুসুম বলিল—বেশই ত।

রসিক গুরুচরণকে বলিল—গুরো সেই গানটা কর্‌ত—সেই বাবলা গাছে ঘুঘু—

গুরুচরণ প্রশ্ন করিল—রসিকদা,ও গানটা তোমার এত পছন্দ কেন?

রসিক শিক্ষিত সমালোচক নয় যে সে কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিবে, তাই সে শুধু কহিল—বড় মিঠে গান।

গুরুচরণ একতারায় ঝঙ্কার দিয়া গাহিল—

বাবলা গাছে ঘুঘু কাইন্দ্যা মরে,
ওরে আমার গাঁয়ের মরা নদীর চরে।

কুসুম বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—ও পারের ওই বাবলা গাছে?

রসিক বলিল—হাঁরে কুসুম, গুরোই ত গান বাঁধে। ও পারের বাবলা গাছে খয়রা ঘুঘু সব ডেকে ডেকে খুন হয়—

কুসুম অকারণেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। গুরুচরণ ও রসিক কেহই বুঝিল না কুসুম হাসিল কেন। গুরুচরণ আবার গাহিল—

ওরে বিদেশী মাঝি—
তুমি উজান বাঁকে পাল তুলে'দে যাও,ভাঁটার টানে রাইখো গো মনে—
চৈত্তির মাসে আমার কাঁদন ঘুঘুর চক্ষে ঝরে—

রসিক পুনরায় ঝুড়ি বুনাইতে বুনাইতে বলিল—কেমন শুন্‌লে ত?

কুসুম কথা কহিল না। যেমন অকারণে সে হাসিয়াছিল, তেমনি অকারণেই সে ব্যথিত দৃষ্টিতে একবার গুরুচরণের মুখের পানে চাহিয়া কহিল—ঘুম পাচ্চে, আমি শুলাম—

রসিক আপত্তি করিল না, আহারাদি সন্ধ্যার একটু পরেই শেষ হইয়া গিয়াছে। সে কহিল—যাও সারাদিন ত কাজ-কম্ম হ'য়েছে—

কুসুম চলিয়া গেল।

*

গুরুচরণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল ; হয়ত রহস্যময়ী এই কুসুমের চিন্তাই তাহাকে স্বপ্নাতুর করিয়া রাখিয়াছিল। এমনি করিয়া রহস্য করা, পরক্ষণেই ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিবার কোন সঙ্গত হেতুই সে বুঝিতে পারে না।

রসিক বলিল—শুন্‌বি গুরো ?

গুরুচরণ চমকাইয়া উঠিয়া বলিল—হেঁ।

কি তাহা সে প্রথমে বুঝিতে পারে নাই কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল, কুসুমের এখানে আসিবার ইতিহাস শুনিবার আগ্রহেই সে অযাচিত ভাবে আজ রসিকের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

রসিক গুরুচরণের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া বলিল—শোন্, শ্বশুর-বাড়ীতে যেয়ে ভাবলাম, যাক্ দিনকয়েক রাঁধা 'নাস্তা পানি' খেয়ে নি। তাই পালানের জমির 'গুঁজি' কাটি, আর থাকি। ওই বাবলা গাছের গানই গাই, কুসুম শোনে কেমন যেন হাসে, কেমন করে। ও ত বিধ্‌বে, আমিও তাই, ভাবলুম যদি ও আমার কাছে থাকে তবে হয়ত—

রসিক আপনমনে হাসিল ; গুরুচরণ বলিল—বটেই ত। তাতে ঘর যেয়ে সে শালী ত, কাজেই আশা আব্দারটাও করা যায়।

রসিক বলিল—একদিন ফিক্ ক'রে হেসে ও ব'ল্‌লে—তুমি ত বেশ

গাও। আমি ব'ললুম—তুমি ত বেশ শোনো। ও ফিক্ ক'রে হাসে। আমি একদিন পান দিতে এলে হাত ধ'রে ফেলে বল্‌লাম—চল্ কুসুম, আমার কাছে থাক্‌বি। ও বলে ধ্যেৎ কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নেয় না।

রসিক বিজয় গর্ব্বে আবার হাসিয়া উঠিল। ভালবাসার দ্বন্দ্বে যে নারীকে পরাজিত করিয়াছে একথা প্রকাশ করিতে না পারিয়া রসিক যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বিজয় অভিযানকে যদি কেহ সবিস্ময়ে তারিফ না করিল, তবে আরও অনেকের মতই তাহার এই জয় অপ্রয়োজনীয় এবং অগৌরবেরই হইয়া থাকিবে। সে বলিল—তার পর একদিন গোয়ালে ও বাছুর ধ'রে ছিল, আমি গোরু দুইছিলাম তখন আবার ব'ললাম, তা ও ব'ল্‌লে মা'র কাছে শোনো না।···শাশুড়ী ব'ললে ভালই ত, তোমাদের যদি মিল মিশ্ হ'য়েই থাকে তবে যাক্—তোমারও কষ্ট, আর ওর দিক তাকিয়ে আমারও কেমন গা শুকিয়ে আসে।

গুরুচরণ বলিল—কিন্তু—

রসিক বলিল—কিন্তু আবার কি? কুসুমের এমনি টান আমার ক'রে! রাতে এসে ব'লত—ওই গানটি কর, সে গানটি কর।

রসিকের এই নির্লজ্জ প্রকাশভঙ্গি ও নগ্ন সত্যবাদিতা কয়েকদিন আগে শুনিলেও হয়ত গুরুচরণ আনন্দ করিতে পারিত কিন্তু আজ সে ব্যথিত হইয়া উঠিল। কুসুম সম্বন্ধে এই উক্তি আজ তাহার নিকটে কটূক্তি বলিয়া মনে হইল—রসিক কুসুমকে ভুল বুঝিয়াছে। কুসুমের ওই স্বপ্নমদির চোখ দু'টি, তাহার সরল মুখখানি কিছুতেই এত নীচ অভিব্যক্তির আধার নয়। গুরুচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—যাই রসিকদা, রাত্তির হ'ল।

রসিক অর্দ্ধসমাপ্ত ঝুড়িটা দাওয়ায় রাখিয়া বলিল—হ্যাঁ যা, কাল কোন মাঠে যাবি ?

—ওই মোষমাথার বড় দাগে হাল দেব কাল।

গুরুচরণ চলিয়া আসিল।

অকারণেই মানুষের মন খারাপ হইয়া যায়। গুরুচরণের মন আজ তেমনি করিয়া অতি অকস্মাৎ ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তায় নামিয়া সে ভাবিল গ্রামের এই রাস্তা দিয়া, প্রাণীবহুল পথ দিয়া সে আজ যাইবে না, গ্রামের পূবের পাশে পণ্ডিতের 'দোয়াল' ঘুরিয়া, নদীর চর ঘুরিয়া সে বাড়ী যাইবে। এই জ্যোৎস্না রাত্রিটা কেবলমাত্র ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিতে সে পীড়া বোধ করিতেছিল—সে দোয়ালের ধার দিয়া পায়চলা পথেই রওনা হইল।

রৌদ্রতপ্ত বিশুষ্ক মাঠ এখন অপ্রচুর শিশির সিক্ত হইয়া যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। দূরে বৃক্ষশ্রেণী জ্যোৎস্নালোকে অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাথার উপর দিয়া বুভুক্ষিত বাদুড় উড়িয়া যাইতেছে, পড়শীর নারিকেল গাছের শিশির ভেজা পাতায় জ্যোৎস্না ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। গুরুচরণ গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল কিন্তু মন তাহার কুসুমের চারিপাশে স্বপ্নের জাল রচনা করিয়া চলিয়াছে।

কে যেন উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কে যায় ?

গুরুচরণ জবাব দিল—আমি গুরুচরণ, নবীনদা।

নবীন ডাকিল—আয় গুরো, এমন রাত্রে এখনই কি ঘুমোনো যায়।

গুরুচরণ শুষ্কপত্রের উপর পদধ্বনি তুলিয়া নবীনের সুপরিস্কৃত উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। নবীন একতারা হাতে করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছে—নবীন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায়ই গান করে, আজও হয়ত তাহারই জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। গুরুচরণ দাওয়ায় উঠিয়া

মাটির মোড়ায় বসিয়া পড়িল। নবীন কহিল—তোর ওখানে বসে আজ বড় ক্ষেতি হ'য়ে গেছে। ঘুঘু দু'টো আর পায়রা ক'টা রোজই ভাতের লোভে আসে, কিন্তু আজ এসে ফিরে গেছে।

গুরুচরণ হাসিল না। প্রশ্ন করিল—গান ক'রবে নবীনদা?

নবীন বলিল—হ্যাঁ, এমন রাত্রে কি ঘুমোনো যায়।

গুরুচরণ কলিকায় তামাক ভরিয়া আগুন তুলিতে লাগিল, নবীন তাহার উদার উদাত্ত কণ্ঠে আরম্ভ করিল—পরের জন্যে কাঁদেরে আমার মন! (আমি) পরের জন্যে পরকাল হারালাম রে, তবু না পেলাম পরের মন।

অতি পুরাতন গান—গুরুচরণ বহুদিন এ গান শুনিয়াছে কিন্তু আজ যেন এই ছত্রটি নূতন অর্থ, নূতন ব্যঞ্জনা লইয়া জীবনের গভীরতম সত্যের মত অতি অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গুরুচরণ দ্রুত ভাবিয়া চলিয়াছে।

নবীন আবার গাহে—চণ্ডীদাস আর রজকিনী, প্রেম ক'রেছে তারাই শুনি, তারা এক মরণে দুইজন মরে রে, এমন করে কয়জন।...তবু না পেলাম পরের মন।

গুরুচরণ ভাবিয়া চলিয়াছে—অতীতের সমস্ত স্মৃতি উল্টাইয়া সে দেখে নবীনদা তাহার চিরদিনই এমনি—এমনি শুভ্র দাড়ির মাঝে নিষ্প্রভ দুইটি করুণ চক্ষু, একতারা হাতে, গৈরিক শতছিন্ন আলখেল্লা পরিহিত একটি ভিখারী। গুরুচরণের জ্ঞান হইবার পর হইতে নবীনদাকে সে এই একই বেশে, একই রূপে জীবন নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়াছে, কিন্তু নবীনদা কেন এমন—এ প্রশ্ন তাহার মনে কোনদিন জাগে নাই। আজ অকস্মাৎ মনে হইল—নবীনদা কি তাহা হইলে পরের জন্যেই নিঃস্ব ভিখারী। এ গানের সঙ্গে কি নবীনের জীবনের কোন অতীত অধ্যায়ের নিবিড়তম সম্বন্ধ

রসিক অর্দ্ধসমাপ্ত ঝুড়িটা দাওয়ায় রাখিয়া বলিল—হ্যাঁ যা, কাল কোন মাঠে যাবি ?

—ওই মোষমাথার বড় দাগে হাল দেব কাল।

গুরুচরণ চলিয়া আসিল।

অকারণেই মানুষের মন খারাপ হইয়া যায়। গুরুচরণের মন আজ তেমনি করিয়া অতি অকস্মাৎ ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তায় নামিয়া সে ভাবিল গ্রামের এই রাস্তা দিয়া, প্রাণীবহুল পথ দিয়া সে আজ যাইবে না, গ্রামের পূবের পাশে পণ্ডিতের 'দোয়াল' ঘুরিয়া, নদীর চর ঘুরিয়া সে বাড়ী যাইবে। এই জ্যোৎস্না রাত্রিটা কেবলমাত্র ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিতে সে পীড়া বোধ করিতেছিল—সে দোয়ালের ধার দিয়া পায়চলা পথেই রওনা হইল।

রৌদ্রতপ্ত বিশুষ্ক মাঠ এখন অপ্রচুর শিশির সিক্ত হইয়া যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। দূরে বৃক্ষশ্রেণী জ্যোৎস্নালোকে অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাথার উপর দিয়া বুভুক্ষিত বাদুড় উড়িয়া যাইতেছে, পড়শীর নারিকেল গাছের শিশির ভেজা পাতায় জ্যোৎস্না ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। গুরুচরণ গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল কিন্তু মন তাহার কুসুমের চারিপাশে স্বপ্নের জাল রচনা করিয়া চলিয়াছে।

কে যেন উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কে যায় ?

গুরুচরণ জবাব দিল—আমি গুরুচরণ, নবীনদা।

নবীন ডাকিল—আয় গুরো, এমন রাত্রে এখনই কি ঘুমোনো যায়।

গুরুচরণ শুষ্কপত্রের উপর পদধ্বনি তুলিয়া নবীনের সুপরিষ্কৃত উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। নবীন একতারা হাতে করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছে—নবীন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায়ই গান করে, আজও হয়ত তাহারই জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। গুরুচরণ দাওয়ায় উঠিয়া

মাটির মোড়ায় বসিয়া পড়িল। নবীন কহিল—তোর ওথানে বসে আজ বড় ক্ষেতি হ'য়ে গেছে। ঘুঘু দু'টো আর পায়রা ক'টা রোজই ভাতের লোভে আসে, কিন্তু আজ এসে ফিরে গেছে।

গুরুচরণ হাসিল না। প্রশ্ন করিল—গান ক'রবে নবীনদা?

নবীন বলিল—হ্যাঁ, এমন রাত্রে কি ঘুমোনো যায়।

গুরুচরণ কলিকায় তামাক ভরিয়া আগুন তুলিতে লাগিল, নবীন তাহার উদার উদাত্ত কণ্ঠে আরম্ভ করিল—পরের জন্যে কাঁদেরে আমার মন! (আমি) পরের জন্যে পরকাল হারালাম রে, তবু না পেলাম পরের মন।

অতি পুরাতন গান—গুরুচরণ বহুদিন এ গান শুনিয়াছে কিন্তু আজ যেন এই ছত্রটি নূতন অর্থ, নূতন ব্যঞ্জনা লইয়া জীবনের গভীরতম সত্যের মত অতি অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গুরুচরণ দ্রুত ভাবিয়া চলিয়াছে।

নবীন আবার গাহে—চণ্ডীদাস আর রজকিনী, প্রেম ক'রেছে তারাই শুনি, তারা এক মরণে দুইজন মরে রে, এমন করে কয়জন।...তবু না পেলাম পরের মন।

গুরুচরণ ভাবিয়া চলিয়াছে—অতীতের সমস্ত স্মৃতি উল্টাইয়া সে দেখে নবীনদা তাহার চিরদিনই এমনি—এমনি শুভ্র দাড়ির মাঝে নিষ্প্রভ দুইটি সকরুণ চক্ষু, একতারা হাতে, গৈরিক শতছিন্ন আলখেল্লা পরিহিত একটি ভিখারী। গুরুচরণের জ্ঞান হইবার পর হইতে নবীনদাকে সে এই একই বেশে, একই রূপে জীবন নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়াছে, কিন্তু নবীনদা কেন এমন—এ প্রশ্ন তাহার মনে কোনদিন জাগে নাই। আজ অকস্মাৎ মনে হইল—নবীনদা কি তাহা হইলে পরের জন্যেই নিঃস্ব ভিখারী। এ গানের সঙ্গে কি নবীনের জীবনের কোন অতীত অধ্যায়ের নিবিড়তম সম্বন্ধ

আছে। হুঁকানিঃসৃত ধূমের মত নবীনদার অতীত জীবন তাহার নিকট রহস্যময় ও প্রচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইল।

গান সমাপনান্তে গুরুচরণ অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—তুমি এমন কেন নবীনদা।

নবীন প্রশ্নের ধারাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিল—এমন আবার কেমন রে গুরো?

গুরুচরণ বলিল—তুমি সারাজীবনই এমন গান কর আর পরের জন্যে, পশুপক্ষীর জন্যে কেঁদে মর? তোমার কি কোনদিন ঘর-সংসার আপনার জন ছিল না? তুমি কি এই গ্রামেরই লোক?

নবীন সহসা নীরব হইয়া গেল—ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া চাপিয়া নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া বলিল,—এ কথা আজ এতদিন পরে শুধালি কেন?

গুরুচরণ কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়াই বলিল—তোমার গান শুনে কেমন কথাটা মনে হ'য়ে গেল তাই।

নবীন বলিল—কারও সঙ্গে পীরিত করেছিস নাকি রে গুরো?

গুরুচরণের মুখখানা গৃহচ্ছায়ায় স্পষ্ট দেখা গেল না, তবুও নবীন বুঝিল গুরুচরণ প্রশ্নটা সরলভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। গুরুচরণ হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—এটা কি ব'ললে নবীনদা!

নবীন হাসিয়া বলিল—ভাল না বাসলে মানুষ পরের সম্বন্ধে এমন কথা জিজ্ঞাসা করে না। সত্যি ক'রে বল ত—

গুরুচরণ বলিল—তুমি যে কি বল। আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার ত উত্তর কিছু দিলে না?

নবীন বলিল—তুই ছেলেমানুষ, তোর কাছে সব কথা ত বলা যায় না, আর তুই তা বুঝবিও না।

গুরুচরণ অভিমানের সুরে বলিল—তুমি অবিশ্বাস্ কর আমাকে? আর তোমার আজ যা বয়েস তাতে ভয়েরই বা কি আছে?

নবীন ক্ষণিক নীরব থাকিয়া বলিল—তোর মাঝে প্রাণ আছে গুরো তা আমি জানি। আজকার দিনে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রে বিপদেই ফেলেছিস ভাই, আজ ত মিথ্যা কথা বলার উপায় নেই।

—মিথ্যা বলবে কেন নবীনদা, সত্যিই বল।

নবীন বলিল—তুই ত পুরুষ মানুষ, তুই ত মেয়ে মানুষকে ভালবাসিস, পীরিতের জন্যে সবই ক'রতে পারিস—বাড়ীঘর বাপমা বৌ সবই হয়ত ফেলে যেতে পারিস—না?

গুরুচরণ জবাব দিল না, সে মনে মনে হিসাব করিতেছিল কুসুমের জন্যে সে আজ এই সব ফেলিয়া যাইতে পারে কি না?

নবীন পুনরায় প্রশ্ন করিল—কেমন তাই কি না?

গুরুচরণ বলিল—হুঁ।

—কিন্তু জানিস মেয়েমানুষ কোনদিন পুরুষমানুষকে ভালবাসে না। বড় মাছ ধরেছিস ত? যখন বঁড়শীতে গেঁথে গিয়ে খুব ছুটোছুটি করে সেই সময়টাই সবচেয়ে আরামের, তার পরে যখন একেবারে নেতিয়ে পড়ে তখন? কিছুই না—তাই না?

—হুঁ।

—মেয়েমানুষ ঠিক অমনি করে বঁড়শীতে গেঁথে নিয়ে খেলা দেখে, যদি ছুটে যেতে পারিস তবে তোর ভাগ্যি আর যদি না পারিস তবে সেইদিন থেকেই পীরিতের কপাল ভাঙ্‌লো। তোর কাত্‌রানি দেখে সে হাসবে, আর আনন্দ দেখলে কাঁদবে! ও জাতকে কখনও বিশ্বাস করিস নে, আমল দিস নে।

গুরুচরণ কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল—তুমি ত বৈরাগী নবীনদা তুমি এত জান্‌লে কি ক'রে ?

নবীন স্বীকারোক্তি করিল—বৈরাগী ত আজ, চিরদিন ত আর ছিলাম না, তোদের বয়স ত একদিন ছিল। নবীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—বল না নবীনদা, তোমার কথা।

নবীন পুনরায় কলিকাটা ঢালিয়া ফেলিয়া, তাহাতে তামাক ভরিতে ভরিতে বলিল—বল্‌ছি রে গুরো—

নবীন হুঁকাটা টানিয়া টানিয়া এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া আবার টানিতে লাগিল। সম্ভবতঃ সে ভুলিয়া যাওয়া অতীতকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। নবীন অকস্মাৎ আরম্ভ করিল—তোদের বয়েস যখন তখনকারই ঘটনা। আমি ভদ্দর কায়স্থ ঘরেরই ছেলে, লেখাপড়াও কিছু শিখেছিলাম—আমাদের আদি বাড়ী পশ্চিমে ন'দের জেলায়। পাড়ায় তোদের জাতের একটা মেয়ে অমন ডপ্‌কা হ'য়ে উঠেছে—বিয়ে হ'য়েছিল দু বছর বয়সে কিন্তু তখন তার বয়েস সতর কিন্তু বিধবা। মা ছাড়া কেউ নেই, সেই আমাদের পাড়ায়, বামুন পাড়ায় ভারা ভেনে কোনমতে চালাত। ভরা নদীর মত ভরা যৌবন, আর অমন সুশ্রীচেহারা ভদ্দরের ঘরেও হয় না। বর্ণ তার কাল কিন্তু মাজা পাথরের কালী-প্রতিমার মত —নাম তার ছিল রঙ্গিনী।

নবীন হুঁকাটী গুরুচরণের হাতে দিয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—পাড়ায় পাড়ায় বৌ-ঝির সঙ্গে রঙ্গ করেই সে বেড়াত। আমি তখন এমনি গান ক'রে আর বাঁশী বাজিয়ে বেড়াই, বাপের ছেলে ভয়-ভরসা কিছুই নেই। জোছনা রাত্রে মাঠে বসে বাঁশী বাজাই। একদিন রঙ্গিনী জলের কলসী নিয়ে ফিরছে, রাস্তায় আমার দিকে তাকিয়ে মিচ্‌কি হেসে দাঁড়িয়ে রইল। ব'ল্‌লাম—ও কি রে রঙ্গিনী, কি হ'ল ? সে রঙ্গ

ক'রলে—তোমার নাকি বিয়ে? আমি ব'ললুম—কার সাথে? সে আবার ব'ললে—তোমার বৌএর সাথে। বাড়ী গিয়ে কত কি ভাবলাম, তার পরে কত কি ঘটল—

গুরুচরণ ব্যস্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করিল—কি?

—এই যা ঘটে। ঘাটে পথে সাঁজে সকালে দেখা হয়। কারণে অকারণে সে আসে, আমি যাই। সন্ধ্যার পরে পুকুরের পাড়ে কলসী কাঁখে দাঁড়িয়ে কত কথা বলে আর পাড়ার লোকে আমাদের নিয়ে জটলা করে। আমার বাবা মা আমাকে ভয় দেখান।···প্রায় মাস দশেক পরে একদিন এমনি জ্যোৎস্না রাত্রে, সে বারান্দায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলে, ইসারায় রাস্তার দিকে আস্‌তে ব'ল্‌লে—আমি এসে গাছের তলায় অন্ধকারে দাঁড়ালাম। রঙ্গিনী কি যেন ব'ল্‌বে কিন্তু ব'ল্‌তে পারে না, কেবল কাঁদে। অনেকক্ষণ পরে সে ব'ল্‌লে—যদি এই ক'রবে তবে আমাকে মজালে কেন? আমি দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষে ব'ললাম—আমি কি ক'রেছি। সে রাগে দুঃখে ব'ল্‌লে—কি ক'রেছ জানো না? এখন যে আমার মরা ছাড়া গতি নেই। আমি সবই বুঝলাম কিন্তু কি ক'রবো? তোদের বয়েসে, বাপ মা গ্রাম ছেড়ে কোথায়ও যাই নি—কি করি? ব'ল্‌লাম—রঙ্গিনী দাঁড়া, দু'টো তিনটে দিন পরে দেখ্‌বো—কিন্তু কথাটা একেবারে পাড়াময় ছড়িয়ে গেল।

নবীন কি ভাবিতে ভাবিতে একতারার কানে মোড়া দিয়া বলিল—তারপর বৈশাখ মাসে একরাত্রে কাল-বোশেখীর ঝড়ে গাছপালা পড়তে আরম্ভ ক'রল। রঙ্গিনীর মা তখন নেই, তার ঘরের মাঝে আমি আর সে, মড় মড় 'করে ঘর পড়লো মাথার উপর, সে ব'ললে—চল। —কোথায়?—বংশীদাস বাবাজীর আখড়ায়। দক্ষিণে দশ ক্রোশ দূরে তার আখড়া। ব'ললাম—চল।

উপরে কালো আকাশ, নীচে গাঢ় অন্ধকার। তার মাঝে সদর রাস্তা ছেড়ে পায়ে চলা সরু পথ দিয়ে মাঠের পথে আমরা চল্‌লাম। মাঝে মাঝে আকাশটা চিড় খেয়ে ফেটে যাচ্ছে। ধরা পড়ার ভয়ে ভাল রাস্তা দিয়ে যাবার উপায় নেই। গভীর রাত্রে এক গাছের নীচে জিরোতে ব'সে রঙ্গিনী আমার হাত ধ'রে ব'ললে—নবীন, আমাকে কোনদিন ফেলে রেখে পালাবে না বল। তার ভিজে মাথায় ভিজে চুলের উপরে হাত রেখে ব'ল্‌লাম—কোথায় যাব? ফিরে যাওয়ার পথ ত আমার বন্ধ। দরকার ছিল না তাই প্রশ্নটা উল্টো ক'রে আর করি নি। অন্ধকার রাত্রে, ভিজা কাপড়ে, ভিজা চুলে, আমার কোলে মাথা দিয়ে সে জিরোতে আরম্ভ ক'রলে। রাত্রি শেষ হ'য়ে আসতেই আমরা আবার উঠি, আবার চলি।

বংশীবাবার আখড়ায় আমরা ভেক নিয়ে রইলাম। আমি রোজ ভিক্ষা করি, রঙ্গিনী আখড়ায় থাকে, আর ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরকে দিনের মধ্যে সাত বার লেপে পুছে পরিষ্কার করে। রঙ্গিনী গান গায়, ঠাকুরের নাম করে আমার সঙ্গে। বংশীবাবা রঙ্গিনীকে ভজন শেখান। এমনি ক'রে এক বছর, দু'বছর চলল, যার জন্যে সে পালিয়ে এসেছিল, সে কিন্তু বাঁচল না।

—একদিন অমনি ঝড় বৃষ্টির রাত্রে ফিরতে পারি নি, দূরে এক গ্রামে অতিথি থেকে রাতটা কাটাতে হ'ল। পরদিন আখড়ায় ফিরে দেখি, খালি ঘর—রঙ্গিনী নেই, ল্যাম্পোটা তখনও জ্বলছে। বাবাজীকে শুধোলাম, তিনি হেসে ব'ল্‌লেন—জানি না ত!

পরে শুনেছি, সে বাবাজীর কাছেই আছে। আমি একতারাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, বহু দেশ ঘুরে ঘুরে শেষে এখানে এসে কুঁড়ে বেঁধে ফেল্‌লাম।

গুরুচরণ বলিল—কেন ?

—এত গ্রাম থাকৃতে এখানে এসে কুঁড়ে বাঁধলাম কেন ? সে কথায় দরকার নেই গুরো, তবে এ গ্রাম ছেড়ে আমার আর যাওয়ার উপায় নেই। রঙ্গিনী আমাকে ছেড়ে গেছে সে আজ দু' কুড়ি বছরের কথা, কিন্তু আমি কাউকে ছাড়ি নি, এ কুঁড়ে আমার ছাড়বার উপায় নেই।

নবীনের অতীত জীবন যেমন রহস্যময় ছিল তেমনি রহিয়া গেল—এই ক্ষুদ্র রঙ্গিনীর অধ্যায় তাহার ভূমিকা মাত্র। নবীনের জীবনে কোথায় যেন পুঞ্জীভূত বেদনা আছে, গুরুচরণ তাহার সন্ধান পায় না।

নবীন হঠাৎ বলিল—ছাখ গুরো, একটা কথা বলি, যেদিন তুই ধরা দিবি সেইদিন সেও তোকে ছেড়ে যাবে। সোনার দাম কেন ?—তা পাওয়া যায় না বলে। বৌমা ত আমাদের বড় হবে, সে দিন দেখবি সব ভুল। পর কখনও আপন হয় না।

গুরুচরণ একতারাটী হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নবীন বলিল—হ্যাঁ, যা গুরো রাত্তির হ'ল।

রাত্রি গভীর হইয়াছে—ঘাসের উপর দিয়া চলিতে শিশিরে পা ভিজিয়া যায়। নদীর ধারের বৃদ্ধ বট গাছ জড়ের মত দাঁড়াইয়া আছে। সমস্ত গ্রামখানি গভীর রাত্রির নীরবতা ও রহস্যের মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন—দীর্ঘতম বাঁশের শীর্ষপ্রদেশ আকাশের গায়ে কালির আঁচড়ের মত স্থির হইয়া আছে। গুরুচরণ একাকী চলিতে চলিতে নদীর ওপারের দিকে চাহিয়া একবার দাঁড়াইল—ওপারের বাবলা গাছগুলি সবুজ চরের উপর প্রেতের মত দাঁড়াইয়া আছে—কুসুম ওই বাবলা গাছগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিল কেন ?

বাঁশবনে ঢাকা রাস্তাটী দিয়া চলিতে চলিতে গুরুচরণ আবার ভাবিল

অতি প্রত্যুষে কুসুম এই পথেই জল আনিতে যাইবে। দেখা হইলে হয় ত ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিবে।

গুরুচরণ নিঃশব্দে গৃহে ফিরিল।

গুরুচরণ প্রত্যুষে জাগিয়া আলস্যবশতঃ শুইয়াই ছিল, কিন্তু মনটা তাহার বিগত রাত্রির মদির স্বপ্নের রঙে রঙীন। কুসুমের সেই কয়েকটি কথা বার বার নানা অর্থে, নানা ইঙ্গিতপূর্ণ হইয়া তাহার কাছে কেবলই নূতন ও বিস্ময়কর মনে হইতেছিল। প্রশ্ন হইতেছিল—সে কেন এমন করিল? তেঁতুলের বিচি সে কি ইচ্ছা করিয়া ছুঁড়িয়াছে, না অসাবধনাতা হেতু আপনি ছুটিয়া আসিয়াছে। নবীনের অতীত জীবন সে ভুলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু উঠিতেই হইল। বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখে কূপের পাড়ে ঘটি ভরা জল, দিগম্বরী কোমরে আঁচল জড়াইয়া উঠান ঝাঁট্ দিতেছে। কোনদিন এমনি সময়ে মুখ ধুইবার জন্যে সে জলপূর্ণ ঘটি পায় নাই—দিগম্বরী হয়ত তাহাকে খুসী করিবার জন্যে জল ভরিয়া রাখিয়াছে। অন্যদিন হইলে গুরুচরণ খুশী হইত কিন্তু আজ কুসুমের জ্যোৎস্নাস্নাত দীঘল দেহখানির অস্পষ্ট স্মৃতি তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল—দিগম্বরীর এই সেবাটুকু তাহার অন্তরে কোন আঘাতই করিল না।

গুরুচরণ চলিয়া আসিল—দিগম্বরী ঝাঁটা হাতে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া গুরুচরণের প্রস্থান দেখিল। সে কিছুই বলিল না, হয় ত মনে মনে একটু দুঃখিতও হইয়াছিল। দিগম্বরী ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল—রাজ্যের ঝরাপাতা আসিয়া উঠানে জমিয়াছে।

নদীর ঘাটে তেমনি গান করিতে করিতে আসিয়া সে বুঝিল, একটু

দেরী হইয়া গিয়াছে—আজ গৃহ-বধূগণ পূর্ণকুম্ভ কক্ষে ফিরিয়া যাইতেছে। কুসুম সারির মাঝে কিন্তু কেন যেন দাঁড়াইয়া পিছনে পড়িল। তাহারা চলিয়া যাইতে যাইতে গুরুচরণ রাস্তা দুইটির সঙ্গমস্থলে আসিয়া পৌছিল। কুসুম অকারণে একবার, দুইবার ফিরিয়া চাহিল এবং তৃতীয়বারে তাহার স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

গুরুচরণ পদক্ষেপে গরু তাড়াইতে তাড়াইতে যাইতেছিল। লাঙ্গলের ভারে, বাহু স্কন্ধ ও পঞ্জরের নিকটস্থ মাংসপেশী ফুলিয়া উঠিয়া গ্রীক ভাস্করের খোদাই মূর্ত্তির মত গুরুচরণকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে —কুসুম হয়ত তাহাই দেখিয়াছে। গুরুচরণ আপনার যৌবনস্পন্দিত দেহের মাঝে স্নায়ু কম্পনের অনাবিল সুখানুভূতিতে সহসা যেন বিবশ হইয়া গেল। পথের বাঁকে কুসুম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাতছানি দিয়া ডাকিয়া গেল, তাহার পরে তাহার পূর্ণকুম্ভভারাবনত দেহ বাঁশঝাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মোষমাথার জমি চষিবার কথা ছিল, কিন্তু গুরুচরণ স্থির করিল রসিকের বাড়ীর অদূরে যে ছোট জমিখানা তাহাদের আছে, সেইখানেই আজ চষিবে। পিতা ষষ্ঠিচরণ বলিয়াছিল, ডাঙ্গা জমি আগে চষিলে নিচু জমির দুর্গতি হইবে কারণ বেশী বৃষ্টি হইলে মোষমাথার জমি আর চাষ করা সম্ভব হইবে না।

চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে, বসন্তাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে গাছের পাতা সব ঝরিয়া পড়িয়াছে। রসিকের বাড়ীর পাশের গাছগুলি নিষ্পল্লব, তাহার ফাঁকে ফাঁকে রান্নাঘর ও উঠানের অনেকখানিই দেখা যায়। বাঁশবনের পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িয়াছে, দীর্ঘ শীর্ণ বাঁশগুলি আকাশের গায়ে পরম ঔদাস্তে স্থির হইয়া আছে। গুরুচরণ চাষ করিতে করিতে

দেখিতেছিল আর গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিল। কুসুম এঘর ওঘর করিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছে।

সে দেখিয়াছে রসিক তাহার লাল বলদ জোড়া লইয়া গাঙ পারে গিয়াছে, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আগুন তামাক সবই তাহার নিকট ছিল, কিন্তু গুরুচরণ ভাবিতেছিল নানান অসম্ভব কথা।

ধীরে ধীরে মাঠ উতপ্ত হইয়া উঠিল। পিতা 'নাস্তা' দিয়া চলিয়া গিয়াছে। গুরুচরণ লাঙ্গল থামাইয়া বলদ দুইটিকে দাঁড় করাইয়া ধীরে ধীরে রসিকের উঠানে যাইয়া দাঁড়াইল। কুসুম রান্না করিতেছিল, বাহিরে আসিয়া অকস্মাৎ গুরুচরণকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

গুরুচরণ অপরাধীর মত বলিল—একটু আগুন দেবে ঠাকুরঝি?

কুসুম ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—এত তা থাকতে আগুনই চাইলে?

—কপালে তাই লাগুক আগে—

—এখনও লাগে নি? দেখো আমার কপালে না লাগে।

কুসুম থামিয়া বলিল—দাঁড়াও আগে পান দি, তারপরে—

গুরুচরণের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে শয়নঘরে পান আনিতে চলিয়া গেল। গুরুচরণ দাওয়ায় বসিয়াই পানের এবং কুসুমের প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু ভয়ে, আশঙ্কায় বার বার তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিতেছিল—এমনি করিয়া অসময়ে আসায় কুসুম কি মনে করিবে, রসিককে বলিলে সেই বা কি ভাবিবে?

কুসুম পান দিতে আসিয়া, অসঙ্কোচ চিত্তে গুরুচরণের হাতের উপরে নিজের হাত খানি রাখিয়া পান দিল। ওই নিটোল হাতখানি স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষা গুরুচরণের মাঝে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, সে অকস্মাৎ হাতখানি নিজের আঙুলের মাঝে চাপিয়া ধরিল।

কুসুম শঙ্কিত হইল না, তাহার দুইটি বড় বড় চোখ গুরুচরণের মুখের উপর রাখিয়া শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—এ কি ! এই বুঝি তোমাদের বন্ধুত্ব ? ধীরে ধীরে সে তাহার হাতখানি মুক্ত করিয়া লইল।

গুরুচরণ বলিল—তবে কেন অমন করে ডাকলে ?

কুসুম ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—বন্ধু, তা আসতে বলবো না ?

গুরুচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নবীনদার কথাই ঠিক—

উত্তরের কোন অপেক্ষা না করিয়াই সে চলিয়া আসিল—আগুন লইতে আসিয়াছিল কিন্তু তাহা না লইয়া সে বাঁশ বনের পথে শুষ্ক পত্রে পদধ্বনি তুলিয়া দ্রুতবেগে ফিরিয়া আসিল। কুসুম কি করিল সে ফিরিয়াও দেখিল না।

গরু দুইটি উত্তপ্ত মাঠের মাঝে প্রখর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছিল —গুরুচরণ অকারণ কয়েকবার প্রহার করিয়া তাহাদিগকে দ্রুত চালিত করিল। শক্ত হাতে লাঙ্গলের মুঠা ধরিয়া সে অন্যমনে ভাবিতেছিল—এমন করিয়া তাহাকে হাত ছানি দিয়া ডাকিবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল ? আজ যদি সে এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে, হাতখানিকে মুক্ত করিয়া লইবে তবে এই ব্যবহারের কোন অর্থই নাই·········সে আবার ভাবে নারী পুরুষের সম্পর্ক হয়ত কেবলমাত্র বন্ধুত্ব লইয়াও গড়িয়া উঠিতে পারে, হয়ত কুসুম তাহাই বুঝিয়াছে, তাহার হাসি, তাহার ব্যঙ্গ কেবল মাত্র তাহার গানেরই প্রশংসাবাদ মাত্র—রসিক তাহাকে ভালবাসে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য।

যাহাই হউক, অত্যুষ্ণ ধূসর মাঠের মাঝে একাকী চাষ করিবার উৎসাহ তাহার ছিল না, সে মনে মনে কি একটা অজুহাত ঠিক করিয়া অসময়েই লাঙ্গল ছাড়িয়া দিল।

গৃহে ফিরিয়া দেখে ষষ্ঠিচরণ তামাক কাটিয়া চিটা দ্বারা তাহা মাখিতেছে। ষষ্ঠিচরণ বিস্মিত হইয়া বলিল—এখন এলি যে? মোষমাথায় যাস্ নি?

গুরুচরণ গামছাখানা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে খাইতে বলিল—না, বড্ড রোদ মাঠে টেঁকা যায় না।

ষষ্ঠিচরণ স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিল—চাষার ছেলের রোদ লাগ্‌লে কি চলে বাবা! মোষমাথার কতটুকু হ'ল?

—মোষমাথার জমিতে যাই নি, ওই পালানের জমির অর্দ্ধেক হ'ল।

ষষ্ঠিচরণ বিস্মিত হইয়া বলিল—বিষ্টি হ'লে মোষমাথার জমি যে চষাই যাবে না—তোর এত বুদ্ধি হ'ল কোথা থেকে—বার বার বল্‌লাম—

গুরুচরণ জবাব দিল না, অন্দরের উদ্দেশ্যে কহিল—একটু জল দাও।

দিগম্বরী দরজার পাশে দাঁড়াইয়া জলের ঘটি আগাইয়া দিল। গুরুচরণ জল পান করিয়া সেখানেই আলসের উপর শুইয়া পড়িল। অকস্মাৎ চোখে পড়িল দিগম্বরী দরজার পাশে দাঁড়াইয়া; কপাটের ফাঁকে তাহার পানে চাহিয়া আছে। গুরুচরণ দিগম্বরীর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল—কুসুমের মুখখানার কাছে ও যেন অত্যন্ত নিষ্প্রভ, বুদ্ধিহীন শিশুর মত সরল তাহার চাহনি—হয়ত কিছু বলিবার জন্যে ও পিতার অনুপস্থিতি আশা করিতেছে।

ষষ্ঠিচরণ তামাকুর স্বাদ পরীক্ষা করিবে বলিয়া উনানে আগুন আনিতে গেল। দিগম্বরী দরজার আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল—তুই রাগ্ করলি?

গুরুচরণের হাসি পাইতেছিল। সে বলিল—হুঁ, তুই ত আমাকে দেখ্‌তে পারিস্ নে।

তোরে জল দিলাম যে!

যেন আজ প্রত্যুষে জলটুকু দিয়া সে সমস্ত কিছু অপরাধ মুছিয়া ফেলিয়াছে। গুরুচরণ লুব্ধ কটাক্ষে চাহিয়া বলিল—এদিকে আয়, শোন।

—ওই ত তোর দোষ!

—দুষী ত আছিই, তবে আর রাগ ক'রলে তোর কি?

দিগম্বরীর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যষ্ঠিচরণ আসিয়া পড়িল। দিগম্বরী অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল। যষ্ঠিচরণ বলিল—কার সঙ্গে কথা বল্লি গুরো?

—কই, কেউ নয় ত!

যষ্ঠিচরণ মুচকি হাসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। সে তামাক টানিয়া টানিয়া তাহার তারিফ করিয়া বলিল—বেশ তামাকটুকু হ'য়েছে, ভ্যাখ।

গুরুচরণ হুঁকাটা লইয়া স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। যষ্ঠিচরণ পুনরায় তামাক মাখিতে মাখিতে বলিল—বৌমার সঙ্গে কথা ব'ল্ছিলি, না?

গুরুচরণ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—না।

—ও, তোর কাণ্ড দেখে ভয়ে ভয়ে জল দিচ্ছে, পান দিচ্ছে, কাল অতরাত্রে কোথা থেকে এলি?

গুরুচরণ উদাসভাবে বলিল—ওই নবীনদার ওখানে গান ক'রছিলাম।

যষ্ঠিচরণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গুরুচরণের মুখখানা দেখিয়া বলিল—রসিক শালীকে এনেছে বুঝি?

—হুঁ।

—সেখানে গেছলি?

—না।

—হ্যাঁ, রসিকের বাড়ী যাস্ নে, গান টান বিশেষ করিস্ নি সেখানে গিয়ে—

যষ্ঠিচরণ জানিত তাহার এই জোয়ান পুত্র, তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার

সুঠাম দেহ রমণীকুলের অতি প্রিয়, তাই মনে মনে সে শঙ্কিত হইয়াছিল। সেও ত এমনি করিয়া একদিন গ্রামের মাঝে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছিল তাই নিতান্ত অসংলগ্ন ভাবেই সে বলিল—বৌমা ত তোকে ভালই বাসে। তুই গান করিস্ নি ও তোর মার কাছে নালিশ ক'রছে।

ষষ্ঠিচরণ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অতীত যৌবনের কোন গোপন রহস্য সহসা যেন এই ঘটনা প্রসঙ্গে তাহাকে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছে।

গুরুচরণ নীরবে আলিসার উপর শুইয়াই রহিল। ক্ষণেক পরে ষষ্ঠিচরণ বলিল—মোষমাথাতেই কাল যা—পালানের জমি পরে হবে।

গুরুচরণ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—জোছনা রাত আছে, পালানটা আজই শেষ ক'রবো।

—তোর ত ওই খামখেয়ালী, রাত্রে চষতে গেলে গরু পারবে কেন, গরু দু'টোর চেহারা কি হ'য়েছে ?

গুরুচরণ বলিল—ওই রোদে কি মাঠে থাকা যায় !

মায়ের নিকট হইতে স্নানের তাগাদা আসিল, কিন্তু গুরুচরণ নড়িল না।

*

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গুরুচরণ পালানের জমি চষিতে যাইবার জন্যে প্রস্তুত হইয়াছিল। গতরাত্রির মত চাঁদ উঠিয়াছে—নারিকেল গাছের শীর্ণ কাণ্ড কালো রেখার মত আকাশের গায়ে লেখা, তাহারই পাশ দিয়া প্রথম জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে উঠানে সাদা গরু দুইটির সর্ব্বাঙ্গে। হঠাৎ রসিক আসিয়া বলিল—কোথায় যাস্ গুরো ?

—ওই, পালানের জমিটা শেষ ক'রবো।

—রাত্রে ! ও তুই ত আবার জোছনা রাতে বেশ লাঙ্গল ঠেল্‌তে পারিস্ ! তা আমার বাড়ী যাবি নে ?

—কেন ?

—কুসুম যে নেমন্তন্ন ক'রলে, গান ক'রতে, পান খেতে।

গুরুচরণ মৃদুকণ্ঠে কহিল—আজ আর হয় কেমন করে !

—কাল ?

—হ্যাঁ, দেখি ; তোমাদের ত সব দাগই হ'য়ে গেল—আমার ত—

—সাবাস্, ষষ্ঠিকাকা কিছু বলেছে রে !

গুরুচরণ সংক্ষেপে 'হুঁ' বলিয়া গরু দুইটিকে যাইতে ইঙ্গিত করিল।

গুরুচরণ নিঃশব্দে চলিয়াছে—নদীর চরে ওপারের বাবলা গাছে ক্লান্ত ঘুঘু কাহাকে যেন ডাকিতেছে। নদীতীরে একপায়ে ভর দিয়া একটি বক বসিয়া আছে শিকারের আশায়—তাহার অস্পষ্ট সাদা পালকে জ্যোৎস্না ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ফলহীন বৃক্ষে বাদুড় বৃথাই ঝট্‌পট্ করিয়া মরিতেছে। জ্যোৎস্নালোকিত পাণ্ডুর মৃত্তিকা স্নিগ্ধ বাতাসে তাহার তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া যেন শান্ত হইয়াছে। দূর দিকচক্রবালে নীলাকাশে জ্যোৎস্নার প্লাবন—কোথায়ও এক ফোঁটা মেঘ নাই।

গুরুচরণ চাষ করিতেছে। অদূরে দেখা যায় রসিকের বাড়ী, কালো বনশ্রেণীর মাঝে তাহার ঘরের চাল জ্যোৎস্নায় স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। রন্ধনালয়ের আলো দেখা যায়—কুসুম হয় ত রাঁধিতেছে—না হয় খাইতেছে। গুরুচরণের অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল—এমন করিয়া ডাকিয়া, এমনি প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে আঘাত দিবার কি প্রয়োজন, মানুষের অন্তর লইয়া এই নিষ্ঠুর পরিহাস—

রাত্রি গভীর হইতে চলিয়াছে। অনেকক্ষণ কহিল, রন্ধনালয়ের আলো নিভিয়া গিয়াছে ; হয় ত রসিক ও কুসুম এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গুরুচরণ এতক্ষণ চুপ করিয়াই লাঙ্গল চালাইতেছিল। সহসা উদাত্ত কণ্ঠে রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সে গাহিল—

তুমি ওপার বসে বাজাও বাঁশী আমি এপার বসে শুনি,
রে নবীন কোকিল।
কেমন করে যাবো আমি, আমার কোলে
যাদুমণি রে—
নলের আগায় নলের ফুল গাছের আগায় টিয়া
বন্ধুর আগে ক'য়ো খবর সে না যেন করে বিয়া।

গুরুচরণের উদাত্ত কণ্ঠস্বর দূরে বনশ্রেণীর গায়ে প্রহত হইয়া শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ওপারের বাঁশীর স্বর তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, মাঝে এই বিরহবাহিনী অবিশ্রান্ত গতিতে বহিয়া চলিতেছে।

নিঝুম রাত্রির স্তব্ধতা, তীব্র জ্যোৎস্না, দূরের প্রসুপ্ত বনশ্রেণী আর পায়ের নীচে ধূসর কঠিন মৃত্তিকা ক্ষুদ্র মাঠখানিকে যেন পাংশুমুখ রুগ্ন শিশুর মত করুণ করিয়া তুলিয়াছে। গুরুচরণের ক্লান্তি নাই, নিজের উপরে লাঞ্ছনা করিয়াই যেন আজ তাহার পরিতৃপ্তি। গুরুচরণ তথাপি গান করিয়া যাইতেছিল।

রসিকের বাড়ীর টিলার নিম্নে শুভ্র কি যেন একটা দেখা যায়। গুরুচরণ ভাল করিয়া দেখিল অবগুণ্ঠনাবৃত একটি নারী মূর্ত্তি। গুরুচরণের গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল, ভয়ার্ত্ত বিবশ দৃষ্টিতে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নারী মূর্ত্তি তাহারই দিকে আসিতেছে। এই মাঠে ভয় আছে, এরূপ কিম্বদন্তী সে শুনিয়াছে—পিতার মুখে শুনিয়াছে, মোহন মণ্ডল এখানে মাছ ধরিতে আসিয়াছিল ভরা বর্ষার সময়ে, ভূতে তাহাকে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। এইখানে ভয় পাইয়া কেদারের পিতার জ্বর হয় কিন্তু সে জ্বর তাহার আর সারে নাই। গুরুচরণের সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল, বুকের মাঝে হৃদপিণ্ড দ্রুত চলিয়া দেহের স্নায়ুকে যেন অকস্মাৎ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। গুরুচরণ এক দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছিল।

গরু দুইটিও যে কখন থামিয়া গিয়াছে সে তাহা নিজেই জানে না। দেহে চলিবার শক্তি আর নাই, গুরুচরণ চীৎকার করিবে ভাবিল কিন্তু হৃদপিণ্ড গলার মাঝে আসিয়া যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। নারী মূর্ত্তি ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

কাছে, অতি সন্নিকটে আসিয়া এই মূর্ত্তি সহসা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সামান্য হাসির শব্দটার আঘাতে গুরুচরণ যেন বজ্রাঘাতের অনুভূতি পাইয়াছে। নিশ্চল নীরবভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, এখনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যাইবে।

—কিগো বন্ধু! রাত্রে এই গান কেন?

কম্পিত ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে গুরুচরণ প্রশ্ন করিল—কে?

—আমি কুসুম।

—কুসুম!

—হ্যাঁ গো বন্ধু। অমন ক'রে চলে এলে কেন? কুসুম গুরুচরণের গা ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মুখের পানে চাহিয়া সে যেন সহসা অবাক্ হইয়া গেছে।

গুরুচরণ পার্থিবদেহের একটু স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে হৃতসংজ্ঞাকে ফিরাইয়া পাইয়াছে। জ্যোৎস্নায় ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—কুসুম! তুমি এলে কেমন ক'রে?

—পায়ে হেঁটে।

—রসিক?

—ভয় নেই, সে ঘুমুচ্ছে। বলি, ও গান গাওয়া কেন?

গুরুচরণ কহিল—এমনি। গান ইচ্ছে হ'ল গাইলাম।

—তখন যে বড় চ'লে এলে?

—তবে কি ক'রবো ?

—গিছ্‌লে কি জন্যে ? আগুন না নিয়ে এসেই যে আগুন জ্বালিয়ে এলে। আবার এখন ব'লছো গান ত ক'রবেই। কুসুম খিল খিল করিয়া অত্যন্ত প্রগল্‌ভের মত হাসিয়া উঠিল।

—তুমি তাড়িয়ে দিলে তাই, যদি তাই ক'রবে তবে ডাক্‌লে কেন ?

কুসুম অকস্মাৎ গুরুচরণের হাতখানা ধরিয়া তাহার গায়ের সঙ্গে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বন্ধু, মেয়েমানুষের সঙ্গে কি অমনি করে, লোকে নিন্দে ক'রবে যে !

গুরুচরণ নিজের হাতখানিকে মুক্ত করিল না। কুসুমের হাতের স্পর্শ তাহার অস্থিমজ্জায় এক অপূর্ব্ব শিহরণ জাগাইয়া দিয়াছে—সমস্ত দেহের মাঝে রক্তস্রোতের আলোড়নে পেশীগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বেপথুমতী রমণীর মত সে বলিল—আমাকে ডাক্‌লেও ত, লোকে নিন্দে ক'রবে।

—ও আমি, আমার আবার নিন্দে কি, আমি ত আর ঘরের বৌ নয় কারও। তোমার বউকে কবে দেখাবে ?

অপ্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নে গুরুচরণ অবাক হইয়াছিল। কি জবাব দিবে ভাবিয়া না পাইয়া গুরুচরণ বলিল—তোমার ভয় ক'রলো না আস্‌তে ?

—তুমি ত আছ, আবার ভয় কি ! কুসুম আবার হাসিয়া উঠিল।

গুরুচরণ ভীত চিত্তে প্রশ্ন করিল—রসিক যদি জান্‌তে পারে তুমি কি ব'লবে ?

কুসুম আবার হাসিয়া বলিল—ব'লবো বন্ধুর কাছে গেছ্‌লাম গান শুন্‌তে।

—সে রাগ ক'রবে না ?

—রাগ ক'রবে কেন, বন্ধুকে আদর ক'রতেই হবে ত। একটু চুপ

করিয়া থাকিয়া কুসুম বলিল—দুপুর রাত্রে আস্‌লে রাগ ক'র, বেনা ? কুসুম আঁখি প্রসারিত করিয়া গুরুচরণের মুখের দিকে চাহিয়া অপ্রাকৃত গাম্ভীর্য্যে মুখখানাকে লীলাময় করিয়া তুলিল। গুরুচরণ স্থির পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল, কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে কুসুমের হাতখানি আঁকড়াইয়া ধরিল, কুসুম আপত্তি করিল না। গুরুচরণের মুখের পানে চাহিয়া ফিক্‌ করিয়া হাসিল মাত্র।

গুরুচরণ লুব্ধ স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে কুসুমকে দেখিতেছিল, কিন্তু সে ভাবিয়া পাইতেছিল না, ও কেন এমন করিয়া নিশীথ রাত্রে তাহারই নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। সে কুসুমের হাতখানাকে নিজের বাহু দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এখন এলে কেন ?

কুসুম গুরুচরণের বাহুসংলগ্ন হইয়া চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া শিশুর মত তাহার মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তুমি রাগ ক'রেছ যে ?

—রাগ ত আমি করি নি।

—তবে সন্ধ্যায় এলে না কেন ? আর রাত্রেই বা হাল দিচ্ছ কেন ?

—অমনি আমি ক'রে থাকি। কিন্তু আমি গেলে তোমার লাভ কি ?

—গান শুনব, পান দেব।

—কেবলমাত্র গানই আর কিছু না ?

কুসুম গুরুচরণের কঠিন হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল—তুমি ত ভারি দুষ্টু বন্ধু! পান দেব বললুম ত, আবার কি ?

—ও আর কিছু না ?

কুসুম বলিল—আর আবার কি ? ভালবাসা ?

জ্যোৎস্নাস্নাত সুরাপূর্ণ পাত্রের মত মদির দেহখানাকে পুনরায় আকর্ষণ করিয়া গুরুচরণ কহিল—হুঁ।

লাভ কি? তোমার ত বৌ আছে, আমাকে নিয়ে শেষে সুখ শান্তি যাবে।

—থাক্, বৌ আছে মিথ্যে নয় কিন্তু সে ত মানুষ নয়।

কুসুম হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ছেলেমানুষ বড় হ'লেই মেয়েমানুষ হয়। তুমি যখন বেঁচে আছ তখন আর ভাবনা কি তার? আর তোমারই বা কি?

—সে ত আমাকে ভালবাসে না। কথাটা বলিতেই গুরুচরণের মনে হইল সে যেন মিথ্যা কথা কহিয়াছে। আজ দরজার আড়ালে যে প্রশ্নটি করিবার জন্যে সে দাঁড়াইয়াছিল তাহার মধ্যে ভালবাসার পরিচয় না আছে এমন নয়।

কুসুম বলিল—তুমি মিথ্যে কথা ব'লছো, ফাঁকি দিয়ে আমার কপালে আগুন দেওয়ার মতলব তোমার তাই আমাদের পালানে এসে তুমি গান করো।

—তোমার ভয় তাই? তোমাকে কি আমি দু'টো ভাত দিতে পারি নে?

—কেন? দিয়ে তোমার লাভটা কি? তোমার বৌ যে আমাকে ঝাঁ্যাটা মারবে।

—আমি তাকে একদিনে সই করে দেব।

এক মুহূর্ত্তে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া কুসুম বলিল—ও বাবা, ওই কুরুক্ষেত্তরের মাঝে যেয়ে আমার ভয় ক'রবে না?

গুরুচরণ ওষ্ঠ উল্টাইয়া বলিল—ও বাবা!

কুসুম চলিতে চলিতে বলিল—যাই বন্ধু, তুমি গান কর, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে যাই, তা হ'লে ভয় ক'রবে না।

কুসুম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, আবার একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া চলিতে

আরম্ভ করিল। তাহার সুঠাম সুন্দর দেহ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে, শীঘ্রই অদূরের বনশ্রেণীর মাঝে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

গুরুচরণ সেইদিকে মূঢ়ের মত তাকাইয়া ছিল—গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—ওপারের কদমগাছে হেলে পড়ে আগা, শিশুকালে ক'রে প্রেম যৌবনকালে দাগা।

কুসুমের ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল—কিন্তু তাহার স্পর্শটুকু আজ গুরুচরণের সমস্ত অন্তর সুবাসিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তর প্রত্যুষের আকাশের মত সোনার রংএ রঙীন হইয়া উঠিয়াছে।

গুরুচরণ গরু ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর দিকে রওনা দিল—মা, বাবা, দিগম্বরী এতক্ষণে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। আজ তাহার অন্তরাকাশ যেমন করিয়া চাঁদের আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে তেমনি করিয়া কোনও দিন তাহাকে উদ্ভাসিত করিতে পারিবে কি না তাহা কে জানে?

মা ভাত দিলেন, গুরুচরণ খাইয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িল। ঘুম আসাই স্বাভাবিক কিন্তু গুরুচরণ ঘুমাইতে পারিল না—মুহূর্ত্তের জন্য যে স্পর্শটুকু সে পাইয়াছে, যে কয়েকটি কথায় সে তাহাকে রোমাঞ্চিত করিয়া দিয়াছে তাহাই বার বার নানান ভাবে ভাবিয়া মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা কল্পনায় আজকার রাত্রিকে সে স্মরণীয় করিয়া মনের সংগোপনে জমা করিতেছিল। কুসুম অমনি করিয়া তাহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল কেন? অমনি করিয়া বিনা ভূমিকাতেই বা বিদায় নিল কেন? যে দুর্লভ হাতখানি সে সকালে ছিনাইয়া লইয়াছে তাহাই বা নিশীথ রাত্রে অমনি করিয়া আসিয়া সে সহজলভ্য করিয়া দিয়াছে কেন?

চোখ বুজিয়াই সে শুইয়াছিল—দূরাগত অস্পষ্ট একতারার সুর কানে

যাইতেই সে বুঝিল, এ নবানদা। এখনও সে হয় ত "পরের জন্তে পরকাল হারাইয়া" গান করিতেছে। কণ্ঠস্বর শোনা যায় না কিন্তু একতারার তীক্ষ্ণ ঝঙ্কার শোনা যায়। নবীনের জীবনেও এমনি করিয়া রঙ্গিনী একদিন আসিয়াছিল, এমনি করিয়া যৌবনের মোহকে ইন্ধন দিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছিল, এমনি করিয়া অন্তরাকাশ ক্ষণিকের জন্ত ধূমকেতুর আলোয় আলোকিত করিয়া দিয়া পরক্ষণেই পুচ্ছতাড়নায় সমস্ত আলো নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে। তাই নবীনদা আজ অন্তরকে পৃথিবীর লতায় পাতায়, দুর দূরান্তরে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে তাহা না হইলে পথের বকুলগাছের উপর, তাহার ফুলগুলির উপর তাহার এত মায়া কেন? আজ তাহার মনে হয়, নবীনদা বড় আপনার, বড় মহৎ, তাহার পাগলামীকে আজ সে যেন চিনিয়াছে—যাহারা ভুল বুঝে তাহারাই তাকে বলে পাগল।

*

পরদিন বৈকালে গ্রামের মণ্ডল ষষ্ঠিচরণের সভাপতিত্বে সভা বসিয়াছিল।

গ্রামে প্রত্যেকবারই চড়ক পূজা হয়। এবার কিরূপে পূজা সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহাই আলোচনা হইতেছিল। কেদার মণ্ডল, মহেশ দাস, বিহারী মণ্ডল, ক্ষুদিরাম বিশ্বাস প্রভৃতি অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণ পূজার সমস্ত ব্যবস্থার ভার লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সহসা রসিক বলিল—আমি গরীব আমার পক্ষে সব করা সম্ভব নয়, তবে ষোলক অষ্টকের মহলার জন্তে আমার উঠান আছে আর সে ক'দিনের পান তামুকের খরচ আমার।

ক্ষুদিরাম বলিল—তারপর? পূজার চাঁদা কত উঠ্‌বে?

গত বৎসরের হার অনুযায়ী চাঁদার প্রতিশ্রুতি সকলেই দিল। দত্ত

মহাশয়ের মণ্ডপে পূজা হয়, তিনি অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করেন, তিনি যে তাহা দিবেন তাহা সকলেই জানিত। অতএব স্থির হইল আজ রাত্রি হইতেই ঘোলকের মহলা আরম্ভ হইবে রসিকের উঠানে। গুরুচরণ তাহার প্রধান গায়ক, সে যথাসময়ে উপস্থিত হইবে, চাকর যাইবে ঢাকীকে খবর দিতে।

ষষ্ঠিচরণ বলিল—আর ক'টি দিন মাত্র আছে এবার উঠে পড়ে লাগো সব।

সকলেই যথাসাধ্য করিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া রওনা দিল—কথা হইল রসিকের উঠানে সকলে সমবেত হইবে সন্ধ্যার পরে—ঘোলকের মহলা দিবার জন্য।

*

চাঁদ উঠিয়াছে—রসিকের উঠানে খেজুরের মাদুর পাতিয়া আসর রচনা করা হইয়াছে। ঢাকী বসিয়া ঢাকের তোয়াল টানিতেছে। পাড়ার ঘোলক গায়কগণ সমবেত হইয়া গুরুচরণের অপেক্ষা করিতেছে।

কিন্তু গুরুচরণ এখনও আসে নাই—

দাওয়ায় বসিয়া কুসুম গুপারী কাটিয়া অতিথিগণের জন্যে প্রস্তুত করিতেছে। ল্যাম্পের একটা শীর্ণশিখা ধূম উদ্গারণ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। রসিক ব্যস্ততার সঙ্গে হুঁকার জল পল্টাইয়া আগুন তুলিয়া প্রস্তুত হইতেছে। পাড়ার কেদারের স্ত্রী, ক্ষুদিরামের কন্যা বিলাসী ও দুই একজন স্ত্রীলোক সমবেত হইয়াছে গান শুনিবে বলিয়া। কতকগুলি দিগম্বর বালক বালিকা জোছনায় কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে। গান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই হয় ত পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। উঠানের অদূরে খড়ের গাদাটা জোছনায় স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে।

রসিক প্রশ্ন করিল—কেদারদা, গুরো এল না এখনও—

কেদার হুঁকা টানিতে টানিতে বলিল—খেযে দেয়ে আস্বে ত—

সমবেত সকলেই গুরুচরণের অপেক্ষা করিতেছিল—সে না আসিলে গান আরম্ভ হওয়া সম্ভব নয়, সেই গানের সরকার। চড়কপূজার নায়ক সেই—এ সময়ে গ্রামের মাঝে সে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদরণীয় এবং তাহার নেতৃত্বকে কেহ উপেক্ষা করিতে সাহস করে না।

কুসুম গুপারী কাটিতে কাটিতে মাঝে মাঝে উঠানে সমবেত জনতার দিকে তাকাইতেছিল, পাড়ার বধূগণ দাওয়ার অপর প্রান্তে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। কুসুম ল্যাম্পটা ঘরের মাঝে রাখিয়া আসিল কেন রসিক তাহা না বুঝিয়াই প্রশ্ন করিল—ল্যাম্প ঘরে রাখলে যে?

কুসুম বলিল—যে জোছনা আর আলো দিয়ে কি হবে? নিভিয়েই দেব—

—না না, পান দিতে হবে সকলকে।

কুসুম হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

রসিক তামাক সাজিয়া কেদারের হাতে দিয়া মাহুরের প্রান্তে বসিল। ক্ষুদিরাম বিশ্বাস বলিল—তা দেখে বেশ খুশী হ'লাম ঘরে মেয়েমানুষ না থাক্‌লে কি চাষ আবাদ হয়। আর তা না হ'লে বাড়ীতে কি দু'জন লোকই ডাকা যায়!

রসিক বলিল—তোমাদের আশীর্ব্বাদ কাকা—নইলে আজ কি তোমাদের পায়ের ধুলো নিতে পারতুম?

ক্ষুদিরাম বলিল—আশীর্ব্বাদ ত করিই—

গুরুচরণ ও নবীন দুইজনে একতারা হাতে উপস্থিত হইতে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। কেদার মণ্ডল হাঁকিয়া বলিল—ওরে তোরা সব নেপুর টেপুর পায়ে দিয়ে নে, ও হীরালালদা ঢাকটায় ধুম্বল দিয়ে নাও।

রসিক সঙ্গে সঙ্গে বলিল—হ্যাঁ, রাত্তির হয়ে যাচ্ছে, এক পালা শেষ করা চাই।

গুরুচরণ বলিল—দাঁড়াও রসিকদা, খেয়ে উঠে একটা পানও মুখে দেই নি।

রসিক তাহাকে আপ্যায়িত করিল—কুসুম গুরোকে পান দে—যা না গুরো খেয়ে আয় কুসুমের কাছ থেকে, তোর আবার লজ্জা কি ?'

গুরুচরণ দাওয়ার ধারে দাঁড়াইয়া বলিল—ঠাকুরঝি একটা পান দাও !

কুসুম পান তৈয়ারী করিয়াই রাখিয়াছিল। গৃহের ছায়ায় গুরুচরণকে স্পষ্ট দেখা যায় না, কুসুমও দাওয়ার উপরে অন্ধকারেই বসিয়াছিল। কুসুম পান দিতে আসিয়া বলিল—কই নাও।

গুরুচরণ পান লইল। কুসুম গুরুচরণের হাতখানায় অনিচ্ছাকৃত সামান্য একটু স্পর্শের মাঝে কি যেন একটা ইঙ্গিত করিল, গুরুচরণ কিছুই বুঝিল না। ক্ষণিক দাঁড়াইযা থাকিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে সে নূপুর পায়ে বাঁধিয়া লইল। রসিক বলিল—হ'ল রে গুরুচরণ ? কুসুমের পান খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছিস নাকি ?

গুরুচরণের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল—রসিক কি তাহা হইলে কাল রাত্রির সমস্ত ঘটনা জানে ? জানিয়াই কুসুমকে যাইতে অনুমতি দিয়াছে, না এ কেবল সন্দেহ মাত্র ? কুসুম কি হাতের স্পর্শটুকু দ্বারা সেই রাত্রির প্রগলভতাকে গোপন করিতে ইঙ্গিত করিয়াছে ! দ্রুত চিন্তা করিতে করিতে গুরুচরণ বলিল—রসিকদা, যা তা ঠাট্টা ক'রো না। নেপুর বাঁধছি তা ত দেখছো, তোমার কুসুমের পান খেয়ে তুমি মারা যাও।

সমবেত সকলেই হাসিয়া উঠিল। এইরূপ কদর্য্য রসিকতাই তাহাদের মধ্যে সহজ হাস্য-পরিহাস। এরূপ পরিহাসে কেহই কিছু মনে করে না।

রসিক কহিল—ঠাট্টা ক'রতেও পারি নে রে গুরো ? কুসুম যে তোর ঠাকুরঝি।

গুরুচরণ রুষ্টভাবেই বলিল—ঠাকুর কন্যে ত তোমারও।

*

গুরুচরণ আগে আগে গান করিতেছে, ও নাচিয়া নাচিয়া দেখাইয়া দিতেছে,পরে অন্যান্য যোলকগায়ক বালকগণ অনুকরণ করিয়া গাহিতেছে। ঢাকী নাচিয়া নাচিয়া পালক সজ্জিত ঢাক বাজাইয়া সকলের বাহবা অর্জ্জন করিতেছে। হীরালাল ঢাকী এদেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ, সকলে পূজা ও আসন-আরতি ফেলিয়া তাহারই নৃত্য দেখিয়া থাকে।

গুরুচরণ গাহিল—

আমি নিত্য যাই যমুনার ঘাটে
আমি তোমায় ত দেখি নাই বটে হে—

দোহারগণ সমবেত কণ্ঠে তাহা পুনরাবৃত্তি করিয়া, নৃত্যের অঙ্গ স্বরূপ তালে তালে পা ফেলিয়া পিছাইয়া আসিতেই, হীরালাল লাফ দিয়া সাম্‌নে যাইয়া কঠিন বেত্রাঘাতে তেহাই বাজাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সমবেত সকলেই এক সঙ্গে শব্দ করিয়া তাহার তেহাইকে তারিফ করিল।

গুরুচরণ গানের মাঝে ক্রমেই আড়ি খাটাইয়া হীরালালকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিতেছে, হীরালাল দক্ষতার সহিত তাহা বাজাইয়া দিয়া গুরুচরণকে তারিফ করিয়া ব'লিতেছে—বাহবা ভাই।

গুরুচরণ হাসিয়া পুনরায় তাহার মধ্যে 'বাট' বসাইয়া সঙ্গীতকে দুরূহ করিয়া তুলিতেছে। হীরালাল দুন চৌদুন বাজাইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতেছে। গানের আসর বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে, যাহারা সঙ্গীত বিষয়ে বিচক্ষণ তাহারা চক্ষু বুজিয়া নিজের যন্ত্রে তাল দিয়া মাঝে মাঝে 'আহা' করিয়া উঠিতেছে।

কুসুম উঠানের এই উচ্ছৃঙ্খল জনতার মাঝে একটি মাত্র লোককে লক্ষ্য করিতেছে—গুরুচরণের ঝাঁকড়া বাবরী চুল নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে, তাহার দৃঢ় মাংসপেশী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানা ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, তাহার কণ্ঠ সকলের উপরে উঠিয়া দুর দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কুসুম লুব্ধ নেত্রে বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল—রসিক তামাক সাজাইয়া সকলকে খাওয়াইতেছে, পানের ডালা লইয়া ইতস্ততঃ পরিবেশন করিতেছে।

কুসুম ভাবিতেছিল—তাহার স্বামীর কথা তাহার মনে নাই, আজ বাঁচিয়া থাকিলে সে কত বড় হইত, কিরূপ হইত তাহা কে বলিতে পারে! হয় ত এমনি করিয়া সে আজ সকলের সম্মান পাইয়া,সকলের দৃষ্টির সাম্‌নে আকর্ষণীয় হইয়া উঠিত, না হয় রসিকের মত অখ্যাত কৃপার পাত্র হইয়া পানের ডালা হাতে ঘুরিয়া বেড়াইত। দিগম্বরী সত্যই সুখী, একদিন সে বড় হইবে, তাহার জীবন ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়া ধন্য হইবে। গুরুচরণের বলবান বাহুবেষ্টনার মধ্যে নিশ্চিন্তে শিশুকে বুকে করিয়া ঘুমাইবে। বর্ষার দিনে, জ্যোৎস্নার রাত্রে গুরুচরণ গান গাহিবে, সে রান্নাঘরে বসিয়া শুনিতে শুনিতে আনমনে হাসিবে! আর সে রসিকের ক্ষুদ্র উষর গৃহের মাঝে বন্ধ্যা শীর্ণ তালগাছের মত চিরদিন দাঁড়াইয়া রহিবে একান্ত একাকী, সে শীর্ণবৃক্ষের অপ্রচুর ছায়ায় আসিয়া কেহ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিবে না।

কুসুমের চোখ দুইটি ভরিয়া অবাধ্য অশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, সে বারবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া তাহা দমন করিতেছিল। সমবেত আনন্দরত জনতার কেহই জানিল না যে আজ এই উৎসবের দ্বারে একজন অশ্রুসজল দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের অনুর্ব্বর ধূসর একক জীবনকে বারবার ধিক্কারের নির্দ্দয় লাঞ্ছনায় নিষ্পিষ্ট করিতেছে।

*

গান সমাপনান্তে সকলেই গৃহে ফিরিয়া গেল। গুরুচরণও পাণ্ডুর চাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল—রসিকদা রাত্তির অনেক হ'ল আমিও যাই।

—দাঁড়া গুরো,- একটু তামুক খেয়ে যা, এতক্ষণ ত তামাক খাস্ নি।

গুরুচরণ তামাকু সেবনের আশায় পরিশ্রান্ত দেহে উঠানের প্রান্তে জলচৌকির উপর বসিয়া পড়িল। রসিক তামাক সাজিয়া আনিয়া কি যেন একটা বলিল—গুরুচরণ জবাব দিল।

কুসুম উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহাই দেখিতেছিল, মনটা তাহার অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝে দাঁড়াইয়া উৎসবের মাঝে কেবল বেদনা আহরণ করিয়া ফিরিতেছে। সে আজ ত দিগম্বরীর নিশ্চিন্ততা কোনক্রমেই পাইতে পারে না। রসিক আর তাহার সম্বন্ধ বাণিজ্য সম্বন্ধ মাত্র, যেদিন সে অক্ষম হইবে সেদিন তাহার ভগ্ন জীর্ণদেহে রসিকের আর কোন প্রয়োজনই হইবে না।

গুরুচরণ খড়ের গাদা পার হইয়া বৃক্ষচ্ছায়ার অস্পষ্ট আলোছায়ায় স্বল্পালোকিত পথটুকুর উপরে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পথটা ভাল দেখা যায় না,সাবধানে পা ফেলিতেছিল হঠাৎ পিছনে মৃদু আকর্ষণ পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম!

আকুলকুন্তল অবলুপ্ত মুখখানিকে সস্নেহে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া গুরুচরণ প্রশ্ন করিল—কি কুসুম?

কুসুম জবাব দিল না। গুরুচরণ স্পষ্ট অনুভব করিল, একটা উষ্ণ জলধারা তাহার বুক ভাসাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতেছে। চিবুকে হাত দিয়া মুখখানাকে তুলিয়া ধরিতেই কোন্ পাতার ফাঁকে এক

ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল। গুরুচরণ সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বন্যার মত গড়াইয়া পড়িতেছে, মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—তুমি কাঁদছো কুসুম? কেন?

কুসুম চোখের জল মুছিল না। চোখ মেলিয়া গুরুচরণের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—আমায় ভালবাসবে গুরুচরণ?

গুরুচরণ কি বলিবে বুঝিয়া পাইল না—ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—ভাল ত বাসি—

রসিক যেন ডাকিল—কুসুম।

কুসুম নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া পলকের মাঝে অদৃশ্য হইয়া গেল। গুরুচরণ বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়াছিল। গভীর নিশীথে এমনি করিয়া আসিয়া চোখের জলে কুসুম কি বলিয়া গেল গুরুচরণ কিছুই বুঝিল না। বিস্মিত বিহ্বলভাবে পথের মাঝে দাঁড়াইয়াই রহিল। উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতেছিল।

রসিক প্রশ্ন করিল—কোথায় গেছলি কুসুম?

কুসুম রুষ্টস্বরে বলিল—কোথায় আবার যাবো?

এই ত এলি এদিক থেকে—

কুসুম বলিল—কি জ্বালা, তোমার জন্যে কি বাইরেও যাবো না!

রসিক বলিল—ও তাই!

গুরুচরণ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু পদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করিল।

পরিশ্রান্ত গুরুচরণ রাত্রিতে ঘুমাইয়াই পড়িয়াছিল।

সকালে মোষমাথার জমিতে হাল দিতে দিতে গুরুচরণ রহস্যময়ী কুসুমের কথাই ভাবিতেছিল। কুসুম এরূপভাবে সেদিন রাত্রে আসিয়া

অকারণ তাহাকে প্রলুব্ধ করিল কেন? কাল রাত্রেই বা কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিয়া গেল কেন? গুরুচরণ গান গাহিতে গাহিতে ভাবিল—রসিকের বাড়ীতে থাকিয়া কুসুম কি সুখী নয়? কিন্তু রসিক যদি কাল তাহাদিগকে অমনিভাবে দেখিয়া ফেলিত তবে সে কি ভাবিত, এতদিনের বন্ধুত্ব প্রণয় সমস্তই এক নিমিষে ধুলিসাৎ হইয়া যাইত।

রসিক অদূরেই চাষ করিতেছে, তাহার লাল বলদ দুইটি দেখা যায়। বিলের পাড়ে ভিজা জমির মাঝে তাহারা চলিতে পারিতেছে না। গুরুচরণ অকারণেই চীৎকার করিয়া ডাকিল—রসিকদা।

রসিক হাত উঁচু করিয়া উত্তর দিল এবং সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিল। গুরুচরণ পুনরায় প্রশ্ন করিল—আগুন আছে?

রসিক হাঁকিয়া জবাব দিল—আছে, আছে—

গুরুচরণ নিকটবর্ত্তী হইয়া তামাক সাজিতে বসিল। রসিক বলদ দুইটিকে ঠেকাইয়া বলিল—দাঁড়া, আসি রে গুরো।

আজ রৌদ্র সেরূপ প্রখর নয়, সকাল হইতেই একটু একটু মেঘলা হইয়াছে। চাষের পক্ষে এমন দিন আর হয় না। রসিক গুরুচরণের পাশে আইলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—আজ এ বিলমাঠ শেষ ক'রে তবে নাবো, যা থাকে কপালে, না হয় সন্ধ্যা হবে।

গুরুচরণ হুঁকায় একটা প্রবল টান দিয়া বলিল—হ্যাঁ, আজ তাইই, তোমার কতটুকু আছে?

রসিক বলিল—এক চাষ হ'য়েছে এবার দোচাষ আরম্ভ ক'রবো।

আমার ত দোচাষ প্রায় শেষ ব'ল্‌তে গেছে তা হ'লে একসঙ্গে বাড়ী যাওয়া হবে কেমন ক'রে?

তুই যা চলে—

রসিক ধূম পান করিতে করিতে বলিল—কুসুম কি বলে জানিস্?

গুরুচরণ শঙ্কিত চিত্তে বলিল—কি ?

—আমি নাকি তোর চেয়ে ভাল গান করি ?

—সে আর মিথ্যে কি ?

রসিক হাসিয়া বলে—ঠাট্টা তুই আর করিস্ না। কিন্তু কাল তোর গান শুনে পরে কি ব'ললে জানিস ? তুই ভাল নাচতে পারিস, তোর বাবরী চুল নাকি ভাল !

—তারপর ?

—তোর বৌএর সঙ্গে নাকি সই পাতাবে। রসিক প্রগলভের মত হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কত কি ছাই ভস্ম ও যে বলে তার কোন ঠিক নেই। কাল আমাকে বল্লে, আমি তাড়িয়ে দিলে সে কোথায় যাবে ? আমি যেন তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি আর কি ! পরশু রাত্রে, ওই তুই যেদিন গান ক'রতে ক'রতে পালানের জমির খিল ভাঙ্ছিলি, ও কান পেতে তোর গান শুন্ছিল—হঠাৎ দুপুর রাত্রে দেখি ও উঠে গেছে কোথায়—

গুরুচরণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—কোথায় গিয়েছিল ?

রসিক হুঁকাটায় কয়েকটা টান দিয়া চুপ করিল। গুরুচরণ রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার জবাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু রসিক কিছু বলে না। গুরুচরণ বার বার তাহার দিকে চাহিতেছে।

রসিক একগাল ধোঁয়া নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া বলিল, বারান্দায় বসে তোর গান শুন্ছিল। জিজ্ঞেস ক'রলে ব'ললো, ঘরে বড্ড গরম তাই বারান্দায় শুয়ে তোর গান শুনছিল, শেষে আমাকেও বারান্দায় আস্তে হ'ল।

—আমার গান শুন্লে ?

—তখন ত তুই বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলি—

গুরুচরণ রুদ্ধ নিশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া বলিল—কুসুম যেন কেমন, না রসিকদা ? কিন্তু তোমাকে ভালবাসে।

রসিক প্রসন্ন মনে বলিল—হ্যাঁ। দেরী হ'লে নানা কথা বলে। ও নাকি তোর বৌকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ ক'রবে।

উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

*

সেদিন রাত্রে আবার গান হইতেছিল—

গুরুচরণ ইচ্ছা করিয়াই কুসুমের সাম্‌নে অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়াইয়া বলিল—একটা পান দাও কুসুম ঠাকুরঝি।

কুসুম ঘর হইতে ল্যাম্প ও পানের বাটা লইয়া আসিয়া গুরুচরণের সাম্‌নে ঠেলিয়া দিল। গুরুচরণ আশ্চর্য্য হইয়াছিল, কাল যে তাহার হাতখানি অন্ধকারের মধ্যে স্বেচ্ছায় টানিয়া লইয়াছে আজ সে কেন এমন করিয়া তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিল। যদি তাহাই করিবে তবে কাল নিশীথ রাত্রে চোখের জল দিয়া বুক ভিজাইয়া দিবার সার্থকতা কোথায় ?

গুরুচরণ আসিয়া পুনরায় গান করিতে আরম্ভ করিল। নবীন একতারা বাজাইয়া তালের সঙ্কেত দিতেছে। গুরুচরণ ক্ষণিক পরে শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—নবীনদা, আর পারি নে আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে ?

নবীন হাসিয়া বলিল—তা আর আশ্চর্য্য কি ?

—হ্যাঁ, আজ বিলের এক দাগ দোচাষ দিয়েছি।

নানা কথার পরে সেদিনের মত গান শেষ হইয়া গেল। একে একে সকলেই চলিয়া গেল—নবীনও একতারা বাজাইয়া প্রস্থান করিল। গুরুচরণ তামাক টানিয়া টানিয়া রসিকের হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল—খাও রসিকদা, উঠি—

গুরুচরণ রাস্তায় আসিয়া নামিল। কালকার সেই স্বল্পালোকিত পথ, এইখানেই কাল কি যেন বলিতে আসিয়া কুসুম না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে ক্ষণেক অপেক্ষা করিল—হয় ত আজও কুসুম আসিবে কালকার মত নিঃশব্দে সংগোপনে, কিন্তু সে আসিল না। গুরুচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রসিকের উঠানের পানে চাহিল—দাওয়ায় বসিয়া রসিক যেন কি বলিতেছে।

কুসুম হাসিয়া হাসিয়া শুপারী কাটিতেছে, রসিককে পান তৈয়ারী করিয়া দিবে। কি কথা হইতেছে শোনা যায় না। গুরুচরণ তবুও দাঁড়াইয়াই রহিল, ল্যাম্পের লাল্‌চে আলোয় কুসুমের মুখখানি রক্তাভ দেখা যাইতেছে। কুসুমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তোমার বন্ধু কি চলে গেল?

রসিক বলিল, যাবে না? ছেলেমানুষ সারাদিন হাল ঠেলেছে, আর কত রাত্রি পারবে। তা তুমি ডেকে একটা পান ত দিতে পারতে তা হ'লে একটু জিরিয়ে যেতে পারতো।

—হ্যাঁ, তাকে ডেকে পান খাওয়াই আর পরদিন তুমিই ব'লবে যে গুরুচরণের সঙ্গে আমি পীরিত ক'রেছি। ঘরের বৌ ত নয় শেষে ব'লবে পথ দেখ।

রসিক বলিল—তোমাকে কি আমি অবিশ্বাস করি কুসুম, তা হ'লে কি গুরোকে অমনি মিশ্‌তে দেই। আর গুরো তেমন ছেলে নয়।

গুরুচরণ রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতেছিল, আস্তে আস্তে চলিতে চলিতে ভাবিল—রসিক যখন তাহাকে এতখানি বিশ্বাস করিয়াছে তখন সে কেন সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিবে না? কুসুম তাহাকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানিয়া আনিয়া ধূলায় নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে—হিংস্র পশু যেমন করিয়া মরণোন্মুখ শিকার লইয়া খেলা করে, কুসুম আজ গুরুচরণের অন্তর লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে।

গুরুচরণ আসিতে আসিতে দেখে নবীনদা পথের উপরে একটি পাতিত বৃক্ষের গুঁড়ির উপর নীরবে বসিয়া আছে—সাম্‌নে দূর দিগন্ত পর্য্যন্ত ধূসর মাঠ বিস্তীর্ণ। বড় বড় ধূসর মাটির ঢেলার উপর শিশিরের কণা পড়িয়াছে, সেগুলি জোছনায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। নবীন দূর দিগন্তের পানে চাইয়া কি যেন ভাবিতেছে।

গুরুচরণ ডাকিল—নবীনদা?

—কে? গুরো? এখনও যাস্ নি বাড়ী?

—না, তুমি এখানে ব'সে রয়েছ কেন।

নবীন হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—আমার বাড়ী আর পথ এর মাঝে তফাৎটা কোথায় দেখ্‌লি? বাড়ী যেয়েও এমনিই ত থাক্‌বো।

—ঘুমুবে না?

নবীন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ঘুমটা কি আর তোদের মত, যে শুলেই হ'ল। এখন সেটা সাধ্য সাধনার ব্যাপার, কোনদিন ঘুম হয় কোনদিন হয় না।

—এখানে বসে কি করছো?

নবীন বলিল—ওই যে ঝাপ্সা গ্রামটা ওর নাম জানিস্? জগতপুর। সেখানে এখন সব ঘুমুচ্ছে। ওখানে একটি বিধবা মেয়ে আছে, সে আমার গান শুন্‌তে ভালবাসে। মাঝে মাঝে খেয়ে আস্‌তে বলে, খেয়েই আসি। সাত বছরে বিধবা হ'য়েছে—তার বিয়ে জানি, বিধবা হওয়াও জানি, আজ তার বয়স হবে সতেরো কি আঠারো। সে হয় ত ঘুমুচ্ছে, না হয়—কি জানি কি ভাবছে!

ক্ষণিক দেরী করিয়া সে আবার বলিল—আমাকে রোজ সে অঞ্জলি পুরে ভিক্ষে দেয়, হাতে চুড়ি নেই, শাদা কাপড়—মনটাও তার তেমনি সাদা, আজ জ্যোৎস্না রাত্রে সে হয় ত চেয়ে আছে এই নদীর পানে।

ফাল্গুনে পাশের বাড়ীর বিয়ে হ'য়ে গেছে, সে অদূরে দাঁড়িযে কেবল উৎসব দেখেছে।

নবীনের স্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সে বলিল—জগতে এমনি কত লোক, কত তার দুঃখ, কত তার বেদনা। নবীন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—পিছনে এই যে জঙ্গল, এই যে বাড়ীর মরাগাছের গুঁড়ির উপর ব'সে আছি—এসব কি জানিস্?

গুরুচরণ তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল—কি নবীনদা?

শ্মশান! নির্বংশে ভিটে—যারা তোদের অত্যাচারে মরে গেছে—ছেলে পুলে মেয়ে নির্বংশে হ'য়েছে। এই বাড়ীটা ছিল মোহনের। আমি তাকে দেখেছি, তোর মত জোয়ান, তোর মতই গাইতে পারতো—ওই যে বড় বাঁশের ঝাড়টা যেখানে, সেইখানে ছিল ওর শোবার ঘরের ভিটে—

গুরুচরণ প্রশ্ন করিল—মারা গেল কেন?

—শুনবি? তোদের বয়সে ও বিযে ক'রলে প্রায় দেড়শ' টাকা পণ দিয়ে, তাতে কয়েক বিঘে জমি গিরফি দিয়েছিল কিন্তু তা আর খালাস করা হয় নি। বৌএর বয়স ছিল ছয়। ওর যখন বয়স আটতিরিশ তখন প্রথম ছেলে হ'তে সে বৌ মারা যায়—কোথা থেকে এক বিধ্‌বে এনে রেখেছিল। বার বার সে ভগবানের দানকে—ছেলেকে মেরেছে কিন্তু শেষবারে বিধ্‌বেও মারা গেল। তারপর মোহন কিছুকাল ছিল, চাষ আবাদ ছেড়ে দিয়ে খাজা বাতাসার দোকান ক'রতো—যে দিন ম'লো মুখাগ্নি করার কেউ আর ছিল না। একটা বংশ নিপাত গেল—

গুরুচরণ শুনিতেছিল—গায়ের মধ্যে একটা শিহরণ অনুভব করিল, সম্ভবতঃ ভয়ে।

নবীন ধীরে ধীরে কহিল—তুই শুনিস্ নি?

—কি?

—অনেক রাত্রে এখানে এসে কান পেতে শুনিস্, মোহন যাদের মেরেছিল তারা ককিয়ে ককিয়ে কাঁদে। কি যেন আধো আধো স্বরে বলে—আমাকে বাঁচাও বাঁচাও, মারলে আমাকে? তারা যদি আজ থাকৃতো—

গুরুচরণের গায়ের মধ্যে ছম্‌ছম্‌ করিতেছিল—ঐ নিহত ভ্রূণগুলি যেন চারিপাশে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে আর কাতর স্বরে উদ্ধার করিতে বলিতেছে।

নবীন আবার আরম্ভ করিল—সেবার, প্রায় দু'কুড়ি বছর আগে বিলের জমি নিয়ে ওসমানপুরের সঙ্গে কেঁজে বাধে, এক ডাকে সাড়ে তিনশো লাঠি বেরিয়ে এলো—ওরা ভয়েই পালিয়ে গেল। আর আজ গ্রাম থেকে একশ' লাঠিও বেরোয় না—সেবার বিলকয়ার কেঁজেয় তোরা খবর দিলি তিন গাঁয়ের কুটুমদের। ওরা যদি বেঁচে থাকৃতো তোদের মাঝে তবে আজ এই গ্রাম থেকে বেরুতো পাঁচশ' লাঠি! গ্রাম ত শ্মশান হ'য়ে গেছে—এই পাড়া জম্ জম্ ক'রতো, কত লোক!

গুরুচরণ প্রশ্ন করিল—নবীনদা, এখানে সব বসতি ছিল?

—হ্যাঁরে, এসব ভিটে, অমনি সব নির্বংশে ভিটে। মোহনের পূবে ছিল হারানের বাড়ী, সে যখন পঞ্চাশ বছরে কলেরায় মারা যায় তখন বৌ রেখে গেল কাঁচা বয়সের কিন্তু সে বৌ ছিল সতীলক্ষ্মী—মরার দিন পর্য্যন্ত ভিটে আঁকড়ে পড়েছিল—মরলে আর একটা বংশ নিপাত গেল—ওই যে বড় তেঁতুল গাছ ঐটা ছিল তার বাড়ী।

গুরুচরণ কহিল—তুমি দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখেছি। যখন একা একা এই বনের মাঝ দিয়ে যাই তখন তারা যেন এসে আমাকে ঘিরে ধরে। মোহনের ঐগুলো বলে বাঁচাও,

হারাণের বৌ বলে একটা ছেলে দাও ভিটেয় বাতি দিতে, আর নটবর বলে আমাকে বিয়ে দাও—সে ত টাকার অভাবে বিয়েই ক'রতে পারে নি। বদমায়েসির জন্য কত মার খেয়েছে—

নবীন চুপে চুপে কহিল—তাই মাঝে মাঝে দুপুর রাত্রে এখানে এসে বসে থাকি! ওরা আসে, মনে মনে ওদের সঙ্গে বসে গল্প করি। কিন্তু চারিপাশে সেই "জোরো হাড়" যখন কাঁদে তখন পায়ের মাঝে কাঁটা দিয়ে ওঠে—

গুরুচরণ চুপ করিয়াছিল, কোন জবাব দিল না। তাহার মনে হইল, এই ঘোলাটে আলোছায়ার মাঝে মোহনের ঐ সন্তানগুলি, হারাণের বৌ, নটবর সব অশরীরী মূর্ত্তিতে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। চারি পাশে তাহারা যেন দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতেছে। সে ভয়ে পিছন ফিরিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলের পানে একবার চাহিল।

নবীন আবার কহিল—ঐ যে রসিক কুসুমকে এনেছে—ও ত মোহনের মতই নির্ব্বংশে হ'য়ে মরে যাবে, ও বাড়ীতে এমনি বাঁশের ঝাড় আর হিজল গাছ হবে। কুসুমকে কেউ মা ব'ল্‌তে পারবে? যে ব'লবে, তার গলাটিপে মারবি তোরা—

গুরুচরণ ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করিল—ওদের বিয়ে হয় না কেন?

নবীন ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল—কেন? ক'রলে জাত যাবে, তোরা একঘরে করবি। ভগবানের অভিশাপে তোরা 'ফৌৎ' হবি তাই কপালে লেখা আছে তাই ওকে সমাজের থেকে ঠেলে ফেল্‌বি—বামুন কায়েতের হয় না, তাই তোদেরও হয না কিন্তু ওদের ত আর তিন বছরে বিয়ে হয় না তাই ছেলেপুলে দু'-একটা থাকেই—বিয়ে ক'রতে টাকাও লাগে না—তা জানিস্? আকাশের দিকে চেয়ে চল্‌তে চল্‌তে তোদের পা যে গর্ত্তে পড়েছে।

নবীন আবার ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—কুসুমকেই তোরা থাক্‌তে দিবি—শত লাঞ্ছনা ক'রে বিদায় দিবি।

গুরুচরণ কুসুমের কথাই ভাবিতেছিল। কুসুম যদি রসিকের স্ত্রী হইত তবে কি গুরুচরণ তাহাকে ভালবাসিতে পারিত?

নবীন হঠাৎ প্রশ্ন করিল—আচ্ছা গুরো, তুই কি কুসুমকে ভালবাসিস্?

—একথা শুধালে কেন?

—আজ মনে হ'ল তার চাউনি দেখে, সে তাকে ভালবাসে, তুইও যেন—

—এই বুঝি দেখ্‌লে নবীনদা?

নবীন হাসিয়া বলিল—আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার বিদ্যে হ'তে এখনও অনেক দেরী গুরো। কিন্তু আমাদের বৌমার কি হ'বে? সে যেদিন বড় হবে, যেদিন দেখবে তুই কুসুমকে নিয়ে থাকিস্? সেদিন ওই মেয়েটির মত তোদের পানে চেয়ে দেখ্‌বে কেবল, আর নিশ্বাস ফেল্‌বে।

গুরুচরণ বলিল—আগেই ভেবে ম'রলে দেখ্‌ছি।

গুরুচরণ নবীনকে রাস্তার মাঝে রাখিয়াই চলিয়া আসিল কিন্তু নবীনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটী তাহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। কুসুম ত কয়েক-দিনের মোহ দিয়া তাহাকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া যাইবে, তখন জীবন ভরিয়া থাকিবে আর্দ্র মেদুর স্মৃতির বোঝা। দিগম্বরী তখন সেখানে আসিবে আবর্জ্জনাময় উৎসব-প্রাঙ্গণে অনাবশ্যক আড়ম্বরের মত।

জঙ্গলের পাশ দিয়া একা একা আসিতে আসিতে তাহার ভয় করিতে-ছিল—নবীনদার সহিত যাহারা আলাপ করিতে আসে তাহারা যেন তাহার পিছু পিছু আসিতেছে। কুসুমও যেন অশরীরী মূর্ত্তিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে—রসিকের বাড়ীখানাও মোহনের বাড়ীর মত জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে আর কুসুম হারাণের বৌএর মত কি যেন

প্রার্থনা করিতেছে। গুরুচরণ চলিতে চলিতে বার বার পিছন পানে চাহিতেছিল।

*

আজ দিগম্বরীই তাহাকে খাইতে দিল—খাইয়া যাওয়া হয় নাই।

দিগম্বরী ভাত বাড়িয়া দিয়া রান্নাঘরের দরজার পাশে, কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গুরুচরণ তাহার শাড়ীর আঁচলের প্রান্তটা শুধু দেখিতে পাইতেছিল।

দিগম্বরী বলিল—তুই কথা বলিস্ নে যে?

গুরুচরণ একটু হাসিয়া বলিল—কথা ব'ললে যে তুই রাগিস্।

—তোর মত আমি?

—আমার চেয়ে খারাপ। বাবা মার কাছে সব ব'লে দিস্।

দিগম্বরী অভিমানের সুরে বলিল—আর বলেছি?

—আর বলবি নে তা হ'লে?

—তুই বাড়াবাড়ি ক'রলে ব'লবোই ত—গায়ে হাত দিলেই ব'লে দেব।

—ও বাবা!

—তুই ত বদমাইস।

গুরুচরণ হাসিয়া ফেলিল। দিগম্বরী কি ভাবে, কি বুঝে তাহা কেবল সেই জানে, তাহার জন্য দিগম্বরী কিছু না করে এমন নহে, অথচ সে তাহাদের নিবিড় সম্বন্ধের কথা জানে না। কুসুম আজ যে দুর্নিবার আকর্ষণে তাহাকে টানিতেছে সে তাহার খোঁজ রাখে না।

দিগম্বরী অকস্মাৎ বলিল—আমাকে গান শুন্‌তে নিয়ে যাবি?

—নিয়ে যাবো।

—সত্যিই ত?

—হ্যাঁ, দেখবি কুসুম তোকে পান দেবে।

দিগম্বরী বলিল—কুসুম তোর কে ?

—আমার কেউ নয়। রসিকের বিধ্‌বে, তাকে দেখেছিস্‌ ?

—হুঁ, দেমাকে মাটিতে পা দেয় না! কি সব গান করে—

—গান ?

গুরুচরণ একটু থামিয়া রহস্য করিল—তোর কি ?

দিগম্বরী রুষ্টস্বরে বলিল—ওই ত তোর দোষ।

চৈত্র সংক্রান্তির আর দেরী নাই।

এগার দিন পূর্ব্বে ধূপ দেওয়া হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের মণ্ডপে আসন পাতা হইয়াছে। নিত্য সন্ধ্যায় সন্ন্যাসী ও বালাগণ সমবেত হইয়া দৈনন্দিন আরতি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করিয়া যায়। গুরুচরণ একজন বালা—নিরামিষ ভোজন ও তৈলহীন স্নানে শরীরে একটা রুক্ষতা দেখা দিয়াছে, বাবরী চুল ঝাকড়া ঝাকড়া চুলের গোছা হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, ডান হাতের তামার বলয়টি সহসা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সন্ধ্যার পরে আরতি নৃত্য হইতেছিল।

ভিন গাঁয়ের একজন সন্ন্যাসী আসন লইয়া নৃত্য করিতেছে। গুরুচরণ সারাদিন উপবাসী থাকিয়া ধুনচিসহ আসন আরতি করিতেছে—নৃত্যের কৌশলে সহিষ্ণুতা ও গতির প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। আসন-সন্ন্যাসী আসন মাথায় করিয়া বীরপদভরে তাণ্ডব আরম্ভ করিয়াছে, গুরুচরণ দুই হাতে উজ্জল জলন্ত অঙ্গারপূর্ণ ধুনচি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসনের পুরোভাগে নানা কৌশলে আগাইয়া পিছাইয়া আরতি করিয়া চলিয়াছে। পাশে পাশে রসিক ধূপ সরবরাহ করিয়া ধুনচিকে সর্ব্বদা ধূমায়মান করিয়া রাখিয়াছে। হীরালাল তাহার পালক সজ্জিত ঢাকে

বেত্রাঘাত করিয়া, নাচিয়া লাফাইয়া দর্শকগণের করতালিকে স্মিতমুখে গ্রহণ করিতেছে।

মণ্ডপের পশ্চিমে দালানের দ্বিতলের ঝুল বারান্দায় দত্তবাড়ীর ও ভদ্রপাড়ার মহিলাগণ সমবেত হইয়াছেন, একতলার বারান্দায় গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ বসিয়া আরতি দেখিতেছে। রাঙাঠাকুমা, কেদারের স্ত্রী প্রভৃতি বর্ষীয়সী রমণীগণ পুরোভাগে বসিয়া আছে, পশ্চাতে বধূ ও বালিকাগণ। কুসুম দেয়াল হেলান দিয়া বসিয়াছিল। দিগম্বরী গুরুচরণকে বলিয়া আজ আসিয়াছে; সেও এক গলা ঘোমটা দিয়া কুসুমের পাশেই বসিয়াছিল।

প্রাঙ্গণের আরতি তখন জমিয়া উঠিয়াছে দ্রুততায় ক্ষিপ্রতায় এবং কৌশলে নৃত্য বেগবান হইয়া উঠিয়াছে—দর্শকগণ মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। অকস্মাৎ হীরালাল বলবান বেত্রাঘাতে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া "চালান" বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল। দর্শকগণের মধ্যে একটা কোলাহল উঠিয়া থামিয়া গেল—নৃত্য দ্রুততর হইয়া উঠিয়াছে, দ্রুততা ও কৌশলের প্রতিযোগিতা শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে—হয় আসন-সন্ন্যাসী, না হয় গুরুচরণের পরাজয় ঘটিবে—রুদ্ধ নিশ্বাসে সকলে প্রতীক্ষা করিতেছে।

কুসুম চাহিয়া দেখে—দিগম্বরী উদ্‌গ্রীব বিস্মিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে গুরুচরণের দিকে চাহিয়া আছে—অত্যন্ত আগ্রহে চরম মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছে। কুসুম ধীরে ধীরে দিগম্বরীর হাতখানা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন কহিল—দিগম্বরী!

দিগম্বরী প্রাঙ্গণের দিক হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই বলিল—উঃ।

—দিগম্বরী, আরতি ক'রছে ও বেটা কে রে?

দিগম্বরী সম্বিত ফিরিয়া পাইয়াছে এমনি ভাবে তাহার পানে ফিরিয়া

চাহিতেই কুসুম পুনরায় তাহার প্রশ্ন জানাইল। দিগম্বরী একটু হাসিয়া জবাব দিল—জানি না ত!

—ও কে চিনিস্ না একেবারে!

দিগম্বরী বলিল—নাঃ। ওকে আমি চিন্‌বো কেমন ক'রে!

কুসুম দিগম্বরীর হাতখানায় একটা মৃদু চাপ দিয়া বলিল—নাঃ, তবে হাঁ ক'রে দেখছিস কি লো?

—তুমি দেখ্‌ছো কি?

—আমি ত নাচ দেখ্‌ছি আর তুই দেখছিস্ নাচিয়েকে।

—ধ্যেৎ! দিগম্বরী জোর করিয়াই হাত ছিনাইয়া লইল।

কুসুম আবার একটু হাসিয়া বলিল—তোকে কি বলে রে!

—ওমা, আমাকে আবার কি ব'লবে! আমি ওর সঙ্গে কথা কই!

—কথা বলিস না!

—নাঃ।

—ও বলে?

—হুঁ।

—কি বলে?

—ছাই ভস্ম কত কি বলে, গান ক'রে। বদমাইস্—

—তোর সঙ্গে বদমাইসি করতে চায়?

—তোমার সঙ্গে চায়?

কুসুম হাসিয়া দিগম্বরীর গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল—চায়ই ত! তুই যেমন বোকা, অমনি ক'রলে কি স্বোয়ামী ঘরে থাকে।

দিগম্বরী প্রশ্ন করিল—তোমাকে কি বলে!

—বলে, আমার বৌএর সঙ্গে সই পাতাবি? আমি বলি, না। কি জানি তুই আবার কি ভাববি—শেষে—

দিগম্বরী হাসিয়া বলিল—সই! আমার না ওর—

—ও মা, পুরুষমানুষে আবার সই হয় নাকি?

দিগম্বরী আড়চোখে একটু চাহিয়া ন্যাকাসুরে বলিল—হয় না! ও তাই বুঝি!

কুসুম দিগম্বরীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—তুই ত ভারি দুষ্টু সই!

দিগম্বরী তাহার চোখ দুইটিকে যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া কহিল—সই!

—হ্যাঁ, আজ থেকে তুই আমার সই। কেমন রাজি ত!

দিগম্বরী খুসী হইয়া বলিল—হুঁ।

—তোর স্বোয়ামীর যদি ভাগ চাই ত দিবি?

দিগম্বরী মুচ্‌কি হাসিয়া পরিহাস করিল—ভাগ কেন, সবখানিই।

অকস্মাৎ একটী কোলাহল শোনা গেল। ঢাকের নির্ম্মম বাদ্য তখন দ্রুততার শেষপ্রান্তে যাইয়া পৌঁছিয়াছে, এবং সমগ্র উঠানে লাল অগ্নিকণা ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে, তাহার মাঝে একটি অবসন্নদেহ লোক মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া গেল। গুরুচরণ পরাজিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে—আসন-সন্ন্যাসী গর্ব্বোন্নত দৃষ্টিতে উঠানের মাঝে দাঁড়াইয়া আছে। হীরালাল শেষ তেহাই দিয়া ঢাক নামাইয়া গামছা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে।

চারিদিকে ক্ষণিক স্তব্ধতা!

কুসুম জানে না, কখন সে আগ্রহে উৎকণ্ঠায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং মুখ হইতে অজ্ঞানে একটি অস্ফুট আর্ত্তস্বর সভাস্থলের মাঝে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সকলেই ফিরিয়া দেখে, কুসুম এক দৃষ্টিতে মূর্চ্ছিত গুরুচরণের পানে চাহিয়া আছে, অস্পষ্ট আলোকেও তাহার ব্যাকুলতা স্পষ্ট বোঝা যায়।

রাঙাঠাকুমা রঙ্গ করিলেন—কে, কুসুম নাকি? তোমার হ'ল কি?

কেদার-পত্নী বলিলেন—চড়কপূজো কি জন্মে প্রথম দেখ্‌ছো গো—

কয়েকজন বলিল—রসিক কিনা দেখ্‌ছে—

আর একজন বলিল—রসিক ত ধূপের সরা—

একটা অস্পষ্ট চাপা হাসি স্ত্রীলোকগণের মধ্যে খেলিয়া গেল। রাঙাঠাকুমা কি যেন একটা আঁচ করিয়া কহিলেন—ও বাবা, এতখানি ত বুঝি নি। ত—তাই—

বর্ষীয়সী মহিলাগণের মাঝে একটু মুখ চাওয়াচায়ী হইয়া ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হইয়া গেল। অন্য যাহারা বুঝিল তাহারা হাসিল, যাহারা বুঝিল না তাহারা বুঝিবার ভান করিয়া চুপ করিয়া গেল।

কুসুম অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতেই দিগম্বরী প্রশ্ন করিল—রাঙাদি কি ব'ললে?

কুসুম অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলিল—কি জানি। ওর ত সবতাতেই ঠাট্টা।

দিগম্বরী ব্যাকুল প্রশ্ন করিল—ও কি উঠেছে?

কুসুম দিগম্বরীর কাঁধের উপর হাত তুলিয়া দিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া কহিল—কিচ্ছু হয় নি তোর গুরুচরণের, কোনো ভয় নেই ভাই। কথাটা এমনভাবে বলিল যেন সে নিজে সান্ত্বনা না পাইয়াই তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে।

পুনরায় আরতি আরম্ভ হইল।

জোয়ান নিবারণ ধুনচি ধরিল এবং মঙ্গলপুরের জনার্দ্দন বালা আসন ধরিল। আবার ধীরে ধীরে নৃত্য ক্ষিপ্র ও বেগবান হইয়া উঠিল—দর্শকগণ উদগ্রীব হইয়া উঠানের ধূমায়মান ধুনচি ও লালবস্ত্রাবৃত আসনের

পানে চাহিয়া আছে—হীরালাল যেন আর ঠায় বাজাইতে পারিতেছে না, শেষ কলিকা গাঁজায় হাত বার বার দ্রুত চলিতে চাহিতেছে।

ভীড়ের মধ্যে কুসুম কাহাকে খুঁজিতেছিল। গুরুচরণের উপবাসী ক্লান্ত দেহ সেই যে ভীড়ের মাঝে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে আর দেখা যায় নাই। কুসুম উঠানের ভীড়ের মাঝে আবছা আলো অন্ধকারের মাঝে ঝাঁকড়া চুল বিলম্বিত ক্লান্ত সেই দেহখানিকেই খুঁজিতেছিল।

দিগম্বরী কহিল—দেখ সই, ঢাকী কেমন নাচ্‌ছে।—সে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কুসুম সংক্ষেপে হুঁ বলিয়া আবার খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

উঠানের ওইধারে দত্ত মহাশয়দের বিরাট গোয়াল ও 'আওলা'। দুই ঘরের মাঝে কে যেন খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে। মুখের উপর ছায়া পড়িয়াছে কিন্তু চুল ও দেহের অবয়ব যেন গুরুচরণেরই মত।

কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইল। দিগম্বরী কহিল—কোথায় যাও?

—আসি। তুমি এখানে বসে থাকো ভাই।

কুসুম নিঃশব্দে বারান্দা হইতে নামিয়া, দত্তবাড়ীর ভিতরবাড়ীতে প্রবেশ করিল। দাওয়ায় লণ্ঠন সাম্‌নে করিয়া দত্তগিন্নী সুপারী কাটিতেছেন, সাম্‌নে বসিয়া সুদর্শন একটি যুবক কোঁকড়া চুলের মাঝে লিক্‌লিকে আঙুল চালাইতে চালাইতে বলিতেছে—না মা, আমাকে একবার ক'লকাতা যেতেই হবে, আর দিন পনের পরেই ত ছুটি হয়ে যাবে।

—যাবি বাবা; সংক্রান্তির পরে যাবি, পূজো হ'য়ে যাক।

কুসুম চাহিয়া দেখে—লণ্ঠনের লালাভ আলো যুবকের তীক্ষ্ণ মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে স্বর্ণাভ করিয়া তুলিয়াছে। এত সুন্দর কাহাকেও সে দেখে নাই, ক্ষণিক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া একগলা ঘোমটা দিয়া সে

উঠান অতিক্রম করিয়া গেল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না, এমন কত লোক আজ বাড়ীর ভিতরে বাহিরে চলা ফেরা করিতেছে।

বাড়ীর পিছন ঘুরিয়া, অতি সংকীর্ণ এবং জঙ্গলাকীর্ণ অব্যবহৃত পথটি দিয়া কুসুম চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু ভয় করে নাই। গোয়ালের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার বুক ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল—যদি কেহ দেখিয়া ফেলে, যদি কেহ প্রশ্ন করে, এখানে কেন? নিজেই যে যুক্তি বাহির করিল, সে ত আর কাহারও ঘরের বউ নয়। আজ গতর খাটাইয়া রসিকের বাড়ীতে দুবেলা দুমুঠা খাইতে পাইতেছে, না হয় অন্য গাঁয়ে যাইয়া আর একটি রসিক বাহির করিতে হইবে। পিছন হইতে চাহিয়া চাহিয়া সে স্পষ্টই বুঝিল এ গুরুচরণ—পরাজয়ের গ্লানি ও দৈহিক ক্লান্তিকে সে জনান্তিকে ভোগ করিতেছে। একটা ছোট মাটির টুক্‌রা লইয়া সে ছুঁড়িয়া দিল—গুরুচরণ উপর হইতে কিছু পড়িয়াছে মনে করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। কুসুম আর একবার ঢিল ছুঁড়িল, গুরুচরণ ফিরিয়া চাহিয়া বুঝিল কে যেন ডাকিতেছে। সন্তর্পণে গোয়ালের পিছনে আসিয়া গুরুচরণ থমকিয়া দাঁড়াইল। কুসুম তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—বন্ধু।

গুরুচরণ বিস্মিতকণ্ঠে কহিল—কুসুম!

—হ্যাঁ, তোমার লেগেছে?

—না, আমাদের অমন কত হয়, তা তোমার এত ভাবনা কেন?

কুসুম গুরুচরণের নগ্নপিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—পুড়ে গেছে নাকি?

—না। ঠাকুরঝি, তুমি এখানে এলে কেন হঠাৎ?

—তোমায় দেখ্‌তে—দিগম্বরী আমার সই কি না?

—সই?

—হ্যাঁ, আজই ত পাতিয়েছি সই? দিগম্বরী কিছু বোঝে না—না?

গুরুচরণ একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমাকে ছুঁয়ো না। এ ক'দিন মেয়েমানুষ ছুঁতে নেই আমাদের—

কুসুম সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তাই নাকি? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—চল বাড়ী যাই।

—সে কি! লোকে দেখ্‌লে কি বলবে!

—বলুক—তুমি ভয় পাও?

—ভয়! না।

—তবে চল।

গোয়াল ঘরের মাঝে কে যেন মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—গুরুচরণ।

গুরুচরণ স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া উত্তর দিল—এই যে—

রসিক উভয়ের মাঝখানে আসিয়া নির্ব্বাকভাবে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—ও কে? কুসুম।

গুরুচরণ কহিল—হুঁ।

—এখানে কেন?

কুসুম কহিল—তোমার আক্কেল বেশ। সঙ্গে মেয়েমানুষ আন্‌লে একবার খোঁজ ত ক'রতে হয়। আমার শরীর বইছে না, বাড়ী যাবো কার সঙ্গে? তোমায় খুঁজে খুঁজে হায়রাণ! তোমার বন্ধু তিনবার খুঁজে এসেছে। একা একা অন্ধকারে এখন আমি মরি!

—ও তাই। রসিক বলিল—তা গুরুচরণ, তুই ত এগিয়ে দিতে পারতিস্‌।

কুসুম কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—তোমার বন্ধুর নিষ্ঠে কত, ওর ত এ-ক'দিন মেয়েমানুষের সঙ্গে তিন পাও চলা নিষেধ।

রসিক বলিল—তাই ত। তবে চল আমি রেখে আসি।

—না, আমি অত লোকের মাঝ দিয়ে যেতে পারবো না। খিড়কির দরজার সামনের রাস্তায় যাও। আমি বাড়ীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছি।

—আচ্ছা তাই, কিন্তু বাড়ী যেয়ে একা থাকবে কি ক'রে?

—একা থাকব কেন?

—শুনলি গুরো, আমাকে পাহারা দিতে হবে।

গুরুচরণ এতক্ষণ ভয়ে আশঙ্কায় চুপ করিয়াছিল, কহিল—একা মানুষের দুঃখই ত এই।

রসিক আত্মপ্রসাদের সঙ্গে অকারণেই হাসিয়া উঠিল।

অবনতশীর্ষ বাঁশ বাগানের নীচে ঘনীভূত অন্ধকার। বন, পথ, গাছ, পাতা, সব মিলিয়া ঘন অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে—নিজস্ব অস্তিত্ব যেন লোপ পাইয়া গিয়াছে। কালো বৃক্ষ চূড়ার আবরণে শতধা-খণ্ডিত আকাশের বুকে দু-একটা তারা মিট্ মিট্ করিতেছে—তাহার নিষ্প্রভ আলোক ছায়াবিলুপ্ত পথকে রূপ দিতে পারে নাই। রসিক চলিয়াছে; পাশে পাশে কুসুম। কি যেন একটা জানোয়ার শুষ্ক পাতায় পদধ্বনি তুলিয়া চলিয়া গেল।

কুসুম চমকাইয়া উঠিয়া বলিল—ও কি!

রসিক উচ্চকণ্ঠে বিকট হাসিয়া কহিল—শেয়াল, তোর ত খুব ভয় কুসুম। রসিক আদর করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—চল্ আমার পাশে পাশে। আমি হাটে বাজারে গেলে তুই থাকিস্ কি ক'রে?

—আহা, ঘরে থাকি, তার আবার ভয় কিসের!

কুসুম চলিতে চলিতে বলিল—তুমি ত ভারী বোকা।

—কেন?

—অন্ধকারে গোয়ালের পিছনে আমাকে আর বন্ধুকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখলে, তাও ত কিছু ভাবলে না।

রসিক কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া কহিল—তোর এ ভয় কেন কুসুম! আমি তোকে অবিশ্বাস করবো কেন?

—কোনদিনও করবে না?

—না। তোর ভালবাসা যে আমি জানি।

—যদি আমাকে একদিন তুমি তাড়িয়ে দাও।

—তোর দিদি থাক্‌লে কি তাকে তাড়িয়ে দিতে পারতাম?

কুসুম রসিকের হাতখানা ধরিয়া বলিল—সে ছিল বৌ, দোষ করুক, খারাপ হোক, তাকে ত তুমি ফেল্‌তে পারবে না, কিন্তু আমাকে দূর বললে থাকবার ত কোন দাবীই নেই।

রসিক বলিল—তুই এসব ভাবিস কেন? আমি কি তোকে ভালবাসি না? আমি কি পর?

কুসুম একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—না।

—তবে?

দুইজন আবার নিঃশব্দে চলিয়াছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিথর গাঢ় অন্ধকার। শুষ্ক পত্রের উপরে পদধ্বনি স্পষ্টতরভাবে শোনা যাইতেছে। পথটা হঠাৎ মাঠের কিনারে আসিয়া পড়িয়াছে, পথের সিংহদ্বারের সামনে নিষ্প্রভ ধূসর আবছা মাঠ অবগুণ্ঠনাবৃত রুগ্ন জননীর মত শায়িত। এক ঝলক বাতাস আসিয়া উভয়ের চোখে মুখে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মাঠের স্বল্পালোক তাহাদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। এক ঝলক বাতাস যেন বনানী-বেষ্টিত অন্ধকার-তাড়িত হইয়া পিছনে বাসা বাঁধিয়াছে।

কুসুম দূর দিগন্তের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—তারাগুলো কি? ওরা কি দেবতা?

রসিকের কাছে এ রহস্য কুসুমের মতই অপরিজ্ঞাত। সে বলিল—হবে।

—ওরা কি মানুষের মনের খবর জানে?

—হয় ত জানে।

কুসুম চমকাইয়া উঠিল। কি যেন মনে মনে ভাবিয়া বলিল—আমার মত হতভাগী যারা তাদের মরণই ভাল, তাই না?

—কেন, ছিঃ। রসিক বুঝিল কুসুমের নিশ্বাস দ্রুততর হইতেছে। সে তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া বলিল—কেন, অমন কথা ব'ল্‌তে নেই।

কুসুম আর্দ্র কম্পিত কণ্ঠে বলিল—আমি নেমকহারাম, তোমার কাছে কত অপরাধ করেছি।

কুসুম কাঁদিয়া ফেলিল। সে জানে, সে রসিকের বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিতে পারে নাই কিন্তু গুরুচরণের দুর্ব্বার আকর্ষণের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই। এই দ্বিধা সংশয়ের মাঝে সে আজ অসহায়ের মত কাঁদিয়া ফেলিয়াছে।

রসিক সান্ত্বনা দিয়া কহিল—না কুসুম! তোমার ভালবাসার এক কণা যে পেয়েছে সেই ত সার্থক এ জীবনে। আমি ত অনেকখানিই পেয়েছি।

কুসুম হাঁ না কিছুই বলিল না, রসিকের আকর্ষণরত হাতখানাকে বাধাও দিল না।

আরতিতে গুরুচরণের নাম ছিল এবং আজই সে প্রথম তাহার জীবনে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। সম্ভবতঃ রসিক ও নিবারণের অনুরোধে সে একটু বেশী নেশা করিয়া ফেলিয়াছে। পরাজয়ের গ্লানি ও পরিতাপ গুরুচরণকে আজ বিমর্ষ করিয়া তুলিয়াছে, তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে

সে আত্মগোপন করিয়াছিল। কুসুমের এই সমবেদনা, অকস্মাৎ আগমন এবং রসিকের উপস্থিতি তাহার মনকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দিগম্বরী তাহার মায়ের সহিতই ফিরিতে পারিবে। গুরুচরণ এক পায়ে দুই পায়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

ক্লান্তি ও নেশার ঝোঁকে সে কিছু ভাবিতেও পারিতেছিল না। রসিক কি মনে করিয়াছে, কি মনে করিতে পারিত সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সে বারান্দায় আল্‌সের উপর শুইয়া পড়িল। ষষ্ঠিচরণ প্রশ্ন করিল—তোর মা আর বৌমা এল না।

—আস্‌বে, আমি আগেই চলে এলাম।

—তোর হবিষ্যি দেবে কে?

—ওরা আসুক তারপর যা হয় হবে।

গুরুচরণ শুইয়া থাকিতে থাকিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কতক্ষণ চলিয়া গিয়াছে সে নিজেই জানে না, মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অশক্ত অবাধ্য দেহ লইয়া টলিতে টলিতেই সে রান্নাঘরে উপস্থিত হইল। ধর্ম্মপত্নীর হবিষ্যান্ন রাঁধিবার অধিকার আছে তাই দিগম্বরী ভাত দিল। গুরুচরণ চক্ষু বুঁজিয়াই ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিতেছিল, দিগম্বরী কি করিতেছে এবং কোথায় আছে চাহিয়াও দেখে নাই।

দিগম্বরী দরজা ধরিয়া ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—তুই পড়ে গেলি যে।

গুরুচরণ উপেক্ষার সহিত বলিল—গেলাম।

—লেগেছে?

—না।

—ওখানে আগুন পড়েছিল যে। গায়ে লাগে নি?

না।

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া দিগম্বরী প্রশ্ন করিল—তোর কি হয়েছে ?

—তোর মাথা।

—ওই জন্যেই ত তোর সঙ্গে কথা বলি না।

গুরুচরণ বিরক্তির সঙ্গে বলিল—ও কথা ব'লে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিস্ কি না ?

দিগম্বরী দাঁড়াইয়াই রহিল কোন জবাব দিল না। লক্ষ্য করিয়া দেখিবার শক্তি থাকিলে গুরুচরণ দেখিতে পাইত, দিগম্বরীর চোখ দুইটী অভিমানের অশ্রুতে ভরিয়া টলমল করিতেছে। ল্যাম্পের কালি ভাঙিয়া দিয়া দিগম্বরী তেমনিভাবেই দাঁড়াইয়াছিল। আবার প্রশ্ন করিল—কুসুম তোর কে ?

গুরুচরণ টানিয়া টানিয়া চোখ মেলিয়া দিগম্বরীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—কুসুম! আপন মনেই সে হাসিয়া উঠিল। দিগম্বরী তীক্ষ্নকণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ কুসুম, চিন্‌তে পারো না ?

—চিনতে ত পারি। সে ত তোর সই।

—সই! তুই জান্‌লি কি করে ?

—জানি, জানি। সে আমাকে বল্‌লে—

—কখন ? সে ত আজ সই পাতিয়েছে।

গুরুচরণ কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গেল।

—কুসুম আজ তোর কাছে বলেছে ?

—হ্যাঁ।

দিগম্বরী কি যেন ভাবিয়া বলিল—কুসুম তোর কে ?

—আমার সই। গুরুচরণ প্রগলভের মত হাসিয়া উঠিল।

দিগম্বরী কি ভাবিয়া যেন দরজার পাল্লাটা ধড়াস্ করিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল। গুরুচরণ ভাবিল, ও ত ছেলেমানুষ!

গুরুচরণ আহারান্তে আবার শুইয়া পড়িল—দিগম্বরী তাহার মায়ের কাছে মৃদুকণ্ঠে যেন কি বলিতেছে—সম্ভবতঃ তাহার নামেই অভিযোগ। কয়েকবার কুসুমের নামটী তাহার কানে ভাসিয়া আসিল, কিন্তু সে কিছু চিন্তা করিতে পারিল না, কথা কয়েকটিও যেন সে স্পষ্ট বুঝিল না। একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা তাহার মাঝে অশান্তির মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল কিন্তু তবুও সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কুসুম সকালে উঠিয়া নির্জীবের মত দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল। গত রাত্রির কথাগুলি সে মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। রসিক ত ইচ্ছা করিলেই অনেক কিছু ভাবিতে পারিত কিন্তু সে ত কিছুই মনে করে নাই। রসিককে এতদিন সে অন্তরের কোণে স্থান দেয় নাই, কিন্তু আজ সহসা মনে হইল রসিক মহৎ, রসিক তাহাকে ভালবাসে—কিন্তু গুরুচরণকে আজ সে যেখানে আনিয়া ফেলিয়াছে সেখানে হঠাৎ বিদায় দেওয়া যেমন অসম্ভব, নিজেকে মুক্ত করাও তেমনই দুঃসাধ্য।

অকস্মাৎ রাঙাদি মুখ নিঃসৃত গুড়াযুক্ত পিচ ফেলিয়া বলিলেন—কি করিস্ লো কুসুম? ও কুসুম।

কুসুম সাগ্রহে বলিল—এসো রাঙাদি, একলা আছি তোমরা ত একবার এসও না।

রাঙাদি নিষ্প্রভ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—এই ত এলাম—বলি তাই ত, রাঙাদির দরকার যখন হয় তখন রাঙাদিকে পাওয়া যায়। দে দেখি একটু পান দে'ত্তো—

কুসুম পান ও তামাকের পাতা দিয়া বলিল—বসো।

রাঙাদি পান খাইয়া পুনরায় একরাশ পিচ উঠানে ফেলিয়া বলিল—রসিক কোথা ?

—হালে গেছে।

—ওঃ, গ্যাখ্ কুসুম, পীরিত ক'রতে হ'লে, নাগরের সঙ্গে নিজে দেখা ক'রতে নেই, সেজন্য লোক দরকার। এত বড় হলি এটা জানিস্ না ?

কুসুমের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। রাঙাদির কথা কয়েকটি যেন শাণিত ছুরির মত ভীতিপ্রদ। কুসুম ম্লান শঙ্কিত মুখে বলিল—সে কি রাঙাদি, আমার আবার পীরিত কি ? এসব কি ব'লছো ?

রাঙাদি দন্তহীন মুখে জিব বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—চুল পেকেছে, তোদের বয়সও ত ছিল একদিন, জানি—সব জানি। আমার চোখে ধুলো দিতে পারিস্ এ ক্ষেমতা এখনও হয় নি।

—সে কি রাঙাদি ! এসব কি ব'লছো আমাকে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দত্তবাড়ীর গোয়ালের পিছনে ছুটে গিয়ে কোন নাগরের সঙ্গে দেখা করলি তা আমি ত জানি। তা বরাত ভাল গুরুচরণের মত লোক পেয়েছিস্ কিন্তু অমনি দিশেহারা হ'লে কি চলে, ধরা পড়ে যাবি যে !

কুসুম ভয়ে কাঁপিতেছিল। সে বলিল—কই আমি ত না। তুমি কি ব'লছো !

রাঙাদি হাসিয়া বলিল—ভয় নেই লো ভয় নেই। বলছি পীরিতের লোকের সঙ্গে নিজে অমনভাবে দেখা করতে নেই। থাকবি এমন যেন চিনিস্ না—খবর দিবি লোক মারফত ; দেখা করবি একা। আমাকে বিশ্বাস কর্, তোর কোন ভয় নেই, নাগরকে এনে দেব আমি, আর বেকুব রসিককে বাড়ীছাড়া ক'রবোও আমি। তুক্ তাক্ ত জানি—কেমন হ'ল ত !

কুসুম বলিল—না না, আমার দরকার কি ? গুরুচরণ আমার কে ? ও ত আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, আমি ও সব চাই না।

রাঙাদি আবার হাসিয়া বলিলেন—এখনও বিশ্বাস করলি না লো ? শুধু রসিকের ঘর করলেই ত আর চলবে না, আখের গুছিয়ে নাও, যৌবন ত আর চিরদিনের নয়। আমি যদি না বুঝতাম, তবে এ বুড়ো বয়সে কি করতাম বল্ ত ?

কুসুম বলিল—তুমি বুঝি—বাকী কথা কয়েকটি সে বলিল না, গলায় যেন বাধিয়া গেল।

রাঙাদি বলিল—হ্যাঁ লো হ্যাঁ। যৌবন না হয় আজই নেই। তা হ'লে কখন গুরোকে আসতে বলবো ?

কুসুম শঙ্কিত হইয়া বলিল—গুরো ত আমার কেউ না, ওর বন্ধু। আমি কি ব'লবো ? আর আমি ত—

—কিচ্ছু চাস্ না, কেমন ?

—না। ও আমাকে এনেছে, কোন অপরাধ ত করে নি যে আমি বিশ্বাস রাখবো না, আর গুরুচরণের ত বৌ আছে।

রাঙাদি পক্ক কেশের বোঝা নাড়িয়া বলিল—ওরে আমার সাবিত্রী রে ! রাড়ী বিধবের আবার সতীপনা কি লো ? তবে রসিকের বাড়ী থাকিস্ কেন লা ? আমি জানি—জানিস্, আমাকে ক্ষেপালে দুঃখু পেতে হবে।

কুসুমের কান্না পাইতেছিল, কি বলিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। রাঙাদির পা ধরিয়া করুণ বেদানার্ত্ত কণ্ঠে কহিল—তোমার পায়ে ধরি আমার উপর রাগ ক'রো না রাঙাদি। গুরুচরণের সঙ্গে আমার কিচ্ছু নেই, আমায় বিশ্বাস করো ?

রাঙাদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আরে নেই ত ; কিন্তু মনটা ত

টানে, মনে মনে ত ইচ্ছে, তা নইলে গুরুচরণ পড়ে গেল, তুই গোঙাতে গেলি কেন ?

—কিন্তু আমার ত উচিত হবে না, সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।

—এই কথা! দুকূল রক্ষে না ক'রতে পারলে বৃথাই চুল পাকিয়েছি রে কুসুম। যাক্, এ বয়সে তোদের মিল দেখলেও তৃপ্তি। তোর যেমন রূপ, গুরুচরণের তেমন গুণ।

রাঙাদি কুসুমের অশ্রুভারাক্রান্ত মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া, গাল টিপিয়া বলিল—মনের কথা বুঝি লো বুঝি। তোর ছেলেমানুষী কাল চোখে পড়্‌ল বলেই ত এলাম, এমনি সময়ে কি জ্ঞান কাণ্ড থাকে লোকের! তাই ত সব পাযে ধরে আমাদের, আমরা আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখি, আর মাহুতকে করি তুকতাকে কানা।

কুসুম কাঠের মত দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। রাঙাদি আর একবার পিচ ফেলিয়া, দন্তহীন মাড়িতে গুড়া দিয়া প্রস্থান করিল। কুসুম তাহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই, আশঙ্কায় সর্ব্বশরীর তাহার হিম হইয়া আসিতেছিল, সে প্রতিবাদ করিতে পারিল না। একান্ত অসহায়ের মত মনে মনে সে অনিবার্য্য দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া লইল। বৃক্ষ হইতে পদস্খলিত ব্যক্তি যেমন করিয়া ভূমিতলে চূর্ণীকৃত হইবার অপেক্ষায় কাঁপিতে থাকে কুসুমও তেমনি করিয়া অন্তরে অন্তরে কাঁপিতে লাগিল।

ষষ্ঠিচরণ হাটে গিয়াছে।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে গুরুচরণ এক কলিকা তামাক সাজিয়া দাওয়ায় বসিয়া পরম নিশ্চিন্তে খাইতেছিল। দৈনন্দিন সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়াছে, দিগম্বরী হাতে হাতে সাহায্য করিয়াছে। এ কয়দিনে উপবাস বেশ সহ্য হইয়া গিয়াছে, এখন তেমন কষ্ট হয় না কেবল দুপুরে তীব্র তীক্ষ্ণ রৌদ্রে

যখন গাছপালা ক্লান্ত রৌদ্রতপ্ত পথিকের মত অবসাদে ঝিমায় তখন গুরুচরণের পিপাসার্ত্ত কণ্ঠ বার বার শুকাইয়া যায়। বেলা পড়িয়া আসিলে শরীরটা যেন একটু সতেজ মনে হয়—সে অতি ধীরে ধীরে হুঁকা টানিতেছিল কিন্তু একদিকে নবীন ও অন্যদিকে কুসুম তাহার সমস্ত অন্তরাকাশ ছাইয়া ছিল। কুসুমের এই আকর্ষণ, ভালবাসা কি তাহাকে নবীনের মত অন্ধ করিয়া দিবে, সমস্ত অন্তরকে জগতের মাঝে বিস্তৃত করিয়া দিবে?

দিগম্বরী বারান্দা ঝাঁট্ দিতে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। স্বপ্নাবিষ্ট গুরুচরণের শ্লথ তামাকু সেবন সে দেখিল। এই রুক্ষ চুল, ধূলি অবলুপ্ত দেহ হয় ত তাহার করুণা আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। দিগম্বরীকে সে লক্ষ্য করে নাই, আনমনে বসিয়াছিল! দিগম্বরী প্রশ্ন করিল—হেই, তোর উপোস লেগেছে?

গুরুচরণ একটু হাসিয়া বলিল—না। তোর মত কচি খুকী কিনা!

দিগম্বরী অন্য সময় হইলে হয় ত অমনি তীক্ষ্ণ একটা জবাব দিত কিন্তু এখন চুপ করিয়া গেল। উপবাসক্লিষ্ট গুরুচরণকে সে পীড়া দিতে ইচ্ছা করে না। গুরুচরণই প্রশ্ন করিল—মা কোথায় রে?

—মা হলুদ কুটতে গেছে কেদারের বাড়ীতে।

—এদিকে আয়, শোন—

—বল্ না, কানে ত তুলো দি নি—

—কুসুম কি বল্‌লে রে তোকে?

—কুসুম কুসুম করিস্ কেন, সে তোর কে?

—তোর সই, আমারও সই।

—কুসুমকে তুই ভালবাসিস্।

—তোর মত না।

—মরণ আর কি, কুসুমের কপাল পুড়েছে!

আরও কয়েকটি অবান্তর কথার পরে দিগম্বরী সহসা বলিল—আড়ং কবে?

—সোমবারে?

—তুই যাবি?

—যাবোই ত, নিশ্চয়ই যাবো। কেন?

গুরুচরণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দিগম্বরীর মুখের পানে চাহিল। গুরুচরণ এতদিন যাহা দেখে নাই, আজ সহসা সে তাহাই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। দিগম্বরীর বালিকাসুলভ মুখশ্রী কবে কোনদিন যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। সমগ্র মুখে বয়ঃসন্ধির একটা ললিত পেলব কমনীয়তা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যের শীর্ণতা যাইয়া বয়সের পূর্ণতা দেখা যাইতেছে। হাতে পায়ে মেদ সঞ্চিত হইয়া তাহাকে সুডৌল সুন্দর করিয়াছে, মধ্য পূর্ব্বের মতই ক্ষীণ কিন্তু নিবিড়তাপ্রবণ নিতম্বের তুলনায় তাহা আজ ক্ষীণতর—বস্ত্র সুসংযত করিয়া পরিধান করা আজ সে শিখিয়াছে—একেবারে বিনা প্রয়োজনেই নহে। অস্তমিত সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি কেমন করিয়া যেন তাহার মুখে প্রতিফলিত হইয়াছে, সমগ্র মুখখানি স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। গুরুচরণ তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছিল—দিগম্বরী যে কুসুমের মতই সুন্দরী তাহা সে পূর্ব্বে লক্ষ্য করে নাই, বর্ণটা তাহার কিছু মলিন কিন্তু আজ তাহা যেন সোনার জলে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। স্পর্শমণির স্পর্শে সুপ্ত যৌবন জাগিয়া উঠিয়াছে। গুরুচরণ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহাই দেখিতেছিল। দিগম্বরী কাপড়টাকে সংযত করিয়া বলিল—কি দেখছিস্?

—তোর রূপ খুলেছে, তাই।

—ধ্যেৎ, বড্ড বদমাইস।

—আড়ংএর কথা জিজ্ঞেসা করলি কেন? কি আনবো তোর জন্যে?

—তুই কি আমার জন্যে আনবি? কুসুমকে দিবি ত সব!

গুরুচরণ বুঝিল দিগম্বরী যতই ছেলেমানুষ হোক, গুরুচরণের সহিত কুসুমের ঘনিষ্ঠতা সে প্রীতির চক্ষে দেখে না। সে তাই রহস্য করিল—তোরা ভাগ করে নিস্—

—সত্যিই দিবি?

—হ্যাঁ, কি চাই বল না?

দিগম্বরী অপরাধীর মত যেন চাহিবার অধিকার নাই এমনি ভাবে বলিল—কাচ-পোকার টিপ আর খোঁপার চিরুণী আনবি?

—নিশ্চয়ই আনবো, কেমন? দিগম্বরীর এই আন্তরিকতায় গুরুচরণ খুশীই হইল।

উঠানের কোণে রাঙাদির কণ্ঠ শোনা গেল, দিগম্বরী গৃহকর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়াই ছুটিয়া পালাইল। দিগম্বরী যতই ছেলেমানুষ হোক, সে যে গুরুচরণের কেহ একথা সে বোঝে, নইলে তাহার পক্ষে এ প্রার্থনা আজ সম্ভব হইত না। গুরুচরণ মনে মনে আনন্দিত হইল। দিগম্বরী যদিও আজ বুঝিয়াছে যে তাহার অধিকার আছে, কিন্তু তাহার অধিকার কতটুকু তাহার পরিসর কতদূর ব্যাপ্ত তাহা সে জানে না। গুরুচরণ স্থির করিল, তাহার বাবা বা মায়ের কাছে কেন চাহিল না, তাহা সে জিজ্ঞাসা করিবে।

রাঙাদি আসিয়া দাওয়ায় বসিয়া বলিল—কিরে গুরো, কি করিস্?

—দেখছোই ত দিদি, রাধিকার পথ চেয়ে চেয়ে গেল আমার কাজল পরা দু'টী আঁখি। রাঙাদি দন্তহীন মুখ বিকৃত করিয়া হাসিতে চেষ্টা

করিয়া বলিল—রাধিকার পথ চাইলেই কি রাধিকা আসে, রাধা যে মেয়েমানুষ ; বিন্দের মুখে খবর নিয়ে যেতে হয় কুঞ্জে।

গুরুচরণ রসিকতাই করিল—রাধাই ত এসেছে। গুরুচরণ একটী গান ধরিতে যাইতেছিল। বাধা দিয়া রাঙাদি বলিল, রাধা নয়, রাধা নয়, বিন্দে—

—তুমি কি বিন্দে দূতী হ'লে এত দিনে ?

—হ্যাঁ রে, আয়ান ঘোষ যে হাটে গেছে—এ খোঁজ না পেলে কুঞ্জে যাবে কি ক'রে, তাই বিন্দের দরকার—

গুরুচরণ আশ্চর্য্য হইয়া রাঙাদির মুখের পানে চাহিয়া বলিল—তার মানে ?

রাঙাদি নিম্নস্বরে এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—বলি পীরিত ক'রতে হ'লে বিন্দের দরকার। ঘটাব আমি, খবর দেব আমি, নইলে নিজেরাই মুস্কিলে পড়বি। শেষে ধরা পড়বি যে !

গুরুচরণ আরও অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এ সব কি বলছো ?

—বলি, কুসুমই খবর দিয়েছে, রসিক বেটা ত গেছে হাটে, নইলে আমি আস্‌বো কেন ? যা এখুনি—

গুরুচরণ কথাটা বিশ্বাস করিল না। রাঙাদির যৌবনের অনেক কেচ্ছা-কাহিনী তাহার জানা ছিল। কুসুম আর যাহাই হোক এতখানি ইতর সে কখনও হইবে না, কুসুম তাহাকে ভালবাসে কিন্তু রাঙাদি যাহা বুঝিয়াছে সেটা কেবলমাত্র তাহাই নহে।

গুরুচরণ একটু তিক্তকণ্ঠেই বলিল—কেন পরের নামে শুধু শুধু মিথ্যা কথা বল রাঙাদি, আমি কুসুমের কে, যে সে আমাকে গোপনে দেখা ক'রতে বলবে ?

রাঙাদি মুখ নাড়িয়া বঙ্কিম গ্রীবাদেশ স্কন্ধের উপরিভাগে প্রায় স্পর্শ করিয়া বলিল—ঢং ত্যাখো ছোকরার! আমাকে কি কচি খুকী পেলি গুরো! সেদিন গোয়ালের পিছনে কুসুম ডেকে নিয়ে কি বললে? তোমার সঙ্গে কি ভাগবত গীতা আলোচনা করলে?

গুরুচরণ একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—ও তাই! তুমি জানলে কি করে?

—ত্যাখ্ গুরো, বুড়ো হয়েছি বটে কিন্তু চোখের মাথা খাই নি—ও কর্ম্ম বহু দেখেছি।

যেমন করিয়াই হোক রাঙাদিকে শান্ত করা প্রয়োজন, গুরুচরণ তাই একটু হাসিয়া আত্মীয়তার সুরে বলিল—এ বয়সে দূতীগিরি করার সাধ তোমার একেবারে যায় নি তা হ'লে।

সার্ব্বজনীন রাঙাদি খুসী হইয়া বলিল—হ্যাঁরে হ্যাঁ, রাধা কৃষ্ণ কারও বিরহ আমার সয় না।

রাঙাদি চলিয়া গেল কিন্তু রাঙাদির আগমন ও প্রস্থানের এই আকস্মিক দুর্ঘটনাটা তাহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। কি কুক্ষণে কুসুম তাহাকে সমবেদনা জানাইতে আসিয়াছিল! কে জানে, ইহাই কত অনর্থের মূল হইবে! এই কথা যদি রাঙাদির স্ব-কপোল কল্পিত অলঙ্কার ভূষিত হইয়া রসিকের কাণে পৌছায় সে কখনই তাহাকে ক্ষমা করিবে না। কুসুমের জীবন সংশয় হইবে, হয় ত—কে জানে দুর্নিবার ঈর্ষা তাহাকে কোথায় পৌছাইয়া দিবে। গুরুচরণ এই অনাঘ্রাত বিপদের জন্যে নিজেকে খানিকটা দায়ী করিয়া মনে মনে বলিল—সে যদি কুসুমকে এড়াইয়া চলিত তবে হয় ত আজ এ বিপদ দেখা দিত না। দুইটী প্রাণী আজ রাঙাদির সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আছে।

দিগম্বরী পুনরায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রাঙাদি কি বললে রে?

—তোর তা দিয়ে দরকার কি ?

—দরকার আছেই ত, ফিস্ ফিস্ করলি কেন ?

—তবে কি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবো ?

—বলবি নে ?

—বাজে ফাজলামি, তার আবার শুনবি কি। যা, মা এসে পড়বে।

—আমি সব বলে দেব। হ্যাঁ।

—দিবি ত দিবি, কি হবে ? ফাঁসী ?

দিগম্বরী চলিয়া গেল। গুরুচরণ তাহাকে লক্ষ্য না করিয়াই পুনরায় কল্কিতে ফুঁ দিতে আরম্ভ করিল।

ষষ্ঠিচরণ হাট হইতে ফিরিবার আগেই গুরুচরণ দত্ত মহাশয়ের মণ্ডপে চলিয়া গিয়াছে। ষষ্ঠিচরণ দাওয়ায় বসিয়া হাঁকিল—বৌমা, এক হাতা আগুন দিয়ে যাও ত মা, মালসায় ত আগুন তোলা হয় নি।

দিগম্বরী হাতায় করিয়া এক হাতা আগুন লইয়া আসিল, বিপরীত দিক হইতে নবীন আসিয়া দাওয়ার উপর মেটে-মোড়ায় বসিয়া বলিল—বেশ ষষ্ঠিদা, বৌমা এরই মধ্যে একটু কাজকর্ম্ম শিখে ফেলেছে দেখছি—তা গুরোর কি সেবা যত্ন একটু করে—

ষষ্ঠি হাসিয়া বলিল—কি জানি ! আড়ালে আড়ালে একটু ঝগড়া ত করে—

দিগম্বরী হাতাশুদ্ধ আগুন ঢপ্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া গেল। সমস্ত বারান্দায় আগুন ছিটকাইয়া পড়িল। ষষ্ঠি হাত দিয়া আগুন তুলিতে তুলিতে বলিল—দেখলে কাণ্ডটা ! না, বৌমা আমাদের একেবারেই ছেলেমানুষ।

নবীন হাসিয়া বলিল—তা মাঝে মাঝে একটু বৈরক্তি ত করবেই তা নইলে আর আনন্দ কি? রোদ আছে বলেই বৃষ্টির দাম, অন্ধকার আছে বলেই আলোর তারিফ।

ষষ্ঠি সংক্ষেপে বলিল—হুঁ। ক্ষণিক পরে একটু হাসিয়া বলিল—গুরোর মা ছিল এমনি, যদি বলতাম তামাক সেজে দে, তবে কল্‌কে ভরে আগুন দিয়ে উপরে তামাকু ছিটিয়ে দিত। ষষ্ঠি হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন মস্ত বড় একটা রসিকতা হইয়া গিয়াছে। নবীনও মহাতৃপ্তির সহিত খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল—বৌমা আমাদের কিন্তু অমনটি নয়, আগুনটা ছিটিয়ে দেয় এইমাত্র।

ষষ্ঠি আবার হাসিল। নবীন আবার হাঁকিল—বৌমা, একটু খাওয়ার জল দাও ত, শেষবেলায় খেয়ে একেবারে প্রাণটা আইঢাই ক'চ্ছে। দেখো, জলটা আবার ছিটিয়ে না যায়।

ষষ্ঠি বলিল—তুমি বসো নবীনদা, আমি একটু ঘাট থেকে আসি। ষষ্ঠি চলিয়া গেল।

দিগম্বরী সলজ্জ পাদক্ষেপে এক ঘটি জল আনিয়া নবীনের সামনে রাখিল। নবীন বৃদ্ধ এবং বৈরাগী, কাজেই গ্রামের সমস্ত ঝি বধূই তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে কথা বলিত। নবীন বলিল—বৌমা, গুরো কোথায়?

দিগম্বরী বলিল—জানি না।

নবীন হাসিয়া বলিল—কি করে না করে তা জানা দরকার।

—আমি জানতে যাবো কোন্ দুঃখে?

নবীন অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—রাঙাদি এখানে আসে নাকি রে?

—আমার কাছে আস্‌বে কেন? ওর কাছে এসেছিল।

নবীন বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া যেন আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল—ওর

কাছে? নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া নবীন বলিল—ওর কাছে, ও কে বৌমা!

দিগম্বরী হাসিয়া ফেলিয়াছিল, বলিল—জানি না।

যাহা হৌক নবীন নিশ্চিন্ত হইল। দিগম্বরী কিছু সন্দেহ করে নাই, তাহার ভাগ্যে যে কি বিড়ম্বনা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে সে তাহা জানে না। প্রশ্ন করিল—কি বললে?

—কি ফিস্ ফিস্ করলে।

—ফিস্ ফিস্ করলে!

—হ্যাঁ, কি কেষ্ট রাধা সব বল্লে। রাঙাদি নাকি বিন্দে দুতী! দিগম্বরী হি হি করিয়া হাসিয়া ছুটিয়া পলাইল।

নবীন একটা অজ্ঞাত অথচ অবশ্যম্ভাবী বিপদের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছিল, সে মনে মনে কি যেন একটা সঙ্কল্প করিয়া উঠিয়া পড়িল। জল পড়িয়া ছিল, দিগম্বরী দরজার অন্তরাল হইতে বলিল—জল খেলে না?

—ওঃ। নবীন তৃষিত কণ্ঠে ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটি জল ঢালিয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনীভূত হইয়া উঠে নাই। মাঠ ও নদীর চর অস্তমিত সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোয় বেশ আলোকিত কিন্তু গ্রামের বৃক্ষছায়ায় অন্ধকার অস্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে।

নবীন দ্রুতপদে চলিতেছিল। বাহিরের আল দিয়া নহে। দত্তদিগের আমবাগান ও পরিত্যক্ত আগাছার জঙ্গলের ভিতর দিয়া সংকীর্ণ পথে। রসিকের বাড়ীটা আবার একটু ফাঁকায়—জঙ্গলের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া

সে মাঠটার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—কোথাও কেহ নাই। এই মাঠটুকু পার হইলেই টিলার উপর রসিকের বাড়ী, বাড়ীর নীচে সামান্য একটু বাঁশ ও বন্য বৃক্ষের বন। নবীন দ্রুত পায়ে মাঠটা পার হইয়া বাঁশবনের স্বল্প অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল।

খড়ের গাদার পাশ দিয়া একটা পথ নামিয়া আসিয়াছে, দুইটী প্রাণী পথের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। স্পষ্ট চেনা যায় না, কিন্তু রুক্ষ স্ফীত বাবরী চুল গুরুচরণকে অবয়বেই চেনা যায়, আর একজন অবশ্যই কুসুম।

কি যেন একটা প্রশ্নের উত্তরে কুসুম অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে কহিল—আমি কি করবো?

—তুমি বলেছ।

—না, সে নিজে এসেছে, আমি জানি না।

—ভাল কিন্তু—

আরও কয়েকটি কথার পরে গুরুচরণ যেন কহিল—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য!

কুসুমও যেন একটা সান্ত্বনা পাইয়াছে এমনি ভাবে বলিল—তাই! তাই হোক বন্ধু। এখন যাও, ও আবার হাট থেকে এসে পড়বে।

নবীন অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। অভুক্ত ঘুঘু, সুদূর গ্রামের বিধবা মেয়ে আর নিষ্পত্র শীতার্ত্ত বৃক্ষ যেমন করিয়া তাহার চোখ দুইটী সজল করিয়া দেয় আজ গুরুচরণ ও কুসুমের এই গোপন সাক্ষাৎও তাহাদিগকে তেমনই সজল করিয়া দিল। নবীন ভাবিল, আজ কুসুম ও গুরুচরণ যে স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে তাহা দুইজনকেই আবর্ত্তে পৌছাইয়া দিবে, আর সরলতার মূর্ত্তি নিষ্পাপ দিগম্বরী দীর্ঘশ্বাসের সহিত কেবল তাহাই দেখিবে আর মনে মনে আহত গুরুচরণকে করুণা করিবে

—বঞ্চিত তাহার দাম্পত্য জীবনের মাঝে সে নিরুপায় আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া চলিবে। নবীন ভাবিতে পারিল না—দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার শুভ্র শ্মশ্রু বাহিয়া বুকের কাছে নামিয়া আসিল।

গুরুচরণ চলিয়া যাইতেছিল—নবীন অন্ধকার হইতে দৃঢ়মুষ্টিতে গুরুচরণের একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল। গুরুচরণ শঙ্কিত বিস্ময়ে নবীনের মুখের পানে চাহিয়া একটী মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ও তুমি নবীনদা!

—হ্যাঁ। গুরো, আমাদের বৌমার কি হবে?

গুরুচরণ হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—কি আবার হবে, আমি কি দেশান্তরী হয়ে যাচ্ছি।

নবীন কাতর কণ্ঠে কহিল—এতে কি মঙ্গল হবে গুরো! কি লাভ! কুসুমই কি সুখী হবে—যেদিন বিধ্‌বে হ'য়েছে সেইদিনই ত সে খুন হ'য়েছে—তোরা সকলে মিলে আর তাকে খুন করিস্‌ নে। তোদের জন্যে তার আর বেঁচে থাকাই চল্‌বে না। শেষে আমার মত হ'য়ে······মেয়ে মানুষ কি ক'রবে? নবীন কুসুমের অনিবার্য্য বেদনাহত পঙ্গু জীবনের কথা ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গুরুচরণ বুঝিল, যেমন করিয়াই হোক্ নবীনদা সবই বুঝিয়াছে কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব নাই। আজ ঘটনাস্রোত যেখানে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখান হইতে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসা যায় না। সে তাই বলিল—তুমি ভেবো না নবীনদা, তোমার বৌমার কিছু হবে না। গুরুচরণ জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল।

নবীন ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাবিল, উৎসবের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনাময় ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ আঙিনায় দিগম্বরী যখন তাহার যৌবনের উদ্দাম উচ্ছল উৎসব বাসনা লইয়া আসিয়া পৌঁছিবে তখন সে দেখিবে যে, সেখানে

আর উৎসবের অনুপ্রেরণা নাই, পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার পানে চাহিয়া সে কেবল দীর্ঘশ্বাস মোচন করিবে।

নবীন ধীর পদক্ষেপে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—কুসুম।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ দিয়া কুসুম আনমনে বসিয়াছিল, চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। নবীনকে দেখিয়া বিনীতস্বরেই অভ্যর্থনা করিল—এস বৈরাগী-ঠাকুর। এমন অসময়ে?

—হ্যাঁ, এলাম এমনিই। দাওয়ায় বসিবার জন্যে একটা কিছু সে খুঁজিতেছিল, কুসুম একখানা পীঁড়ি বাহির করিয়া দিয়া বলিল—বসো, পান দেব?

—দাও। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

কুসুম তাহার স্বভাবসুলভ প্রগল্‌ভ হাসিতে সমস্ত মুখখানি উজ্জ্বল করিয়া কহিল—আমার সঙ্গে আবার কি কথা!

—হ্যাঁ।

কুসুম পান দিল। নবীন পান লইতে লইতে কুসুমের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল—বসো দিদি, বসো।

নবীনের আকর্ষণে বিব্রত হইয়া কুসুম বলিল—বসছি, বসছি।

নবীন অশ্রুসজল বেদনার্ত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—এতে লাভ কি?

কুসুম আবার হাসিয়া বলিল—কিসের?

—রসিক তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে দিদি, তার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে ত লাভ নেই, আর গুরো ত ছেলেমানুষ, বোমা ত ডাগর হয়ে উঠল বলে।

কুসুম মনে মনে শঙ্কিত হইয়াছিল কিন্তু মুখে একটু হাসিয়া বলিল—এ সব কি কথা! আমি কি করেছি?

—যাই করে থাকো, তা তুমিই ভাল জানো, কিন্তু ভালবাসা যেখানে

আছে সেখানে কি কেউ অনিষ্ট করতে পারে, গুরুচরণের অমঙ্গল হতে পারে এমন কাজ তুমি কখনও করতে পার না। তা আমি জানি, কিন্তু তুমি ত না বুঝেই অমঙ্গল করতে পারো, সে কথাটা একবার ভেবে দেখো—

কুসুম ধরা পড়া চোরের মত চুপ করিয়া রহিল কিছু বলিল না।

নবীন বলিল—এখন কে এসেছিল ?

কুসুম তবুও জবাব দিল না।

—বল না, আমার কাছে তোমার ভয় নেই—এ জগতে আমি কারও অনিষ্ট করি নি।

কুসুম জড়িত কণ্ঠে বলিল—কই, কেউ ত আসে নি।

নবীন একটু হাসিয়া বলিল—গুরো এসেছিল তা আমি জানি, আজ আমি যেমন করে জানলুম এমনি করে একে একে দু-চার জন জানবে, তাদের কাছে শুনে দশ জন জানবে। তারপর তুমি কি করবে, আর রসিকই বা কি করবে ?

কুসুমের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, সে ত কিছুই করে নাই, গুরুচরণকে সে ভালবাসে। কিন্তু আজ সে ত তাহাকে ডাকে নাই। সে ত দূরে দূরেই আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ফিরিতেছে কিন্তু সে আসিলে মুখের উপর 'যাও' বলিতে সে পারে না, তাহার জন্যে সে ত দায়ী নহে। গুরুচরণকে ভাল না বাসিয়া পারা যায় না। কিন্তু রাঙাদি আজ তাহাকে ঠেলিয়া নামাইয়া দিতেছে, কোন অবলম্বনকে আকর্ষণ করিয়াও সে আর নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। কুসুম জবাব দিল না, কিন্তু শঙ্কায়, দ্বিধায়, অনাগত আশু বিপদের সম্ভাবনায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে জবাব দিল না কিন্তু দুইটি চোখ জলে ভরিয়া টল টল করিতে লাগিল, তাহাকে সংযত করিতে যাইয়া পেশী সঙ্কুচিত করিতেই মুক্তার মত দুই ফোঁটা অশ্রু গালের উপর নামিয়া আসিল।

নবীন চাহিয়া চাহিয়া সাম্‌নে লালাভ আলোকে স্বল্পালোকিত কুসুমের মুখখানি দেখিতেছিল, অকস্মাৎ দুইফোঁটা অশ্রুকে আলো-প্রতিবিম্বনে ঝিকমিক করিতে দেখিয়া নবীন দুঃখিত হইল, এমনি করিয়া তাহাকে কাঁদাইতেই কি সে আসিয়াছে। কুসুমের হাত ধরিয়া মিনতি ভরা সুরে সে কহিল—না দিদি, রাগ করো না, আমার দ্বারা কোন অনিষ্ট হবে না তোমার। তোমার কথা আমায় বলো, আমি যথাসাধ্য উপকার তোমার করবো কিন্তু রাঙাদিকে বিশ্বাস করো না লক্ষীটি। তাকে আসতে দিও না।

—কিন্তু সে যে আসে।

—আসুক কিন্তু কিছু বলো না তাকে—এমন অনর্থ নেই যা সে ঘটাতে না পারে। কুসুমের এই সলজ্জ বেদনার্ত্ত মুখখানি দেখিয়া নবীনের অনুশোচনা হইতেছিল, কি জানি কি ভাবিয়া তাহার চির-সজল চোখ দুইটি আবার সজল হইয়া উঠিল।

উঠানের এক কোণ হইতে রসিক হাঁকিল—কুসুম।

কুসুম ধড়মড় করিয়া ঘর হইতে সওদা রাখিবার জন্যে ধামা আনিতে গেল। কিন্তু ধামা আনিবার বহুপূর্ব্বে রসিক আসিয়া দাওয়ায় পৌছিয়া গেল। কুসুম ঘরের মধ্যে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিতে কিছু বিলম্ব করিয়া ধামা লইয়া আসিল। রসিক নবীনকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল, প্রশ্ন করিল—গরীবের দুয়ারে হাতীর পাড়া! নবানদা নাকি?

নবীন বলিল—হ্যাঁ। এমনিই এলাম।

নবীনের কণ্ঠস্বর তখনও ভিজা ছিল। রসিক কৌতুক-প্রশ্ন করিল—ঘুঘু মারা গেল নাকি যে কাঁদছো?

কুসুম হাসিয়া পরিহাস করিল—ঘুঘু নয়, ঘুঘুর বেটার বৌ মারা গেছে

কিনা। অন্য কেহ যদি হইত তবে তাহাকে এইরূপ অবস্থায় কুসুমের নিকট বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রসিক হয় ত অনেক কিছুই ভাবিতে পারিত। কিন্তু নবীন এ সকলের উর্দ্ধে কাজেই রসিক কেবল রসিকতাই করিল। কুসুমের পরিহাস শুনিয়া রসিক হাসিতে হাসিতে বলিল—ও বেটার বৌ ? আহা নবীনদা তোমার বেয়াইএর কি অবস্থা।

এবার কুসুম হাসিল—সেই প্রগলভ অশোভন হাসি। নবীন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—এখন যাই রসিক।

রসিক হুঁকা খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল—দাঁড়াও, তামাক খেয়ে যাও। এত তাড়া কি ?

আজ হাজরা ভাঁটার রাত্রি।

মাঠের অপরপ্রান্তে হাজরা বৃক্ষের নীচে পূজা সমাপন করিতে হইবে। সন্ন্যাসী খবর আনিয়াছে যে কাঞ্চনপুরের শ্মশানই সন্থ। আজই তাহাতে শবদাহ হইয়াছে। পূজার জন্যে এইটিই প্রশস্ত।

দত্ত বাড়ীর উঠানে লোক সমাগম আজ বেশী। হাজরা ভাঁটার যাত্রাকালে সকলেই উপস্থিত থাকিতে উৎসুক। মণ্ডপের পিছনে নানারূপ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের সমাহারে ভোগ রচনা হইতেছে। বড় সন্ন্যাসী উপবাসী থাকিয়া নিষ্ঠা সহকারে তাহা রচনা করিতেছে। সম্মুখের প্রাঙ্গণে বলির মেষ সিন্দূর শোভিত হইয়া মন্ত্রপূত হইবার জন্যে অপেক্ষা করিতেছে। এক প্রহর রাত্রির পরে সকলে যাত্রা করিবে, গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমবেত হইয়া সন্ন্যাসীগণের যাত্রার মাঙ্গলিক কার্য্যাদি করিবে।

আজ প্রাঙ্গণে তুঁষের মধ্যে কেরোসিন দিয়া কয়েকটি স্থানে আলো দান করা হইয়াছে—তাহারই উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত উঠান আলোকিত।

দত্ত মহাশয় নিজে তাহার তাদারক করিতেছেন, দত্ত গৃহিণী নিজে পূজার সামগ্রী সরবরাহ করিতেছেন। দত্ত মহাশয়ের পুত্র সমবেত ভদ্রমহোদয়-গণের বসিবার ও তামাক পানে অভ্যর্থনা করিতে ব্যস্ত।

গুরুচরণ সন্ন্যাসী ও বালাগণের সহিত যাইবে। নিবারণ বালা 'উড়োভোগ' লইয়া যাইবে। রসিক গুরুচরণকে একান্তে ডাকিয়া বলিল—তুই যাবি গুরো?

—হাঁ, যাবোই ত।

—হ্যাঁ, খুব সাবধান, পথ ভুল করিস নে, যেখানেই যাস ঢাকের বাজনাকে ঠিক কাণে রাখবি, যাতে সেদিকে যেতে পারিস।

গুরুচরণ রসিকের এই অহেতুক ব্যস্ততা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—আমি কি নতুন হাজরা পূজোয় যাচ্ছি রসিকদা? ব্যস্ত হয়ো না।

রসিক বলিল—হ্যাঁ একটী কথা, কুসুমের কি হয়েছে জানিস?

—কেন, কি হ'ল?

—কি জানি, কথাবার্ত্তাই বলে না, আগে কত কথাই বলত আমার কাছে, আর আজকাল জিজ্ঞাসা করলে 'হু' 'না' বলেই শেষ করে। চেহারা কি হয়েছে দেখেছিস—বোধ হয় ও খায় না। কেন এমন হ'ল?

গুরুচরণ ব্যস্ততার সহিত প্রশ্ন করিল—কেন?

—তাই ত বুঝতে পারছি না।

—তোমার উপর রাগ করেছে।

—কেন?, আমি ত কিছু করি নি বরং কেবল তাকেই ত সাধছি।

গুরুচরণ কিছু কিছু অনুমান করিয়াছিল—আজ কুসুম হয় ত তাহাকে ভালবাসিয়াই এইরূপ হইয়াছে। আজ শঙ্কায়, অনিবার্য্য লাঞ্ছনার ভয়ে সে হয় ত ম্রিয়মাণ—হয় ত মনে মনে সে নিজের অপরাধ ঠিক করিয়া

অনুশোচনা ভোগ করিতেছে। গুরুচরণ তাই বলিল—সেরে যাবে, মন খারাপ আছে হয় ত।

রসিক বলিল—খারাপ হবে কেন ?

—মাঝে মাঝে হয়। তুমি ভেবো না।

কোন কার্য্যব্যপদেশে গুরুচরণের ডাক পড়িল। গুরুচরণও তাড়াতাড়ি ভোগের উঠানের উদ্দেশে রওনা দিল।

একেবারে ভিতরবাড়ীর উঠান ও বাহিরের প্রাঙ্গণের মাঝে যে বাঁশের বেড়ার অন্তরাল ছিল তাহার গায়ে ঠেস দিয়া কুসুম দাঁড়াইয়াছিল। সম্মুখে জনাকীর্ণ প্রাঙ্গণ—উৎসব মত্ত। কিন্তু কুসুম বিষাদ করুণ উদাস দৃষ্টিতে কেবল সেইদিকে চাহিয়াই ছিল, কোন কিছুই আজ সে লক্ষ্য করিতেছিল না। গুরুচরণ, রসিক, ব্যস্ত জনসাধারণ সকলেই আজ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে অত্যন্ত ঝাপসা—একান্তই অবান্তর। কোন এক সুদূর ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া তাহার অন্তর বারবার শিহরিয়া উঠিতেছিল এবং অনুশোচনায় আত্মকৃত অপরাধের গ্লানিতে সে মনে মনে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল। চিন্তাধারা সুসংবদ্ধ ছিল না, কিন্তু তাহার মাঝে আতঙ্কটাই তাহার প্রবল ও বেগবান হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন সদ্যপুষ্পহাসা রমণীর প্রগলভতা ও রুক্ষ সৌন্দর্য্য লইয়া সে গুরুচরণকে স্বেচ্ছায় খেলার ছলে দুর্নিবার আকর্ষণে টানিয়া কাছে আনিয়াছে,আজ সে কেমন করিয়া তাহার আলিঙ্গনরত শক্তিশালী দুর্ব্বার হাত দুইখানিকে প্রত্যাখ্যান করিবে ? আজ সে নিরুপায়—একান্ত অসহায়ের মত সে রাঙাদির হাতের ক্রীড়নক রূপে গুরুচরণের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আজ হৌক, কাল হৌক তাহাকে বিদায় লইতেই হইবে—রসিককে প্রবঞ্চনা সে কোনমতেই করিতে পারে না, সে তাহার একমাত্র আশ্রয়। অত্যন্ত বদান্যতার সঙ্গেই সে সেই

আশ্রয় দান করিয়াছে। রসিককে সে একদা ভাল না বাসিয়াছিল এমন ত নয়।

নবীন ভীড়ের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা কাজ করিতেছিল। উঠানের মশালের আলোয় আলোকিত ম্রিয়মাণ একক কুসুমের মুখখানি অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িয়া গেল। উৎসবের প্রান্তে কাঙালিনীর মত একান্তে দাঁড়াইয়া আছে। নবীনের কারুণ্য ভারাক্রান্ত অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিল, সে নিভৃতে যাইয়া ডাকিল—কুসুম, দিদি, এখানে দাঁড়িয়ে যে একা!

কুসুম বলিল—এমনি।

—এমনি এরকম করে কি দাঁড়িয়ে থাকতে আছে? আজকার দিনে দুঃখ করতে নেই।

কুসুম ক্ষীণ একটু হাসিয়া বলিল—দুঃখ কিসের? আমার কোন দুঃখ নেই।

নবীন কহিল—না, না, দুঃখ করো না, আমি আছি, তোমার সহায় আছি, কিছু চিন্তা করো না।

কুসুম কিছু সান্ত্বনা পাইল না, তবে বলিতে হয় তাই বলিল—বেশ ত। তুমি থাকলে আর ভয় কি?

কর্ম্মব্যস্ত নবীন চলিয়া গেল। কিন্তু এমনি ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার যেন আর ইচ্ছা করিতেছিল না। সে বাড়ী যাইবে বলিয়া রসিককে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল কিন্তু জনারণ্যের মধ্যে কোথায় রসিক? তাই নিশ্চেষ্ট হইয়া সে দাঁড়াইয়াই রহিল।

গুরুচরণ যেন কি কারণে একেবারে সামনে আসিয়া পড়িল কিন্তু কুসুম কিছুই বলিল না। গুরুচরণ তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইল, গুরুচরণকে দেখিয়া এমনি উদাসীনভাবে সে তাহাকে কখনও উপেক্ষা করিতে পারে না। গুরুচরণ কহিল—কি সই, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

কুসুম দ্বিধায় কোন জবাব দিল না। সংক্ষেপে বলিল—তোমার বন্ধুকে একটু ডেকে দেব?

—ও, আচ্ছা তা দেব, কিন্তু কেন?

কুসুম আর কিছু কহিল না।

ক্ষণিক পরে রসিক আসিয়া বলিল—ডাকছ কেন?

—বাড়ী যাব, ভাল লাগছে না।

রসিক বিরক্ত হইয়াছিল, বলিল—দাঁড়া, ওরা ভোগ নিয়ে না বেরুলে যাই কি করে। ওরা রওনা দিলে আমরাও বাড়ী যাবো।

—কত দেরী হবে যে!

—ওই ত তোর দোষ, না এসেও ছাড়বি নে আবার এলেও তর সয় না।

কুসুম আর কথা কহিল না—রসিক কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল।

মেষ মন্ত্রপূত হইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। সন্ন্যাসী ও বালাগণ 'উড়োভোগ' লইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। এখন ঢাকীর চালানে শেষ কলিকা গাঁজার উন্মাদনা লইয়া রওনা দিলেই হয়।

দত্ত মহাশয় ঘোষণা করিলেন—রাত্রি প্রহরেক অতীত হইয়াছে, এখন পূজাসম্ভার লইয়া রওনা দেওয়া যাইতে পারে।

রুক্ষচুল সন্ন্যাসী ও বালাগণ মাজায় গামছা বাঁধিয়া, মালকোচা দিয়া কাপড় পরিয়া জবাফুলের মত রক্ত আঁখি লইয়া প্রস্তুত হইল। নেশার উত্তেজনার, এক'টি দিনের কৃচ্ছ্রসাধনায় শরীরের মধ্যে একটা অবসতা, অন্তরে উন্মত্ত ভৈরবের উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসীর রক্তাম্বর মশালের আলোয় যেন রক্তকণা বিচ্ছুরিত করিয়া দিতেছে। হীরালাল প্রবল আঘাতে ঢাকে বিদায় বাদ্য আরম্ভ করিল—সমবেত জনতার বিপুল

উল্লাসধ্বনি, মহিলাগণের মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি ও শঙ্খের ফুৎকার নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে ফাটিয়া পড়িল।

এই জয়োল্লাসের মধ্যে, বলির মন্ত্রঃপুত মেষ ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সে অদূরের অন্ধকারের মাঝে দ্রুত ভীত পায়ে অদৃশ্য হইয়া গেল—পিছনে পিছনে উন্মত্তের মত ঢাকি তাহার ঢাক লইয়া নীচু হালটে নামিয়া পড়িল—তাহার পিছনে রক্তাম্বর পরিহিত সিন্দূর শোভিত উন্মাদ সন্ন্যাসিগণ তাহাদের অচেতন দেহকে দ্রুতবেগে চালিত করিল। দ্রুত-ধাবনের দৃশ্য, ভীষণতায় কোলাহলে অসাধারণ। দ্রুত উল্লাস ও জয়ধ্বনির মাঝে অত্যন্ত বিমনাদৃষ্টিতে কুসুম এই প্রস্থান দৃশ্য দেখিতেছিল—তাহার মাঝে গুরুচরণও গিয়াছে। দ্রুত পদক্ষেপের পর বেগে ও দক্ষিণাবাতাসের বাধায় তাহার রুক্ষ চুল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে—সে রুক্ষ চুলে লালাভ মশালের আলো পড়িয়া চিকমিক্ করিয়াছে।

নিরুদ্দিষ্ট মেষের পিছনে এই বাদ্যকর, এই প্রাণীগুলি ভৈরব গর্জ্জনে, বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে, আরও দূরে ক্রমে ঢাকের বাদ্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে—সন্ন্যাসিগণের কোলাহল ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। কুসুম বুকের মাঝে মাথা লুকাইয়া সেই শব্দ ও কোলাহল শুনিতেছিল—অন্ধকারের বুক চিরিয়া তাহা তীব্র-বেগে কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

সম্মুখে মশালগুলি নিবু নিবু হইয়া আসিয়াছে, তাহার আলোক সামান্য স্থানকে স্বল্পালোকিত করিয়াছে মাত্র। এই আধ আলো অন্ধকারে উৎসবের দর্শকগণ প্রেতের মত দীর্ঘ কালো ছায়া লইয়া নিঃশব্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কুসুমের চোখের সামনে ওই লোকগুলি যেন বিকট বীভৎসরূপ লইয়া পাহারা দিতেছে—অদূরে ওই ঢাকের বাদ্য তাহার মনকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

রসিক আসিয়া প্রশ্ন করিল—এখানে দাঁড়িয়ে আছ এখনও? বাড়ী যাবে না?

কুসুম চাহিয়া দেখিল—প্রাঙ্গণ প্রায় জনহীন। সে স্বপ্নাবিষ্টের মত রসিকের পিছন পিছন চলিল।

গুরুচরণ চলিয়াছে—কোথায়, কেন তাহা সে জানে না। তবুও সে অত্যন্ত দ্রুত ছুটিয়াছে—পায়ের নীচে বন্ধুর চৈত্রের কর্ষিত ভূমির অসমতা সে সম্পূর্ণ অনুভব করিতেছে না। দূরে হীরালালের ঢাকে অতি দ্রুত চালান বাজিতেছে—নিবিড় অন্ধকারের মাঝে নিরুদ্দিষ্ট স্বল্পশ্রুত সেই বাজনাকে লক্ষ্য করিয়া সে চলিয়াছে। সঙ্গীদল কোথায় তাহা জানিবার কৌতূহল বা সময় তাহার নাই। বিবশ ভাবনাহীন অন্তর ও চেতনা-হীন দেহকে লইয়া সে শুধু চলিয়াছে।

চলিতে চলিতে সে অকস্মাৎ দেখিল হাজরাতলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—নিবিড় অন্ধকার ও ভীষণ নীরবতার মধ্যে কেবল হীরালালের ঢাক দ্রুত হইতে দ্রুততর বাজিয়া চলিয়াছে। কেহ জানে না কেমন করিয়া কোথা দিয়া মন্ত্রপূত মেষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেবতা বলি গ্রহণ করিয়াছেন—সন্ন্যাসিগণ সমস্বরে জয়োল্লাস করিয়া উঠিল। নীরব দিগন্ত অকস্মাৎ যেন প্রেতের বিকট চিৎকারে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী পূজায় বসিলেন—দ্রব্যসম্ভার সহযোগে পূজা হইল। স্বল্পালোকে মেষ বলি হইয়া গেল। রক্তাক্ত মেষ-দেহ পূজার মৃদু আলোকে কোন সুদূরের ব্যথা ও নিষ্ঠুরতাকে অন্ধকারের মাঝে যেন পৈশাচিক বীভৎসতায় ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে, গুরুচরণ চাহিয়া দেখিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। অচেতন অসঙ্গত অন্তরের মাঝে কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। আজ এই নিবিড় অন্ধকারে সেও ত এমনি ভাবে মরিতে পারিত,

রক্তাক্ত কবন্ধের মত অজ্ঞাত প্রান্তরের কোণে পড়িয়া থাকিত। দিগম্বরী, কুসুম, তার বাবা মা তাহাদের কি হইবে, তাহার অন্তর আর একবার কাঁপিয়া উঠিল। অদৃশ্য রহস্যের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম করিয়া সে সকলের কুশল প্রার্থনা করিল কিন্তু সমস্ত দেহ যেন কেমন অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কে যেন আসিয়া গঞ্জিকার কলিকা তাহার সামনে ধরিল, গুরুচরণ হাত বাড়াইয়া লইয়া তাহা গ্রহণ করিল।

সন্ন্যাসী শ্মশান পূজার জন্য প্রস্তুত হইয়া পুনরায় রওনা দিবেন। হীরালালের নীরব ঢাক আবার বাজিতে আরম্ভ করিল—সন্ধ্যাসী তাহার রক্তাম্বর বাঁধিয়া রক্তাক্ত মেষমুণ্ডকে মাথায় করিয়া যাইবার আদেশ করিলেন। বাজনার দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত পূজারী নূতন উদ্যমে, অধিকতর অশক্ত দেহ লইয়া ছুটিয়া চলিল।

গুরুচরণও চলিয়াছে।

নিবিড়তর অন্ধকারে গুরুচরণ যেন আর কিছুই ঠাহর করিতে পারিতেছে না—দূরে দিগন্ত মাঠ, গ্রাম, আকাশের তারকা সবই যেন এই বিরাট অন্ধকারে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই অন্ধকার সমুদ্রের তলদেশে বিদ্রোহী তিমি শিশুর মত তাহারা কোথায় যেন চলিয়াছে—তাহার দিক নাই, লক্ষ্য নাই কেবলমাত্র গতিই তাহার ধর্ম্ম।

কি যেন একটা পায়ে বাধিয়া গুরুচরণ পড়িয়া গেল কিন্তু কোন বেদনা সে অনুভব করিতে পারিল না। পিঠের নিচে একটা শয্যার কোমলতা কিন্তু সে বুঝিল। হাত দিয়া দেখিল—ঘাস। নিকটে নিশ্চয়ই জলাশয় আছে তাহা না হইলে এত বড় ও কোমল ঘাস চৈত্র মাসের ধূসর উত্তপ্ত মাঠে থাকিবার কথা নহে। সে যেন বিশ্রাম পাইয়াছে এমনি ভাবে শুইয়াই রহিল।

চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে—আকাশ ভরা তারা অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে আকাশের গায়ে টিপের মত লাগিয়া আছে—দিগম্বরী ঘনশ্যাম কপালের উপরে এমনি কাঁচপোকার টিপ পরিয়া থাকে—কুসুমের কপালেও থাকে—টিপের নিচে একটা উড়কির ফোঁটা। গুরুচরণ শুনিয়াছে ওরাও এক একটী পৃথিবী, ওর মাঝে এমনি কত কুসুম, কত দিগম্বরী, কত গুরুচরণ পৃথিবীর মত হয় ত কত ঘটনা চলিয়াছে অদৃশ্য কোন শক্তির ইচ্ছায়।

গুরুচরণ আর ভাবিতে পারিল না—তাহার দেহও আর যেন নড়িতে চাহে না। মস্তিষ্কের মাঝে যেন কি একটা ঘুরিতেছে, শত চেষ্টায়ও যেন ফুস্‌ফুসে বায়ু প্রবেশ করিতেছে না। অকারণ ঐ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম জানাইল, তাহার পর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া রহিল। কোথায়—তাহা সে জানে না।

অত্যন্ত সংকীর্ণ বিছানায়, রসিকের বুকের অত্যন্ত নিকটে কুসুম শুইয়াছিল—কিন্তু সে ঘুমায় নাই। রসিকের ঘন নিশ্বাসে যেন মনে হয় সে ঘুমাইয়াছে।

কুসুম দুরে, বহুদুরে পরপারে—নিকটে আবার দুরে ঢাকের বাদ্যকে সে সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া অনুসরণ করিতেছিল। গুরুচরণ এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে চলিয়াছে—কুসুম মনে মনে শঙ্কিত হইল—পথে কত বিপদ হইতে পারে, কত অজানা বন্যজন্তু জানোয়ার আছে।

কুসুম ডাকিল—শুন্‌ছো ?

রসিক তন্দ্রাঘোরে বলিল—হুঁ।

কুসুম একটু ভাবিয়া বলিল—ওরা এখন কোথায় যাচ্ছে ?

—কারা ?

—ওই সন্ন্যাসীরা।

রসিক কহিল—হাজরাভাটা হ'য়ে গেছে এখন কাঞ্চনপুরের শ্মশানে যাচ্ছে—পূজো দিতে।

—সে কতদুর ?

—এই দু' ক্রোশ হবে।

—পথে ত কত ভয় আছে—না ?

—ভয় কি ? দেবতার পূজা, তিনি যদি চান কাউকে তাকে নেবেন।

কুসুম শিহরিয়া উঠিল। ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিল—এমন হ'য়েছে কোনদিন।

—হ্যাঁ, সেবার ত হরিপদ বালা কোথায় গেল তা আর খুঁজেই পাওয়া গেল না।

—তারপর ?

—তিনদিন পরে নদীতে সে ভেসে উঠ্‌লো।

কুসুম চুপ করিল। আর কোনও প্রশ্ন করিল না। রসিকের নিশ্বাস পুনরায় ঘন হইয়া উঠিল। সে ঘুমাইয়াছে।

কুসুম অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে উঠিয়া দরজা খুলিল—চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, কোনদিকে কোন সাড়া শব্দ নাই। বিরাট নীরবতার মাঝে, আকাশ পৃথিবী গাছের সারি সমস্ত মিশিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে যেন কোন অমঙ্গলের প্রতীক্ষা করিতেছে। কুসুম দাওয়ায় নামিয়া খুঁটি হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল—দূরের অস্পষ্ট ঢাকের বাদ্য কানের মাঝে আসিয়া বাজিতেছে—ঐ শব্দকে মাত্র অনুসরণ করিয়া গুরুচরণ চলিয়াছে—যদি পড়িয়া থাকে কোথাও, যদি কোনও—

কুসুম আর ভাবিতে পারিল না—তাহার চোখ দুইটি ভিজিয়া উঠিতেছিল। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া তুলসী-তলায় গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল—ঠাকুর, বন্ধুকে রক্ষা ক'রো।

কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইল—একটী একতারা ও মৃদুকণ্ঠের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—ঐ নবীন বৈরাগী। সে গাহিতেছে—পরের জন্ম পরকাল হারালাম রে—

গুরুচরণ যখন চোখ মেলিয়া চাহিল তখন ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল—মনে পড়িল কাঞ্চনপুরের শ্মশানে তাহাকে যাইতে হইবে। এতক্ষণ হয় ত শবসাধনা শেষ হইয়াছে—পূজাও শেষ হইয়াছে। কিন্তু সে কোথায়? কাঞ্চনপুর কতদুর? কোন্‌দিকে? সে দুর্ব্বল নির্ভর ঢাকের বাজনাও থামিয়া গিয়াছে। গুরুচরণ কর্ত্তব্য না স্থির করিতে পারিয়া বসিয়াই রহিল। চারিদিকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হইয়া উঠিল—প্রভাতী তারাও ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। গুরুচরণ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে, সে যেন রসিকের বাড়ীর অদূরে 'বাওড়ের' মাঝে জলের কূলে বসিয়া আছে। ঐ ত টিলার উপরে রসিকের ঘর ও বাঁশঝাড়ের দীর্ঘ রেখাগুলি দেখা যায়। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কে যেন একটী লোক তাহার দিকেই আসিতেছে, সে স্থান নির্দ্দেশের উদ্দেশে তাহাকে ডাকিল—এদিকে এসো—ও মশায়—

লোকটি নিকটে আসিয়া একগাল হাসিয়া বলিল—কিরে গুরো, তুই এখানে কি ক'রে এলি?

গুরুচরণ বলিল—রসিকদা! সেও ভাল। হাজরা ভাঁটার পরে পথ হারিয়ে এখানে এসে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলাম।

—তাই নাকি?

—ওরা কোথায় তা ত জানি না।

রসিক হাসিয়া বলিল—কুসুমও তোদের জন্যে সারারাত তুলসীতলায় মাথা খুটেছে।

গুরুচরণ বলিল—বেশ, এ ত ভালই, কেবল আমাদের জন্যেই তোমার নয় ?

—কি জানি।

গ্রামের প্রান্তে আবার ঢাক বাজিয়া উঠিল। গুরুচরণ বলিল—যাই রসিকদা, এখনও ওদের দলে ভিড়তে পারবো।

নবীন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া একতারার সুর বাঁধিতে বাঁধিতে ধূসর পাণ্ডুর মাঠের সংকীর্ণ পথ ধরিয়া চলিয়াছে। তাহার পিছনে সূর্য্য তখন ধীরে ধীরে সন্তর্পণে উদিত হইয়া আকাশের ললাটে সিন্দুর বিন্দুর মত উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

গ্রামের প্রান্তে চারা বকুল গাছ। কতকাল পূর্ব্বে সে চারা ছিল তাহা জানা যায় না, আজ সে অতি প্রাচীন—তাহার নীচে গ্রামের কিশোর কিশোরী ফুলের সাজি হাতে লতা দিয়া বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছে। তাহারা বলিল—বৈরাগী ঠাকুর গান কর।

নবীন গাছের তলায় বসিয়া গান গাহিল—শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা। সকলেই খুশী হইল—তাহাদের মুখে আনন্দের প্রলেপ অতি সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। নবীন ভাবে তাহার গানের এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কি আছে ? সে বলিল—ভিক্ষে দেবে না ?

একটি কিশোরী একটি মালা দিয়া বলিল—এই নাও।

মালা আর, তার সঙ্গে ওই কিশোরীর হৃদয়ের এতটুকু স্নেহ পাইয়া নবীনের নিরাশ্রয় মনটি আনন্দে গর্ব্বে অভিভূত হইয়া পড়িল। মালাটি গলায় পরিয়া অশ্রুপ্লুত চোখে সে কল্যাণপুরের বোস বাড়ীতে যাইয়া দেখে বাড়ীতে একটা কিছু উৎসব চলিতেছে। কর্ত্তাকে গান শুনাইয়া ভিক্ষার

আশায় বসিয়াছিল, একটি কুমারী কন্যা তাহাকে ভিক্ষা দিয়া গেল। নবীন এই কুমারীকে চিনিত। চার বৎসর হইতে আজ পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে নিত্য ভিক্ষা দিয়াছে।

কর্ত্তা বলিলেন—নবীন, হাসির বিয়ে আজ পাকা হয়ে গেল। বিয়ে ২৮শে বোশেখ, তুমি এস কিন্তু সেদিন। নবীন উঠিয়া হরিশপুরের দিকে চলিল।

দ্বিপ্রহর অবধি ভিক্ষা করিয়া নবীন গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

চৈত্রের উত্তপ্ত বন্ধুর মাঠ। মাঠের বালুকা প্রখর নির্দ্দয় খরতাপে উত্তপ্ত হইয়া চোখের সামনে ঝিল্‌মিল করিতেছে। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে জীবন্ত কোন প্রাণী নাই—সঙ্গীহীন দুই-একটি গাছ উত্তাপে যেন ঝলসিয়া গিয়াছে।

সেই রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া নবীন চলিয়াছে।

নবীন ভাবিতেছিল—ঐ হাসি তাহার শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত নিত্য তার শুভ্র কমনীয় দুইখানি চঞ্চল হাতের অঞ্জলি ভরিয়া ভিক্ষা দিয়াছে। প্রতি দিন প্রতি বর্ষে অতি ধীরে ধীরে বাড়িয়া সে আজ যৌবনের সীমারেখার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতি সন্তর্পণে শতদলের মত ফুটিয়াছে···একদিন ললাটে একরাশ সিন্দূর পরিয়া, লাল চেলির রক্তাভায় সুন্দরতর হইয়া সলজ্জ মন্থর পদক্ষেপে সে চলিয়া যাইবে—কোথায়, কতদূরে কে জানে? আর আসিবে না, কম্পিত করে আর ভিক্ষা দিবে না। অতি প্রিয় জন্মভূমির নিকট হইতে সাশ্রুনেত্রে বিদায় লইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইবে।

তাহার ভিক্ষার ঝুলিতে সে আর মুষ্টিভিক্ষা দিবে না—নবীনের চোখ দুইটী সজল হইয়া আসিল। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সে তাহার অন্তরের

সমস্ত স্নেহ নিঙড়াইয়া গ্রামে গ্রামে প্রতি পত্রে প্রতি ধূলিকণায় ছড়াইয়া দিয়াছে—সেখানে শুধু কি এই প্রবঞ্চনা জমা হইয়া রহিয়াছে। এই কি তাহার এ জগতের কাছে একমাত্র পাওনা।

চোখের জলে পথ দেখা যায় না—একটা ঢিলে হুচোট লাগিয়া নখটা ছিঁড়িয়া গেল, নবীন একবার উঃ করিয়া আবার পথ চলে।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্র যেন চারিপাশে তরল গলিত অত্যুষ্ণ সীসার মত ঝরিয়া পড়িতেছে।

দ্বিপ্রহর।

বাজারের ধনা কামারের দোকানে বসিয়া নবীন তামাক খাইতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কি করছ ধনাদা ?

ধনা কর্ম্মকার চৈত্র সংক্রান্তির আড়ংএর জন্যে এক পয়সা মূল্যের ছুরি নির্ম্মাণ করিতেছিল। উত্তপ্ত লৌহ আগুনে দিয়া কপাল হইতে আঙ্গুল দিয়া ঘামটা ফেলিয়া সে বলিল—ছুরি তৈরী করছি। আজই আড়ংএ যাবে। নবীনদা কোথায় ?

নবীন জবাব দিল না। সে দূরের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল—ওই চারা বকুল গাছের নীচে ছেলেরা বৈকালেও সমবেত হইয়া মালা গাঁথিবে, তাহারা দ্রুত চঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইবে, আজ এই আড়ংএর দিনে তাহারা যদি এক একটি পুতুল পায়, তবে ওই সুকুমার কিশোর কিশোরীর মুখে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে। তাহারা আনন্দে হর্ষে দিক গুলজার করিবে। নবীন চঞ্চল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল—আজকার আড়ং কোথায় ?

—গাজিপুরের আড়ং।

—সেখানে পুতুল পাওয়া যায় ?

—নবীনদা তুমিই মজালে, আড়ংএ পুতুল পাওয়া যায় না? তোমার আবার পুতুল দিয়ে কি হবে?

নবীন স্মিতহাস্যে জবাব দিল—পরের ছেলে ত আছে। শিশু, সে ত সবারই।

নবীন ত্বরিৎপদে গাজিপুরের দিকে চলিল।

চৈত্রের উত্তপ্ত পথ তখন গরম হাওয়ায় আরও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নবীন সমস্ত উপেক্ষা করিয়াই চলিল। তপ্ত বায়ু ও বালি মুখের উপর আগুনের হল্‌কার মত আসিয়া পড়ে; নবীন চাদরে মুখ মুছিয়া আবার চলে।

আড়ংএ আসিয়া তাহার ভিক্ষালব্ধ চাউল বিক্রয় করিয়া পাইল মাত্র ছয় পয়সা।

চারিপাশে রং বেরংয়ের নানা খেলনা, নানারূপ বাঁশীর সুর তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। কতকগুলি খেলনা সে বাছিয়া বলিল—এ কত করে?

দোকানী অত্যন্ত নির্ম্মমের মত জবাব দিল—একটা চার পয়সা।

নবীন শূন্যদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। সামনে মেটে পুতুলের দোকান। নবীন অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বিলাতী খেলনার দিকে আর একবার চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেটে খেলনা বাছাই করিল।

একটা এক পয়সা। নবীন পছন্দ করিয়া ছয়টা ঘোড়া হাতী হাঁস কিনিয়া কোঁচড়ে পুরিয়া আর একবার ভাবিল—ঐ শিশুদের মুখ হর্ষে পুলকে কত মধুর হইয়া উঠিবে। তাহার খাওয়া একদিন হইবে না। না হয় নাই হইল। তার পরিবর্ত্তে যে আনন্দ সে আজ পাইবে তাহা চিরন্তন—মধুর। চাউলের দাম একটু বেশী হইলে বিলাতী খেলনাই সে কিনিতে পারিত।

নবীন কল্পনায় সেই শিশুর পুলকিত মুখের কথা ভাবিতে ভাবিতে মাঠে আসিয়া নামিল। আইলের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে সে এক একবার একা একাই হাসিতে লাগিল।

হঠাৎ চাহিয়া দেখে পিছনে সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। দিকচক্রবালের উপরে একখানা কালো মেঘের অন্তরালে সূর্য্য প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে। নবীন ব্যস্ত হইয়া ভাবিল—চারা বকুল গাছের ওখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই যদি অন্ধকার নামিয়া আসে, তবে ত ওই শিশুদের দল পাখীদিগের মত নীড়ে ফিরিয়া যাইবে। তাহার এই পুতুল না দেওয়াই রহিয়া যাইবে।

নবীন একহাতে একতারা ও অন্যহাতে কোঁচড়ের পুতুলগুলি ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। যাহার জন্যে ভিক্ষালব্ধ চাউল, একদিনের আহার্য্য সে ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে সে ব্যর্থ হইতে দিবে না। আজিকার উপবাসকে সে সফল করিবেই।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল।

নবীন ছুটিয়া চলিয়াছে।

সামনের এই মাঠটুকু পার হইতে পারিলেই বকুলতলায় পৌছান যায়। ক্লান্ত নবীন আরও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

বকুলতলায় আসিয়া নবীন যখন পৌছিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর উপর নামিয়া আসিয়াছে। শূন্য বকুলতলায় কেবল অন্ধকার। নবীন কোঁচড় হইতে পুতুলগুলি বাহির করিয়া বকুলতলায় রাখিয়া একবার কহিল, এত শ্রম, এত আশা আজ এই অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যর্থ—একেবারেই পণ্ড হইয়া গিয়াছে। নবীনের বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। যাহাদের জন্য এত কষ্ট করিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহারা আর একটু দেরী করিল না'কেন ? এমন করিয়া তাহার সমস্ত আশা সকল শ্রম ব্যর্থ করিয়া দিল কেন ? তাহার চোখ বাহিয়া ধীরে নিঃশব্দে

জল গড়াইয়া পড়িল, অজস্র রক্তপাতে তাহার হৃদয় যেন ক্লান্ত জীর্ণ হইয়াছে।

নবীন একতারা হাতে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যার অন্ধকারের অন্তরালে একটা অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অসংযত পদক্ষেপে সে কুটিরের পানে চলিল।

তাহার পিছান চৈত্র-সংক্রান্তির রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল।

নবীন ভাবে, প্রতি বৎসরই এমনই করিয়া ধীরে নিঃশব্দে তাহার ব্যর্থতা লইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহারই পিছনের গভীর অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কালকার নূতন বৎসরও একদিন এমনি করিয়া তাহার শত আশা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবে। মানুষের আশাকে বার বার নিষ্ফল করিয়া দিয়া স্মৃতি ভারাক্রান্ত পুরাতন বৎসর বার বার এমনি করিয়া চলিয়া গিয়াছে এই পৃথিবীতে।

সন্ধ্যার পরে দ্বিতীয়ার শীর্ণ একখানি চাঁদ এককভাবে আকাশের প্রান্তে জ্বলিতেছিল। ষষ্ঠিচরণ হুঁকা সাজিয়া লইয়া আনমনে টানিতেছিল। পাথের দিকে মাঝে মাঝে চাহিয়া অকস্মাৎ সে গুরুচরণের মায়ের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল—গুরো ত এখনও আড়ং থেকে ফিরল না?

গুরুচরণের মা বলিল, হ্যাঁ, আসলো বলে। "আসন" ত এখনও ফেরে নি।

গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কে যেন আসিতেছে। ষষ্ঠিচরণ বুঝিল এ গুরুচরণ।

ষষ্ঠিচরণ তাহার উদ্দেশেই প্রশ্ন করিল—এত দেরী হ'ল যে গুরো?

গুরুচরণ জবাব দিল—এই ত সন্ধ্যে হ'ল।

অন্ধকারের মাঝেই সওদাপূর্ণ ধামাটা সে দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। তাহার মা বলিলেন—বৌমা, আলোটা নিয়ে এস ত, সওদা দেখি। দিগম্বরী আলো আনিয়া পিলসুজের উপর রাখিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

গুরুচরণ কি যেন একটা জিনিস অন্ধকারে ধামার আড়ালে নামাইয়া রাখিয়া একটি একটি করিয়া সওদা নামাইয়া রাখিল। পিতা মাতা উভয়েই সওদা নিরীক্ষণ করিতেছিল। মা অভিযোগের কণ্ঠে বলিলেন—ওমা, বৌমার জন্যে কিছু আনিস্ নি গুরো?

গুরুচরণ আম্‌তা আম্‌তা করিতেছিল। ষষ্ঠিচরণ খালি ধামাটা তুলিয়া লইয়া গুরুচরণের পায়ের কাছে লুকোনো কাগজের মোড়কটা দেখাইয়া বলিল—ওটা কি রে গুরো?

গুরুচরণ মাথা চুলকাইয়া বলিল—কিছু না, এমনি—

ষষ্ঠিচরণ তাহার স্ত্রীর প্রতি অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—আমি কিন্তু বলতে পারি ওতে কি আছে?

গুরুচরণের মা একটু হাসিয়া বলিল—কি?

ষষ্ঠিচরণ নিমিলিত চক্ষে বলিল—এই ধর কাঁচপোকার টিপ, খোঁপার চিরুণী, কাঁটা, ফিতে……ষষ্ঠিচরণ হো হো করিয়া শিশুর মত হাসিয়া উঠিল। গুরুচরণ অন্ধকারে মুখ আড়াল করিয়া অকারণেই কি একটা জিনিষ খুঁজিতে লাগিল এবং দরজার অন্তরালে দ্রুতপদে দিগম্বরীর প্রস্থানের শব্দ পাওয়া গেল। গুরুচরণের মা হাসিয়া অভিযোগের কণ্ঠে বলিলেন—তোমার কি ভীমরতি হ'ল?

কাগজের মোড়কে চিরুণী প্রভৃতি ছিল সত্য কিন্তু একখানা করিয়া নয়, দু'খানা করিয়া।

আষাঢ় মাস।

চৈত্রের ধূসর বিবর্ণ পাণ্ডুর মাঠ কালবৈশাখীর প্রথম বর্ষণে নবোঢ়া কিশোরী বধূটির মত ত্বরিতে সারা অঙ্গে শ্যামল অঞ্চল জড়াইয়া দিয়াছিল —আজ তাহা যৌবনের শ্যামলতায় পরিপূর্ণ। পাট ও ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া বাতাস দুরন্ত শিশুর মত ছুটিয়া যায়, তাহারা অবনমিত মস্তকে তাহাকে ভালবাসা জানায়। রসিক, গুরুচরণ, কেদার ঘাস কাটিতে কাটিতে চাহিয়া দেখে—হাসে। চৈত্রের রৌদ্রতপ্ত মাঠে কঠোর পরিশ্রম আজ পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছে—সফল হইতে চলিয়াছে।

আউস ধান ফুলিয়াছে, শুভ্র সদ্যপ্রস্থত মঞ্জরী মাথা দোলাইয়া জানায় শীঘ্রই সোনার ফসলে সে শূন্য গৃহ পরিপূর্ণ করিবে, অর্দ্ধভুক্ত উদরকে পূর্ণ করিবে।

গুরুচরণ আলের উপর ঘাস কাটিতেছিল। ভিজা ঘাসে তাহার কাপড়খানা কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে। সকালের মেঘমেদুর আকাশের কোন ফাঁকে একটু কনক সৌরকিরণ আসিয়া ভিজা পাতায় সোনা ফলাইয়াছে। সে গান ধরিল—

ওপারে কদম গাছ হেলে পড়ে আগা,
শিশুকালে করে প্রেম ওরে যৌবন কালে দাগা।
তুমি ওপার বসে বাজাও বাঁশী আমি এপার বসে শুনি
রে নবীন কোকিল।

অদূরে টিলার উপর রসিকের নগ্ন বাড়ীখানা দেখা যায়। তাহার কণ্ঠ পূবালী বাতাসে হয় ত গৃহকর্ম্মনিরতা কুসুমের কানে পৌছিতেছে—হয় ত সে ভাবিতেছে। কিন্তু দূরে আসিলে সে টানিয়া কাছে আনে, কাছে গেলে বার বার ভীত চকিত ভাবে দূরে ঠেলিয়া দেয়। এ কি রহস্য সে বুঝিয়া পায় না।

রসিক আসিতেছে।

গুরুচরণ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—রসিকদা, এসো এখানে। বাক্‌সা ঘাস—

রসিক জবাব দিল না কিন্তু উত্তোলিত হাত দিয়া ইসারায় জানাইল,—আসিতেছে।

গুরুচরণ ও রসিক একই আলে বসিয়া ঘাস কাটিতেছিল—এইখানেই হাজরা ভাঁটার দিনে সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিল—অদূরেই বাওড়, তাহার পাড়ে নলের ফুল ফুটিয়াছে, বনটিয়া পুষ্পমঞ্জরীর উপর বসিয়া দোল খাইতেছে। গুরুচরণ পুলকে গানের পরের অন্তরা গাহিল—

ওপারে নলের ফুল গাছের আগে টিয়া,
বন্ধুর আগে কয়ো খবর না যেন করে বিয়া।

রসিক মৃদু হাসিয়া বলিল—তুই ত হাজরা ভাঁটায় এই জায়গায়ই এসে পড়েছিলি। এখানে এলি কেমন করে? এত থাকতে এখানে—

গুরুচরণ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিল—ঢাকের বাজনার পিছনেই ত যাচ্ছিলাম—পড়ে গিয়েছিলাম তারপর দূরে বাজনা শুনে ছুটলাম, কিন্তু আবার পড়লাম কোথায় জানি না। জ্ঞান হ'লে দেখি এখানে, নেশার ঘোরে তোমার বাড়ীটাও চিন্‌তে পারি নি—তোমাকে চিনলাম। গুরুচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন নিজেরই নির্ব্বুদ্ধিতাকে সে ব্যঙ্গ করিতেছে।

কিন্তু রসিক হাসিল না। সে ভাবিল, কুসুমও সারারাত্রি দাওয়ায় বসিয়া কাটাইয়াছে কেন? এই দুইটির মাঝে গোপন কোন সংযোগ আছে কি?

রসিক হঠাৎ প্রশ্ন করিল—কুসুম তোর কথা এখন বলে না কেন রে?"

তুই গেলেও ত আর তেমন হাসি ঠাট্টা রঙ্গ করে না, আদর আপ্যায়িত করে না।

—গরীব মানুষ, 'সই'এর কি আর এখন মনে আছে? দেখা হলে একেবারেই নতুন মানুষ।

রসিক অনুমোদন করিল—হ্যাঁ তাই, একেবারে নতুন মানুষ।

নীরবে কিছুক্ষণ গেল।

রসিক জিজ্ঞাসা করিল—তোদের ধানে আউসের বতর পর্য্যন্ত চলবে রে?

—কে জানে, সে সমস্ত বাবা জানে, আমি ওসব ধার ধারি না।

—কিন্তু আমার যে আর চলবে না—এ হাট পর্য্যন্তও।

গুরুচরণ বলিল—মনিববাড়ী থেকে দাদন নে।

—দাদন নিয়ে দেড়ে ধান দেব কি করে? সাত বিঘে ত কেবল বর্গা জমি।

গুরুচরণ চিন্তা করিয়া বলিল—দেখি বাবার কাছে শুনি।

সেদিন সকালে কুসুম গৃহকর্ম্ম করিতেছিল। রসিক অত্যন্ত বিমর্ষভাবে দাওয়ার উপরে বসিয়া ভাবিতেছিল—ঘরে আজ চাল নাই।

আষাঢ়ের দুর্ভিক্ষ চাষীর জীবনে দুরপনেয়। আর পনরটা দিন চলিলেই আউস ধান পাওয়া যাইবে কিন্তু এই কটা দিন কেমন করিয়া চলিবে। এমন কিছু নাই যাহা বন্ধক দিয়া টাকা ধার পাওয়া যায়? এমন কেহ নাই যে সাহায্য করিবে।

কুসুম প্রশ্ন করিল—কি ভাবছো?

—চাল যে নেই আজ।

কুসুম একটু হাসিয়া বলিল—তাতে কি, একদিন উপোস ক'রলে মানুষ ত মরে না।

রসিকের মন ভাল ছিল না, সে কটূক্তি করিল—একদিন যে না বেকুব—আউস পাকতে এখনো যে কুড়ি দিন।

—তা হোক চলে যাবে।

—কেমন ক'রে ?

কুসুম আবার হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি কাজে যাও আমি জোগাড় ক'রবো—ভারি পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষের ক্ষমতাটাই দেখো।

রসিক মৃদু কণ্ঠস্বরে বলিল—কেমন ক'রে বল্ না।

কুসুম বিলোল লোভনীয় কটাক্ষে রসিকের পানে চাহিয়া বলিল—বোসবাড়ী থেকে ধান ভানতে লোক খুঁজছিল, আমি ঠিক ক'রেছি। দু-তিন সের চাল ত সন্ধ্যায় আনতে পারবো—ভেবো না।

রসিক আনন্দে হর্ষে গর্ব্বে হাসিয়া ফেলিল, কহিল—কুসুম, তোকে আজও চিনলাম না ?

কুসুম বলিল—তোমরা এমনি।

রসিক তিরস্কারকে উপেক্ষা করিয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের মাঝেই কুসুমকে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিল। কুসুম বাধা দিল না, সে দেহ এলাইয়া দিয়া রসিকের বুকের মাঝে মুখ লুকাইল। রসিক কহিল—আমাকে ভালবাসিস্ কুসুম ?

কুসুম মাথা নীচু করিয়া কহিল—না। তোমাকে ভালবাসতে যাবো কেন ? তুমি ত আমার সোয়ামী নয় যে ভালবাসতে যাবো। আমি পর—

—না, না, তুই আমার স্ত্রীর চেয়েও বড়ো, যা তা হলে—

রসিকের হাত দুটি এমন মদির আগ্রহ লইয়া তাহার যৌবন-রঙীন দেহকে কোনদিন আলিঙ্গন করে নাই, তাই সে চোখ বুঁজিয়া কেবল তাহাই

উপভোগ করিতেছিল—প্রতিবাদ করে নাই, নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে নাই—অকারণ লজ্জায় চকিত দৃষ্টিতে চারিপাশে চাহে নাই।

*

মরা ইছামতীর নদীতে বর্ষার নূতন জল আসিয়াছে। জল ততটা ঘোলা নয় কারণ মজানদীতে উল্টা বাঁক হইতে জল আসে। নূতন জলের সহিত বুভুক্ষু ট্যাংরা, পাপতা, আইড় প্রভৃতি প্রচুর মৎস্য আসিয়াছে তাই নদীতীর দিয়া লম্বা সরু বাঁশের ছিপ ফেলিয়া মৎস্য শীকারীকুল বসিয়া। মাঝে মাঝে কোন অপেক্ষাকৃত বড় শীকারে কলরব করিতেছে। গুরুচরণের কোন কাজ ছিল না। দুপুরের পরে সেও ছিপ হাতে মাছ ধরিতে গিয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হোক্, যে ঘাটে গ্রাম্যবধূগণ জল লইতে আসে তাহারই পাশে বসিয়া আছে। সবুজ চরে গামছা পাতিয়া বসিয়া সে তিনটা ছিপ ফেলিয়াছে—মনের সংগোপনে হয় ত গোপন আশা আছে—কুসুম এইখানেই স্নান করিতে, না হয় গা ধুইতে আসিবেই।

ফাতনা বহুবার ডুবিয়াছে কিন্তু বাঁশের ঘনছায়াচ্ছন্ন পথের পানে চাইতে চাইতে আর টান দেওয়া হয় নাই। কাহারা যেন আসিতেছে—তাহাদের পাড়ার বধূদিগের সহিত দিগম্বরী আসিয়াছে।

কেদার পত্নী কহিলেন—কি ঠাকুরপো, এইখানেই বুঝি সকল মাছ এসে ভীড় ক'রেছে।

গুরুচরণ পরিহাস করিল—মাছও ত অনেক রসিক আছে—আপনাদের জন্যে আসে।

—ধ্যেৎ মুখপোড়া—

গুরুচরণ দিগম্বরীকে ইঙ্গিত দেখাইয়া দিয়া কহিল—ও কালো বৌটা কার?

দিগম্বরী ঘোমটার অন্তরালে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গুরুচরণকে শাসন করিতে চাহিল কিন্তু গুরুচরণ একটু ভেংচাইয়া ফিরিয়া চাহিল।

কেদার-পত্নী পুনরায় পরিহাস করিলেন—ও আমার সতীন? (কেদার-পত্নী সম্পর্কে বেয়ান)

গুরুচরণ কথাটা ঘুরাইয়া বলিল—এতদিনে আমার এই ভাগ্যি হয়েছে, তা ত জানতাম না। বেশ। বেশ।

সকলেই হাসিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরুচরণ একটা ছিপে টান দিল। মাঝারি একটা আইড় মাছ উঠিয়া চয়ের উপরে পড়িল। দিগম্বরী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, গুরুচরণ কহিল—এইটা কালো বৌ—

—টানে টানে বৌ তুললে শেষে ক'রবে কি?

কেদারের স্ত্রী গৌরবর্ণ তাই গুরুচরণ ছিপ ফেলিয়া বলিল—এইবার ধলা বৌ—

হাস্য পরিহাস করিয়া বধূগণ চলিয়া গেল। দিগম্বরী পূর্ণ কলসী কক্ষে যেন ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিল—এমনি করিয়া এখানেই কুসুম একদিন ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়াছিল। গুরুচরণ একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিল।

*

কুসুম তৃতীয় প্রহর অবধি বোস্‌বাড়ীতে ধান ভানিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল। গৃহিণী তাহাকে কিছু মুড়ি গুড় দিয়াছিল এবং তাহার পুত্রবধূ একটি পান দিয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত, ক্লান্ত কুসুম আড়াই সের চাউল ও আধ সের খুদ লইয়া গৃহে ফিরিয়া দেখিল—অভুক্ত রসিক স্নান করিয়া আসিয়া শুইয়া আছে। শুধাইয়া জানিল, সে চাল-জল খাইয়াছে। তাড়াতাড়ি যাহা হয় কিছু রাঁধিবার জন্যে সে ক্লান্ত দেহেই শূন্য কলসী লইয়া দ্রুত ঘাটের দিকে রওনা দিল।

রসিক কহিল—একটু জিরিয়ে যাও।

—জিরোলে রাঁধবো কখন? কুসুম উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিল।

ধান ভানিতে ভানিতে সে দেখিয়াছে—

বোসবাড়ার বড় ছেলে উকিল হইবার জন্যে পড়িতেছে। সবেমাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছে, নূতন বধূ এইবার প্রথম শ্বশুর গৃহে আসিয়াছে। বধূ সুন্দরী—বয়স হয় ত ষোলো, কুসুমের চেয়ে দুই-তিন বছরের ছোট। দালানের দরজার অন্তরাল হইতে বড়বাবু বারবার রান্নাঘরের বারান্দায় কার্য্যনিরত বধূকে ডাকিবার জন্যে নানা ইসারা ইঙ্গিত করিতেছিল—কুসুম তাহা দেখিয়াছে। বধূটিও অছিলা খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক সময় স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। শাশুড়ী ডাকিলেন—বৌমা—

বৌমা অসংযত কাপড় জামা সংযত করিতে করিতে স্বামীর আকর্ষণরত বাহু হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ছুটিয়া পলাইল। শাশুড়ী মুখ টিপিয়া প্রশ্ন করিল—কোথায় ছিলে বৌমা?

অপটু এই মেয়েটির ভীত চকিত প্রস্থান ও গমন দেখিয়া কুসুম আপন মনেই হাসিয়াছিল কিন্তু এখন শূন্য কলসী কক্ষে নির্জ্জন ঘাটের পথে চলিতে চলিতে তাহার চোখ দুইটি বার বার ঝাপ্সা হইয়া আসিতেছিল—কি সুন্দর ওই ছেলেটি আর তার বৌ! নিবিড় প্রণয়ে ও সদা-হাস্য কোলাহলে তাদের জীবন পরিপূর্ণ, স্বপ্নমদির—ভাবনা চিন্তার অতীত ফুলের সৌরভে সুরভিত। অমনি করিয়া তাহার জীবন পরিপূর্ণ হয় না কেন? গুরুচরণ ঠিক অমনি করিয়া তাহাকে ডাকে না কেন—গোপন ইঙ্গিতে তাহার অন্তর দুলিয়া ওঠে না কেন?

ঘাটের পাশে কে যেন মাছ ধরিতেছে—গান শুনিয়া বুঝিল গুরুচরণ।

গুরুচরণ ছিপ ফেলিতে ফেলিতে গাহিতেছে—ওপারের ওই কালো মাইয়াডা আমায় কইরেছে পাগল—

কুসুম ধীরে ধীরে জলে নামিয়া পড়িল—যেন সে গুরুচরণকে দেখিতে পায় নাই। গুরুচরণও ফাতনার দিকে চাহিয়া যেন গান করিয়াই যাইতেছে। চোখের কোণে কুসুমকে সে লক্ষ্য করিতেছিল। যেমন করিয়াই হোক কুসুম আজ একটু বিমনা, তাহা না হইলে স্মিতহাস্যে চটুল চাহনিতে সে অন্ততঃ আজ তাহাকে অভিবাদন করিত। অকস্মাৎ দেখিতে পাইয়াছে এমনিভাবে গুরুচরণ কহিল—এই যে, সই যে! চিনতেই পারলে না!

কুসুম ভিজা এলো কবরীচ্যুত কুন্তলগুচ্ছকে মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া প্রশান্ত দৃষ্টিতে গুরুচরণের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল—চিনেই বা লাভ কি?

—এর মধ্যেই লাভ লোকসান খতিয়ে দেখ্‌তে শিখেছো?

—তুমিই ত শেখালে। ওই নববধূ আর তাহার স্বামীর দাম্পত্য জীবনের ভীরু প্রণয়ের চপল বিকাশ আজ তাহার অন্তরকে যেন মুহূর্তে নিংড়াইয়া ছিবড়ার মত নিরস করিয়া ফেলিয়াছে এবং গুরুচরণকেই সে মনে মনে দায়ী করিয়াছে—কেন, সেও জানে। গুরুচরণ কি করিতে পারিত সে কতখানি করিতে সুযোগ দিয়াছে তাহার বিচার সে করিল না।

কুসুম ডুব দিল। তাহার চুল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল,—মেঘের ফাঁকে রৌদ্র পড়িয়া ভিজা তৈলহীন চুলের গুচ্ছ সোনালী আভায় ভরিয়া গিয়াছে—কুসুম উঠিতেই গুরুচরণ সুর করিয়া গাহিল—

চাইয়া ছাখ্‌ রে বনের কলমি ফুল—
গাঙের পানি ভাসাইয়া নিল রে সোনার বন্ধুর চুল।

কুসুম মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল হয় ত, তাই ক্রোধে অভিমানে ওষ্ঠ

কাঁপাইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল—বন্ধুর মেয়েমানুষের সঙ্গে পীরিত ক'রতে চাও—জলে ডুবে মরতে পারো না !

গুরুচরণ কোন অজ্ঞাত কবির এক কলি গাহিয়া জবাব দিল—তুমি হও গহীন গাঙ কন্যা আমি ডুইব্যা মরি।

কুসুম হাসিয়া ফেলিল—গুরুচরণের গানে নয়, তাহার অর্থকে সম্যক উপলব্ধি করিয়া। জলে শূন্য কলসীর ঢেউ দিয়া কলসী পূর্ণ করিতে করিতে সেও সুর করিয়া কহিল—

যখন উঠে চাঁদ, বাঁশ বাগানের মাথায় বন্ধু—
আমি বইস্যা কাঁদি হায় রে খুলে মনের বাঁধ।

উত্তর দিবার সময় না দিয়া কুসুম চলিয়া যাইতেছিল, তাই গুরুচরণ উচ্চকণ্ঠেই কহিল—

যাবো বন্ধু যাবো তোর বাঁশ বাগানের ছায়,
মেঘে যখন ঢাকে চাঁদ, খইয়া পূবাল বায়।

পিছন ফিরিয়া কুসুম একটু হাসিয়া গেল—দিগম্বরীও আজ এমনি করিয়া হাসিয়া গিয়াছে। প্রথম দিনেও সে এমনি করিয়া হাসিয়াছিল সে হাসিও আজকার মতন রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে।

নিশীথ রাত্রে জ্যোৎস্না আসিয়া গুরুচরণের গায়ে মুখে পড়িয়াছে। নারিকেল গাছের ছায়াটা বুকের উপর নামিতেছে। গুরুচরণ কিন্তু ঘুমাইতে পারে নাই—তাহার বার বার মনে হইতেছে, ওই গানে সে কি গভীর নিশীথে অভিসারে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছে? যদি তাহাই হয় তবে কুসুম ত আজ সারারাত্রি কান পাতিয়া তাহারই অপেক্ষা করিবে—ধীরে ধীরে ভোর হইবে; যখন দেখিবে সে গেল না তখন হয় ত একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া উঠান ঝাঁট দিবে।

সে উঠিয়া বসিল। সকলেই ঘুমাইতেছে—গভীর শ্বাস প্রশ্বাসে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। গুরুচরণ নড়িখানা হাতে করিয়া নিঃশব্দে দাওয়া হইতে নামিয়া উঠানে দাঁড়াইল। গরু কয়েকটি রোমন্থননিরত—মাঝে মাঝে লেজের আঘাতে কীট পতঙ্গ তাড়া দিতেছে কিন্তু তাহারই শব্দ বেশ শোনা যায়। আকাশে টুকরা ছেঁড়া মেঘগুলি মাঝে মাঝে চন্দ্রালোককে ব্যাহত করিয়া চারিদিক স্বল্পান্ধকারে ম্লান করিয়া দিতেছে। গুরুচরণ কর্দ্দমাক্ত পথ ধরিয়া চলিল।

অন্ধকার বাগানের মাঝে পায়ে-চলা পথটা বর্ষাস্নাত আগাছা ও লতার বেষ্টনীতে সঙ্কীর্ণতর হইয়াছে। পাতার জলে পা দুইটি ভিজিয়া যাইতেছে। সমস্ত রাস্তাটা পার হইয়া আসিয়া রসিকের বাড়ী উঠিবার পথের ধারে হিজল গাছটার অন্ধকার ছায়ায় সে আসিয়া দাঁড়াইল—শঙ্কা হইল—যদি রসিক তাহাকে দেখিয়া ফেলে তবে কি সে বলিবে?

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা টিপিয়া টিপিয়া সে উঠিয়া আসিল—উঠানের ঠিক মাঝখানে। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। ধীরে ধীরে ঘরের কানাচে দাঁড়াইয়া সে অনুভব করিল দুইটি গভীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে—কুসুম ঘুমাইয়া আছে।

যদি এমনি নিশ্চিন্তে সে ঘুমাইবে, তবে সে কেন তাহাকে গভীর নিশীথে আসিবার ইঙ্গিত করিল? গুরুচরণ ঘরের পিছনে বাঁশ বনের ছায়ায় দাঁড়াইয়া কেবল ভাবিয়াই চলিল—এই রহস্যময়ী নারী, তাহার জীবনটাকে লইয়া নেহাত ছিনিমিনিই খেলিতেছে আর সে নিরুপায় রজ্জুবদ্ধ গাভীর ন্যায় একই বৃত্তে ক্রমাগত পাক খাইতেছে।

ক্রোধে অভিমানে নিজের প্রতি ধিক্কারে গুরুচরণের অন্তর উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। একবার ভাবিল সে ডাকিবে কিন্তু রসিকের কথা মনে

করিয়া থামিয়া গেল। মাঠের মধ্যে যাইতে যাইতে সে গান গাহিতে পারে কিন্তু নিদ্রিত কুসুমের কানে তাহা নিশ্চয়ই পৌঁছিবে না।

গুরুচরণ কান পাতিয়া শুনে—নবীন বৈরাগী গান করিতেছে। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে, একতারা তাহার আজ স্তব্ধ। মাঝে মাঝে একটু কাশির শব্দ ও মৃদু কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে। গানের কলি সে বুঝিল—

নবীন গাহিতেছে—

ভোলো ভোলো বন্ধু তোমার পুরাণ কথা,
পরের জন্যে পেলি যত ব্যথা।

গুরুচরণের চোখ দুইটি ব্যর্থতার অপমানে ভিজিয়া আসিতেছিল। সে বাড়ীর দিকে ফিরিল। বনের পথ কিসের সুবাসে যেন ভরিয়া রহিয়াছে—ভিজা পাতার জলকণা অশ্রুর মন চিক চিক করিতেছে। ভিজামাটীতে একটা তপ্তশ্বাস যেন রহিয়া রহিয়া অভিমানে ফুলিয়া উঠিতেছে।

রসিক কাজে গিয়াছে।

কুসুম নানা গৃহকাজ করিতেছে, কাল সারাদিন সে বোস বাড়ীতে ছিল, অনেক কাজ তাহার রহিয়া গিয়াছে। সে দ্রুত সেইগুলি সম্পন্ন করিতেছিল, তাহার পর রসিকের ভাত রাঁধিয়া রাখিয়া আজও তাহাকে ধান ভানিতে যাইতে হইবে।

রাঙাদি আসিয়া ডাকিলেন—কুসুম, অ—কুসুম।

—কি রাঙাদি? বসো।

—তুইও এসে বোস, একা কি বসা যায়।

—আমার যে নানা কাজ। আচ্ছা আসি—

রাঙাদি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—গুরো কি আসে যায়? খবর বার্ত্তা দত্তে বলিস্ ত না!

কুসুম শঙ্কিতভাবে বলিল—আমার আবার কি খবর !

—নাগর আসবে, আদর করবে—লক্ষ্মীছাড়া বোকা কোথাকার। কাঁটা চিরুণী বৃথাই নিলি ?

কুসুম অত্যন্ত ভীতকণ্ঠে কহিল—না না দিদি, তোমার কিছু বলতে হবে না।

—রসিক কোথা ?

—ভিন গাঁয়ে গেছে কাজ করতে, হাট করে ফিরবে।

—বেশ আজই ত খবর দেব বোন। রাঙাদি থাকতে ভাবনা কি ?

কুসুম ব্যস্ততার সহিত কহিল—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি তাকে কিছু বলো না।

রাঙাদি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—সে বেচারীর খাওয়া নেই, ঘুম নেই, দিবারাত্রি সে পাগলের মত ঘুরছে, সে ত তোর জন্যেই, নইলে তার কি দুঃখ ? আর তুই তাকে এত কষ্ট দিলি—

—তাকে বারণ করো, আমি তার কে ?

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পরে রাঙাদি আসল কথা বলিলেন—দু'সের চাল দিতে পারিস দিদি ? আমার ঘরে আজ বাড়ন্ত।

কুসুম বলিল—আমারও তাই দিদি, কাল ধান ভেনে যা পেয়েছিলাম সব ত আজই শেষ হবে, কি করবো ?

—ওর থেকে এক সেরই দে।

—না দিদি, ও যে জানবেই, আমায় আস্ত রাখবে না।

রাঙাদি গভীর অভিমানে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—ওলো কুসুম, আজ আমাকে তুই বেকুব করলি। রসিক ধানি-পানি গেরস্ত তার ঘরে এক সের চাল নেই এ কেবল তুই শোনালি। আচ্ছা দেখবো রাঙাদির

কাছেও যেতে হবে বাছা যেতে হবে—রাড় বিধ্‌বে তোর এত ঠেকার! তবুও যদি ঘরের বৌ হতিস্‌।

রাঙাদির ইঙ্গিতকে না বুঝিয়াই কুসুম কেবল মিনতি করিল—আমি মিথ্যা বলি নি রাঙাদি, সত্যিই চাল বাড়ন্ত।

রাঙাদি বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুক দিন সুদে আসলে শুধতে হবে।

রাঙাদি চলিয়া গেলেন। কুসুম গভীর শঙ্কায় অজ্ঞাত অনাগত দুর্দ্দৈবের পানে করুণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল মাত্র।

সারাদিন ধান ভানিয়া আসিয়া কুসুম সকালের ভাত কয়টি কিছু খাইয়া দাওয়ার উপর বসিযা নানা কথা ভাবিতেছিল। ক্লান্তদেহে চোখ দুইটি বার বার যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে।

দূরে আকাশের পূর্ব্ব দিগন্তে ঘন কালো মেঘ জলভারে টলমল করিতেছে—ঝুলিতে ঝুলিতে সেটা যেন মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। গাছপালা সব সহসা যেন রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া একটা বড় আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

কুসুম ভাবিতেছিল—রাঙাদি সকালবেলা শাসাইয়া গেল, সে কি করিবে তাহা কে জানে? সে কোন অন্যায় করিবে না বলিয়া সে বিশ্বাস করে, তবে তাহাকে দেখিলেই যেন তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া আসে। গুরুচরণকে সে ত বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে নাই, আর সে ত কোনক্রমেই রসিকের বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে পারে না। আজ শত দারিদ্র্য-লাঞ্ছনার মাঝেও যে নীড় রচিত হইয়াছে তাহা নিমেষে ঝড়ের মুখে কুটায় পরিণত হইবে। গুরুচরণকে সে ভালবাসে কিন্তু তাই বলিয়া রাঙাদি যাহা চাহেন সে তাহা চাহে না। তাহাকে কে না ভালবাসে? গ্রামের সকলেই ত তাহারি গুণগান করে?

প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়, তারপর ক্রমে দ্রুত হইয়া প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল। হিজলগাছের ডালগুলি মোচড়াইয়া কে যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়—আকাশের পটে নারিকেল গাছের মাথাটা যেন তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। উঠানের উপর দিয়া স্রোত চলিয়াছে—বড় বড় ফোঁটা স্রোতচালিত বুদ্বুদের উপর পড়িয়া ফাটিয়া যাইতেছে। খড়ের ঘরের চাল হইতে শতধারে জল পড়িতেছে—দূরের বাঁশবন ঝাপ্সা, তার জীবনের মত নিবিড় অস্পষ্টতায় ভরা। কোন অদৃশ্য মায়া যেন তার জীবনে এমনি অদৃশ্য অনিশ্চয়তার মধ্যে সশঙ্কভাবে ঘিরিয়া ধরিয়াছে।

কুসুম খর-বৃষ্টির অসাড় পতনের পানে চাহিয়াছিল।

পিছনে একটা শব্দ পাইতেই চমকিয়া চাহিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, শঙ্কায়, দ্বিধায়, লজ্জায় সে কোন কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল ব্যাকুল বিহ্বল করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বৃষ্টিস্নাত গুরুচরণ একখানা নড়ি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঝাপ্সা পৃথিবীর এই নির্জ্জন গৃহের দাওয়ায় একাকী কুসুমের সাম্‌নে সে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে, কুসুম কিছু বলিতে পারিল না। গুরুচরণ ভিজা কাপড় কিছুটা নিংড়াইয়া গৃহের মাঝে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল—কুসুম শোনো, এদিকে এসো—

এমনি করিয়া কেবলমাত্র 'কুসুম' বলিয়া সে কোন দিন ডাকে নাই, এমনি দৃঢ় ভীতিপ্রদ কণ্ঠে সে আদেশ করে নাই।

কুসুম যন্ত্রচালিতের মত, সম্মোহিত ব্যক্তির মত ধীরে ধীরে ঘরের মাঝে গিয়া দাঁড়াইল—গুরুচরণের সামনে কিন্তু দূরে।

গুরুচরণ শুষ্ক প্রশ্ন করিল—আমাকে ডেকেছ কেন?

কুসুম কম্পিত মৃদুকণ্ঠে কহিল—আমি! আমি ত আস্‌তে বলি নি।

—বল নি, তার মানে ?

নতদৃষ্টিতে ব্যাকুল কণ্ঠে সে কহিল—কেন এলে এমনি সময়ে ?

গুরুচরণ ব্যঙ্গ করিল—ও, রাঙাদিকে দিয়ে তুমি আসতে বল নি ? রসিকদা আজ নেই বলে—

কুসুম চোখের জল রোধ করিতে পারিল না। ভিজা চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল—আমি ত বলি নি ?

—ও, তুমি এত ভাল মানুষ জানতাম না, কিন্তু এই সতীপনা কেন ?

গুরুচরণ ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে কুসুমের দুই স্কন্ধ ধরিয়া রুষ্টকণ্ঠে কহিল—তবে কেন এমনি ক'রে বার বার আমাকে আস্‌তে বলে অপমান করো। এমনি ক'রে আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কেন করো ?

কুসুম ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, জবাব দিতে পারিল না। গুরুচরণ তাহার স্কন্ধে একটা ঝাঁকি দিয়া কহিল—কেন ? বল, তা নইলে আমি যাবো না।

কুসুম কি যেন বলিতে চাহিতেছিল কিন্তু বলিতে পারিল না। দুই ফোঁটা চোখের জল মুক্ত করিয়া দিয়া আবার আনত মুখে তিরস্কারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

গুরুচরণ হাত না নামাইয়াই দাঁড়াইয়াছিল। এই স্পর্শটুকু তাহার সর্ব্বাঙ্গে তড়িত প্রবাহের মত ছুটাছুটি করিতেছিল। কহিল—তোমার ভালোবাসা কতদুর তা বুঝেছি কিন্তু মানুষের মনকে এমনি ক'রে মানুষ পোড়াতে পারে তা জানতাম না। যদি কেবল তোমার রহস্যই হয় তবে তা বলা উচিত ছিল। আজ কোথায় এনেছ তুমি···যদি তাই হয় তবে কাল ঘাটে কেন আস্‌তে ব'ললে ? তুমি জানো না কুসুম, এই ভিজা

বনের পথে কাল সারারাত্রি কেমন ক'রে আমি ঘুরেছি, তোমার একটা কথায় আমাকে এমন ক'রে—

গুরুচরণ আর বলিতে পারিল না, ক্রোধে ক্ষোভে ব্যর্থতায় সে সহসা চুপ করিয়া গেল।

কুসুম প্রশান্ত ভিজা চোখ দুইটি মেলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—এসেছিলে ?

—হ্যাঁ, আসতে বলেছিলে তাই! কিন্তু ঘুমন্ত মানুষ তা ত জানে না—যারা বিছানায় আর একজনের বুকের মাঝে মাথা দিয়ে গাঢ় নিশ্বাস ফেলে—

কুসুম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কোন কথা বলিল না। চোখ দুইটি আরও দুই ফোঁটা জলে ভরিয়া উঠিল মাত্র। অত্যন্ত কষ্টে সে কহিল—আমি ভুল করেছিলাম।

—হ্যাঁ, আমিও আগাগোড়াই ভুল বুঝেছি, তা আর ভুল বুঝবো না।

—আমায় ক্ষমা করো।

গুরুচরণ হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ওষ্ঠ কামড়াইয়া সক্রোধে বলিল—হ্যাঁ, ক্ষমা করবো বটে তবে তা তোমারও মনে থাকবে যেমন করে আমি মনে করবো।

কুসুমের সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে গুরুচরণের হাত ধরিয়া কহিল—রাগ করো না। তুমি জানো না তোমার জন্য আমার মন—আমার ভালবাসা তুমি জানো না—কিন্তু—

আপনাকে ব্যক্ত করিতে না পারিয়া অব্যক্ত বেদনায় আপন অক্ষমতার ভারে সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

গুরুচরণ কহিল—সব জানি কুসুম। দৃঢ় মুষ্টি ছাড়িয়া দিয়া

সে কুসুমকে ঠেলিয়া দিল। কুসুমের অশক্ত দেহ টাল সামলাইতে পারিল না, সে পড়িয়া গেল। পাশেই ধানের মাচার একখানা বাঁশ একটু বাহির হইয়াছিল, হাতে লাগিয়া একটু কাটিয়া গেল।

গুরুচরণ ফিরিয়াও চাহিল না। কুসুম আঘাতে কোন কাতরোক্তি করিল না। যেমন অকস্মাৎ গুরুচরণ আসিয়াছিল তেমনি অকস্মাৎ সে চলিয়া গেল—নড়িখানা দরজার পাশে হেলান দেওয়া ছিল তাহাও আনিতে সে ভুলিয়া গেল।

কুসুম রক্তাপ্লুত হাতখানাকে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠিয়া বসিল। বাহিরে তখনও বৃষ্টির ঘন-কুয়াশায় অদূরের বাঁশবন অস্পষ্ট। মেঘের মসি শতধারে পৃথিবীর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যার পর হাট হইতে আসিয়া রসিক তামাক খাইতেছিল। দরজার পাশেই একখানা নড়ি দেখিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। সে চিনিল এ গুরুচরণের—বুকের মাঝে যেন কেমন মোচড়াইয়া উঠিল। তবে কি আজ সব সন্দেহ শেষ হইতে চলিয়াছে!

সে কুসুমকে ডাকিয়া সামনে করিয়া বলিল—এ নড়ি কার?

কুসুম একটু থতমত খাইয়া বলিল—তোমার বন্ধুর।

—গুরোর?

—হুঁ।

—এখানে কখন সে এলো?

কুসুম নিঃসঙ্কোচে কহিল—ঝড় বৃষ্টির সময় মাঠ থেকে ফিরিবার পথে বসেছিল, ভুলে গেছে বোধ হয়?

—ও—আচ্ছা।

কুসুমের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতেই হাতের ক্ষতস্থান তাহার চোখে পড়িল। তাই প্রশ্ন করিল—ও হাত কাটল কেমন ক'রে?

—পড়ে গিয়ে, মাচার ঝাঁপে লেগেছে।

—হঠাৎ পড়ে গেলি কেন? ঘরের মাঝে কি বিষ্টি হ'য়েছে নাকি?

কুসুম করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—সারাদিন ধান ভেনে মাথা ঘুরছিল তাই পড়ে গেছি।

—ও—তাই।

রসিক আর কোন কথা বলিল না। অন্যমনে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। কুসুম বসিয়াই ছিল—সে তাহাদের জন্যে সারাদিন এই গুরুতর পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়াছে, তাহারই জন্যে সে আজ পড়িয়া গিয়াছে বলিল, তথাপি এতটুকু সহানুভূতি দেখাইল না। তাহার প্রতি একটু করুণা নাই তাহার—এই জগত! আজকার অভিমান-ক্রোধ-স্ফীত অন্তরে তাই রসিকের অনাগ্রহ তাহাকে বিচলিত করিয়া ফেলিল। কুসুম একটা কিছু বলিবে বলিয়া বসিয়াই রহিল।

রসিক মুখ ফিরাইয়া বলিল—বসে রইলে যে! রান্না হয়েছে?

—হুঁ!. এখন খাবে?

—হ্যাঁ, হাত পা ধুয়ে নি। তোমার কি হয়েছে?

—ব্যথা লাগ্‌লে মানুষ এমনিই হয়। কুসুম আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া আসিল। অন্য দিনের মত আহারাদি তাহাদের আজ কলহাস্যে ভরিয়া উঠিল না—অত্যন্ত নিঃশব্দে এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহারা আজিকার সন্ধ্যা অতিবাহিত করিল।

পরদিন সকালে কাস্তে হাতে লইয়া গুরুচরণ আসিয়া রসিককে ডাকিল—রসিকদা!

রসিক ঘুমাইয়া ছিল, উঠিয়া বলিল—কিরে?

—চল, ঘাস কেটে নিয়ে আসি। আমার নড়িখানা ফেলে গেছি তোমার এখানে?

হ্যাঁ।

নড়িখানা দিয়া সে বলিল—ফেলে রেখে গেলি কেন?

—ঘাসের বোঝা ছিল সঙ্গে, ভাবলুম তামাক খাই, তা তুমিই বাড়ী নাই। বিষ্টি আস্‌তে দেখে তাড়াতাড়ি গেলাম তাই ভুলে গেছি।

—চাষার ছেলের নড়ি ভুল হলো গুরো? রসিক ব্যঙ্গের সঙ্গে একটু হাসিল, তার পরে বলিল—চল্ যাই মাঠে।

রসিক বাড়ী ফিরিয়া গরুটিকে নাড়িয়া দিয়া একাকী বসিয়া ছিল। স্নান করিতে যাইতে হইবে তাই সে একটু তামাক খাইতেছিল, আর মনে মনে ভাবিতেছিল কুসুম ও গুরুচরণের কথা। মনে মনে অনেক ভাবিয়াও সে এ রহস্যকে ভেদ করিতে পারিল না। কুসুম যেমন পরিশ্রমে তাহাকে আজ খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না যদি সে গুরুচরণকে ভালবাসিত—কিন্তু নিভৃতে যে দুইজনের সাক্ষাৎ হয় তাহার প্রমাণের অভাব নাই কিন্তু তাহার অগোচরে এ সাক্ষাতের কি প্রয়োজন!

রাঙাদি উঠানে একরাশ গুড়াযুক্ত কালো পিচ ফেলিয়া দিয়া রসিককে শুধাইল—বলি ও রসিক, তোমার কুসুম সুন্দরী কই?

রসিক রসিকতা করিল—সুন্দরী নাকি রাঙাদি!

—সুন্দরীই যদি না হবে তবে তাকে ঘরে রাখতে এত ভাবনা কেন? তোমার বয়স হ'ল ত কম না ওর সঙ্গে জমবে কেন?

রসিক কথাটা আঁচ করিয়া বলিল—কথাটা কি স্পষ্টই বল না। ঘরের বৌ ত আর নয় যে আমার জাত যাবে।

রাঙাদি দাওয়ার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া কহিল—তবে ত ভাবনাই নেই।

—কেন? ভাবনা করবো কেন বল না।

—না কিছু না, তবে কাল বিষ্টির মাঝে গুরো আবার তোমার বাড়ী এল কি না তাই ভাবলুম একা মানুষ তুমি। কুসুম যদি সরে পড়ে তবে ত তোর হাঁড়িই সিকেয় উঠবে। তাই তোরা বলিস না বলিস আমি ত খোঁজ খবর নেই। আমি ত সবই জানি তবে বুড়ো মানুষ কথা ত কেউ শোনে না।

রসিক কহিল—কি জানো বলো না। কুসুম কি গুরোর সাথে—গুরো ত তেমন ছেলে নয়।

—আরে তোমার কুসুম যে মুনির মন ভোলাতে পারে।

রসিক ব্যাকুল ভাবে বলিল—কি জানো বলো।

রাঙাদি হাসিয়া বলিলেন—পাপ মুখে বলবো না তোকে দেখাবো।

রাঙাদি চলিয়া গেলেন—শত প্রশ্নেও তাহার নিকট হইতে আর কিছু জানা গেল না। রসিক হুঁকাটি রাখিয়া কিসের একটা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৈকালে কুসুম জলের কলসী রান্নাঘরের দাওয়ায় রাখিতে রাখিতে চাহিয়া দেখিল, রসিক নিবিষ্ট মনে উঠানের এককোণে বসিয়া কি যেন একটা ঘসিতেছে। পুরাতন একখানা যাঁতার পাথর পা ধুইবার জন্যে সেখানে পড়িয়া থাকিত। কুসুম আগাইয়া আসিয়া দেখিল—মরিচাপড়া পুরাতন একটা সড়কিতে ধার দিতেছে। রসিকের মুখে চোখে কিসের একটা দৃঢ় সঙ্কল্প স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ধার পরীক্ষা করিতে করিতে সে মুখ তুলিয়া চাহিল—হিংস্র শ্বাপদের মত তার চোখ দুইটি

জ্বলিতেছে। কুসুমের বুকের মাঝে ছ্যাৎ করিয়া উঠিল—অনাগত কোন অশুভের আশঙ্কায়।

কুসুম ভীতভাবে প্রশ্ন করিল—ও দিয়ে কি হবে?

আবার ধারটা পরীক্ষা করিতে করিতে রসিক কুসুমের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—তোর জন্যে—

কুসুম ভাবিল পরিহাস, তাই বলিল—ধার না দিলেও ত ক্ষতি ছিল না।

—বোঁচা অস্তর ব্যবহার করে মেয়ে মানুষে—লিক্‌লিকে ফলাটা দেখ্‌ছিস্?

—হ্যাঁ চর্ম্মচক্ষে দেখতে ত পারছি, এতই যদি বীরপুরুষ, রান্নাঘরে রোজ ত নেউল ঢোকে, সেটাকে মেরে দাও না। হেঁসেলে কিছু রাখবার যো নেই।

রসিক ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া কহিল—হ্যাঁ, ঘরে নেউল ঢুক্‌ছে ঠিক পাচ্ছি আজকেই গেঁথে ফেলবো। অত ভাবনা কি?

রসিক ঘরের মাঝে সড়কিটা রাখিয়া আসিয়া বলিল—সকাল সকাল রেঁধে ফ্যাল্। কাজ আছে—উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে মাঠের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। বর্ষার মেঘ অবলুপ্ত আকাশের প্রান্তে, অদূরের শ্যাম দিগ্বলয়ের উপরে শুক্লা-দ্বাদশীর চাঁদ আবছা আলোয় সন্ধ্যাকে অন্ধকার মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কুসুম অত্যন্ত শঙ্কিত হৃদয়ে ভাত তুলিয়া দিয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। গুরুচরণ গান করিয়া গিয়াছে—

তাল গাছের দীঘল ছায়া যখন পথের পরে পড়ে
বন্ধু তখন আসে যায় আমায় দেখার তরে।
আমি কেমন করে দুয়ার খুলে আসি।

গুরুচরণ একদিন অত্যন্ত নিভৃতে নিশীথ রাত্রিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আজও কি সে আসিবে? কিন্তু তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যে তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্ত কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ন্যায় অন্যায় ছাপাইয়া একটিমাত্র দুর্জ্জয় বাসনা মনের মাঝে অত্যন্ত সুতীব্র হইয়া উঠিয়াছে—গুরুচরণের সাহচর্য্য না পাইলে জীবন তাহার আজ যেন মরুভূমি।

শোবার ঘরের দাওয়ায় রসিকের হুঁকার শব্দ হইতেছিল হঠাৎ নীরব হইল। রসিক হয় ত গোয়ালে, না হয় কার্য্যান্তরে গিয়াছে—কে যেন ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি কহিল। নাঃ—সম্ভবতঃ বাতাসের শব্দ বাঁশের পাতার ফাঁকে বাধিয়া অমনি শব্দ করিয়াছে।

রাঙাদি ডাক দিলেন—ওলো কুসুম।

—কি রাঙাদি, এসো। জোছনা রাত্রে বেড়াতে বেরিয়েছ নাকি?

—হু, তোকে দেখতে এলাম। দেখি রসিকের রূপসী কি ক'রছে।

—ঠাট্টা কেন?

রাঙাদি কুসুমের অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া কানে কানে কহিল—নাগর আস্‌বে আজ। জেগে থাকিস, নারকেল গাছের মাথায় যখন চাঁদ উঠ্‌বে—ওই হিজল তলায়—কুল্লো যখন ডাক্‌বে—

কুসুম মনে মনে খুসী হইয়া কহিল—ছিঃ রাঙাদি, ওসব আমি পারবো না।

রাঙাদি কুসুমের গালটা টিপিয়া দিয়া কহিল—থাক্ থাক্—সতীলক্ষ্মী হ'য়ে তোর লাভ? রসিকের ঘরের বৌ ত আর নয় যে লোকে ব'লবে। যাকে ভালবাসিস তাকে কি দুঃখ দেওয়া ভাল?

কুসুম একটু হাসিয়া কহিল—আমি গুরোকে ভালবাসি?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমার পাকাচুলের কাছে জিজ্ঞেস ক'রলে পাবি।

—না রাঙাদি, আমার কি উচিত?

—তবে কি গুরোরে আস্‌তে না ক'রবো।

কুসুম কোন কথা কহিল না, একটু পরে উনুনের পানে চাহিয়া কহিল—রাগ ক'রলে রাঙাদি? তোমার ত খুব রাগ!

—হ্যাঁ, বুড়ো হ'লে অমনি হয় রে—অমনি হয়।

রাঙাদি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন কিন্তু তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের অন্তরের মাঝে যেন ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। রসিক যদি জানিতে পারে তবে? উনুনের ভিতরে দ্বিধাবিভক্ত সর্পের জিহ্বার মত উত্তপ্ত আগুনের শিখা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তপ্ত অঙ্গারের মত রসিকের ক্রোধ সমস্ত পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে।

রসিক ডাকিল—রাঙাদি!

রাঙাদি বলিলেন—তোর রূপসীর গুণ আছে। ধান ভেনে ত কারও বৌও সোয়ামীকে খাওয়ায় না, তোর যে এত ভাগ্যি তা কে জান্‌তো!

কুসুম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উনুনের খড়িখানা আগাইয়া দিল।

*

একটা ভাপ্সা গরম গ্রামখানার মাঝে বাসা বাঁধিয়াছে—একটাও গাছের পাতা নড়ে না। স্থির গাছের ফাঁকে অসম্পূর্ণ চাঁদ ভাঙ্গা টিপের মত আকাশের কপালে স্থির হইয়া আছে। গুরুচরণ দাওয়ায় শুইয়া ছিল। ষষ্ঠীচরণ ঘরেই শুইয়া আছে।

গুরুচরণ ভাবিয়াছিল তাহার পিতা ঘুমাইয়াছে কিন্তু সহসা ষষ্ঠিচরণ প্রশ্ন করিল—গুরো, মোষমাথার ধান পাকতে কত দেরী?

—আর দিন-দশেক পরেই কাটা যাবে।

—ধান ত প্রায় ফুরিয়ে এল রে।

গুরুচরণ জবাব দিল না। গোয়ালে গরু দুইটা মশক দংশনে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, গুরুচরণ উঠিয়া গিয়া সাজালটী ভাল করিয়া দিয়া আসিল।

রাঙাদি যাইবার জন্যে সংবাদ দিয়া গিয়াছে—হয় ত কুসুম মনে মনেতাহার জন্যে বেদনা অনুভব করিয়াছে তাই। সে একটু অস্বস্তির সঙ্গেই অপেক্ষা করিতেছিল।

নারিকেল গাছের মাথায় চাঁদ আসিয়া নিশীথরাত্রি ঘোষণা করিল। গুরুচরণ কান পাতিয়া শুনিল ষষ্ঠিচরণের নিশ্বাস অত্যন্ত গভীর হইয়া উঠিয়াছে। সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ীর নীচে গ্রাম্য রাস্তাটা বনের আড়ালে অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোছনা পড়িয়া নানা অবয়বের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাদা কাগজের মত দেখা যাইতেছে—উচু নীচু ঠাহর করা যায় না কিন্তু গুরুচরণের কোন অসুবিধা নাই, এ পথ তাহার মুখস্থ।

কিসের একটা লতা যেন পায়ে বাধিল। গুরুচরণ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল—একখানা নড়িও সঙ্গে আনা হয় নাই। হাতটা যেন অত্যন্ত খালিখালি বোধ হইতেছে। গুরুচরণ আবার চলিল—কেদার মণ্ডল বাহিরে ঘুমাইতেছে, নিবারণ শুইয়া শুইয়া স্ত্রীর সহিত কি যেন লইয়া কলহ করিতেছে। গুরুচরণ নিঃশব্দে চলিল। বাঁশ বাগানের অন্তরালে হিজল গাছের কাণ্ডটা দেখা যাইতেছে—হিজলের লাল ফুল ঝরিয়া পড়িয়া পথটাকে যেন রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে। পায়ের তলায় অত্যন্ত নরম বোধ হইল—ফুলের একটা তীব্র সুগন্ধ নাকের মাঝে যাইয়া একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি আনিয়া দিল—অদূরে কোন বৃক্ষচূড়া হইতে 'কুল্লে' পাখা দ্বিপ্রহর ঘোষণা করিল। গুরুচরণ হিজল গাছের পিছনে দাঁড়াইয়া চাহিল—কিন্তু কুসুমের দ্বার বন্ধ। সাহসী গুরুচরণের বুকের মাঝেও কাঁপিয়া উঠিল।

কুসুম জাগিয়া ছিল—উন্মুক্ত জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল বৃক্ষচ্ছায়া—তাহা ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া আসিতেছে। বাঁশঝাড়ের মাঝে

কি যেন খড় খড় করিতেছে—শুষ্ক পত্র না হয় কোন জানোয়ার। দ্বিপ্রহর রাত্রি পাখার উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইল।

কুসুম রসিককে একটু ধাক্কা দিয়া নিম্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—জেগে আছো?

রসিক নিরুত্তর। অত্যন্ত ভারি নিশ্বাস একটু শব্দ করিয়া বাহির হইতেছে। কুসুম উঠিয়া বসিল, বাঁশের মাচা খচমচ করিয়া উঠিল। কুসুম একটু দেরী করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া ফেলিল, রসিক তবুও জাগে না।

হিজলতলায় কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। আবছা আলোয় সাদা কাপড়খানা বেশ দেখা যাইতেছে। সে ভাবিল—গুরুচরণকে সে এমনি করিয়া ডাকিতে বারণ করিয়া দিবে, এমন করিয়া ডাকিলে সে যে কিছুতেই ফিরাইয়া দিতে পারে না! কুসুম নিকটবর্ত্তী হইয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কে—বন্ধু?

—হ্যাঁ, কুসুম।

কুসুম আরও একটু নিকটে আসিতেই, গুরুচরণের অধীর প্রতীক্ষা ব্যাকুল বাহু দুইখানি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিল।

কুসুম সস্নেহ কণ্ঠে কহিল—আমাকে ডেকেছ কেন বন্ধু?

গুরুচরণ তাহাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল—তুমিই ত আমায় আসতে বলেছ কুসুম।

কুসুম স্মিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—আমি?

—হ্যাঁ। শুভ্র জোছনায় কুসুমের মুখখানি শুভ্র কুন্দফুলের স্তূপের মত মনে হইতেছে। গুরুচরণ মাথা নীচু করিয়া কুসুমের কানের কাছে মুখ লইয়া কহিল—এস।

—কোথায়? না না—

রসিক সারাদিন গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, প্রাণপণ-যত্নে জাগিয়াছিল, কুসুম তাহার বুকের অতি সন্নিকটে শুইয়াছিল—সুপ্তিমগ্ন বিবশ দেহখানা আধ জোছনায় আধ অন্ধকারে মোহময় কামনাপুঞ্জের মত পড়িয়াছিল, কিন্তু কখন সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ঠিক পায় নাই। অজ্ঞান মনে কেবলমাত্র একটি শঙ্কা ও সতর্কতা জাগিয়া ছিল—জাগিয়া থাকিতে হইবে। রাত্রি তিনটায় গাড়ী বদল করিতে হইবে অথচ চল্‌তি গাড়ীর মধ্যে চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে তখন যেমন একটা দুরূহ সতর্কতায় মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙিয়া যায় তেমনি করিয়া রসিক চমকাইয়া উঠিল—কুসুম শয্যায় নাই।

সে উঠিয়া বসিল। মুহূর্ত্তের মাঝে সমস্ত রক্তধারা যেন বিদ্যুৎবেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিল—বুকের পাঁজরা ভাঙিয়া লইয়া কুসুম উঠিয়া গিয়াছে—দরজা উন্মুক্ত! রসিক উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সড়কিটাকে ধরিয়া নিঃশব্দপদে বাহির হইয়া আসিল।

কুসুম কোথাও নাই—বাড়ীখানা পত্রহীন বৃক্ষের মত শূন্য, খাঁ খাঁ করিতেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায়ও নাই, ঘরে ঠিক তেমনি তালা ঝুলিতেছে। খড়ের পালাটাকে সম্মুখে রাখিয়া রসিক উঠানের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

গভীর রাত্রের নীরবতার মাঝে একটা নিম্নকণ্ঠের আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। রসিক শ্বাপদের মত হিংস্র চক্ষু মেলিয়া দেখিল—হিজলতলায় দাঁড়াইয়া কাহারা—কুসুমের লালপেড়ে শাড়ীর প্রান্ত ফিকে হইয়া দেখা যাইতেছে।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া সড়কিটাকে সমস্ত শক্তি দিয়া আন্দোলিত করিয়া ছুড়িয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল—হেঁইও।

জোছনায় সড়কির ফলাটা একবার ঝিক্‌মিক্ করিয়া তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

গুরুচরণ কুসুমকে বুকের মাঝে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল কিন্তু সতর্ক কানে কি যেন একটা শব্দ ভাসিয়া আসিল। শুষ্ক খড় যেন কাহার পদশব্দে একটু খস্ খস্ করিয়া উঠিয়াছে! সে মুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখিল—কি যেন একটা বস্তু তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার মাথাটা আলোক-পিণ্ডের মত ঝিকমিক্ করিতেছে। ছুটিয়া আসিতেছে তাহারই বুক লক্ষ্য করিয়া—সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট শব্দ হেঁইও—

সে প্রবৃত্তিগত ভাবে চোখ বুজিয়া সরিয়া যাইতেই রসিকের নিক্ষিপ্ত সড়কি আসিয়া হিজল গাছের কাণ্ডে আমূল বিঁধিয়া রহিল। গুরুচরণ কুসুমকে একটা ধাক্কায় সরাইয়া দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল—কোথায়, কেন তাহা ঠিক বুঝিল না।

গুরুচরণ ছুটিয়াছে—স্বল্পালোকিত পথটা দ্রুত পায়ের তলায় সরিয়া যাইতেছে। অকস্মাৎ নৈশ-নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একটা তীব্র নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ তাহার কানে প্রবেশ করিল—বাবা গো—

এত দ্রুততার মাঝেও তাহার পরিচিত কণ্ঠস্বর ভুল হইল না। এ আর্ত্তনাদ কুসুমের—সে থমকিয়া দাঁড়াইল—পাষণ্ড রসিক কি সড়কিটাই কুসুমের বুকে আমূল বসাইয়া দিয়াছে? এমনি সময়ে অত্যন্ত কাপুরুষের মত পলাইয়া আসা কি তাহার সমীচীন হইয়াছে? গুরুচরণ কি যেন চিন্তা করিয়া পথপার্শ্বের একটা জিয়ল গাছ হইতে একখানা ভারি ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা হাতে করিয়া আগাইয়া চলিল—যদি সম্মুখ হইতে হয় তবে রসিকের সাধ্য নাই যে তাহার অঙ্গে সড়কি নিক্ষেপ করে।

আবার সেই হিজল গাছের পিছনে দাঁড়াইয়া সে দেখিল—জ্যোৎস্নালোকিত উঠানের উপর দিয়া রসিক কুসুমের কেশাকর্ষণ করিয়া তাহার ভীত-বিহ্বল দেহখানিকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং অস্ফুট ভাষায় কি যেন আস্ফালন করিতেছে। গুরুচরণ ভাবিল, কাপুরুষ, অসহায় মেয়েমানুষকে এমনি করিয়া মারিবার মধ্যে কি পৌরুষ আছে? কেশাকর্ষণের বেদনায় কুসুম মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—বাবা গো, আর পারি না, আর মেরো না তোমার পায়ে পড়ি—

কুসুমের সমস্ত অনুনয় উপেক্ষা করিয়া রসিক চীৎকার করিয়া কহিল—ডাক্ তোর গুরোকে তোকে রক্ষে করুক। শালী তোর—

রসিকের অশ্লীল গালি কুসুমের অতৃপ্ত কামনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া অত্যন্ত কুৎসিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। গুরুচরণ একবার ভাবিল—আগাইয়া যাইয়া রসিককে বুঝাইয়া আসে যে কুসুমকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার সত্যই আছে কিন্তু কুসুমের চীৎকারে অন্য কেহ যদি আসে তবে তাহাকে দেখিয়া কি ভাবিবে?

কুসুমের লাঞ্ছিত দেহখানা উঠানের মাঝে পড়িয়াছিল, রসিক কহিল—দাঁড়া শালি, তোর কতই—

রসিক দাওয়ার উপর হইতে নড়িখানা টানিয়া আনিয়া কয়েকবার যথেচ্ছভাবে কুসুমকে প্রহার করিল। কুসুম একবার অতর্কিত প্রহারে চীৎকার করিয়া উঠিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, আবার প্রহারে সে ছট্-ফট্ করিল বটে কিন্তু চীৎকার করিল না। একটা দুর্জ্জয় অভিমানে সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া রহিল।

গুরুচরণ দৃঢ়মুষ্টিতে জিয়লের ডালখানা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বুকের মাঝে একটা গুরুভার বেদনা যেন মোচড়াইয়া উঠিল—হায় হায়, কুসুমকে

সে এমনি ভাবে বিপন্ন কেন করিল ! তাহাকে ফিরাইয়া দিলে আজ এমন লাঞ্ছনা তাহার হইত না। গুরুচরণ কাঁদিয়া ফেলিল। সে বলিষ্ঠ জোয়ান, 'কেজে'য় রসিকের মত দশজনকেও সে গ্রাহ্য করিত না কিন্তু তবুও সে নিতান্ত অসহায় শিশুর মত কাঁদিয়াই ফেলিল।

পাড়ার নবীন বৈরাগী, কেদার, নিবারণ প্রভৃতি সকলে ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কি হ'ল ? কি হ'ল রে রসিক ?

রসিকের হাত হইতে নড়িখানা কাড়িয়া লইয়া নবীনদা কহিল—দে দে, মেরে ফেলবি না কি রে রসিক—আহা খুন ত ক'রেছিস্‌ই—

রসিক তবুও আস্ফালন করিল—খুনই কর্‌বো ওকে নবীনদা, খুনই কর্‌বো—

লজ্জায় ঘৃণায় আহত কুসুম যেমন করিয়া পড়িয়া ছিল তেমনি করিয়াই পড়িয়া রহিল—মনে মনে শুধু সে একবার বলিল—হায় হায় মানুষের মৃত্যু এত সহজলভ্য নয় কেন ? একটা বাড়ি ত তাহার মাথায় লাগিয়া সেটাকে চুরমার করিয়া ফেলিতে পারিত কিন্তু তাহা করিল না কেন ? মাথাটা তাহার কেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় নাই এই দুঃখেই যেন সে কাঁদিয়া উঠিল।

নবীন কহিল—ওঠো দিদি ওঠো, রসিকটা একেবারেই চণ্ডাল।

গুরুচরণ গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখের জল মুছিয়া চলিয়া আসিল। একটা বেদনাহত অনুশোচনা তাহার সমস্ত অন্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিল। হায় হায় সে কেন এমন করিল !

নবীন কহিল—কেন মারলি রসিক ? পাড়ায় পাড়ায় ধান ভেনে তোকে খাওয়ালে, সে সব কি ভুলে গেলি ? আর গুরো যদি এসেই থাকে, কেন তা কি জানিস্‌ ?

নিবারণ রসিকতা করিল—ভাগবত পাঠ ক'র্‌তে এসেছিল বোধ হয়।

—হঠাৎ দেখাও ত হ'তে পারে! গুরো হয় ত রসিকের কাছে এসেছিল!

রসিক উচ্চকণ্ঠে কহিল—তুমি থামো নবীনদা, আমাকে আর ন্যাকা বুঝিও না।

নবীন ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—ঘরের বৌ ত নয় যে এমনি লাঞ্ছনা কর্‌বি! যেদিন চলে যাবে সেদিন বুঝবি! যে ধান ভেনে তোকে খাওয়ায় সে কি গেছে—

রসিক জবাব দিল না—বারবার ওই কথাটাই ধ্বনিত হইতে লাগিল। কুসুম ত ঘরের বৌ নয়, তাহার পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আশা করা হয় ত অত্যধিক।

পরদিন ভোরেই কথাটা, তথা দুর্ঘটনাটী সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কেহ কেহ গুরুচরণকে মনে মনে ঈর্ষা করিল, কেহ কেহ তারিফ করিল, কেহ কেহ কহিল—গুরোর মত ছেলের মাথা খেয়েছে—ওটা ত ডাইনী। কথাটা অবিলম্বে ষষ্ঠিচরণের কানেও পৌঁছিল, এবং দিগম্বরীও যেন কথাটার কদর্থ সকলখানিই বুঝিয়া ফেলিয়াছে এমনি গম্ভীর হইয়া গেল।

ভোরে উঠিয়া গুরুচরণ ধান কাটিতে গিয়াছিল। এখন এক বোঝা ধান গোয়ালের সাম্‌নে ফেলিয়া আসিয়া তামাকু সাজিতে বসিল।

ষষ্ঠিচরণ দেখিল তামাকু পানান্তে গুরুচরণ সুস্থ হইয়াছে। সে প্রশ্ন করিল—এ সব কি শুন্‌চি গুরো!

গুরুচরণ সংক্ষেপে কহিল—কি?

—কুসুম আর তোকে নাকি এক সড়কিতে কাল গেঁথে ফেলেছিল আর কি?

—আমি? ওসব কিছু জানি না!

বষ্ঠিচরণ আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিল কিন্তু কোন জবাব পাইল না। দিগম্বরীকে ডাকিয়া কহিল—বৌমা, গুরোর ভাত জল দাও।

দিগম্বরী দরজার আড়াল হইতে গুরুচরণকে লক্ষ্য করিতেছিল। বষ্ঠিচরণ একটু বিরক্তির সঙ্গে কহিল—গুরো, বিনা অস্ত্রে রাত-বেরাতে চলিস্? ষষ্ঠি সর্দ্দারের ছেলে হ'য়ে? সড়কিতে গাথ্‌বে তোকে?

ষষ্ঠিচরণ উঠিয়া গিয়া গরুর ঘাস কয়েকটির জাবনার ব্যবস্থা করিল। দিগম্বরী অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—কুসুমের কাছে গেছিলি কেন?

গুরুচরণ চাহিয়া দেখে দিগম্বরী—সর্ব্বাঙ্গে যৌবনসঞ্চারের কোমলতা বিছাইয়া রহিয়াছে। অকুণ্ঠ ক্রোধে, কৈশোরের অভিমান সজল আঁখি লইয়া সে প্রশ্ন করিয়াছে। গুরুচরণ একটু হাসিয়া কহিল—সে যে আমাকে ভালবাসে, তুই ত বাসিস্ না।

—পরের পাত কুড়ানো খাস্, তোর লজ্জা ঘেন্না নেই?

—লজ্জা ঘেন্না থাক্‌লে তোর সঙ্গে আবার কথা বলি? আমি ভাগবত পাঠ ক'র্‌তে গিয়েছিলাম। অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গুরুচরণ হাসিয়া উঠিল। দিগম্বরী দুম্‌দাম্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

গোলমালটা ধীরে ধীরে বেশ পাকাইয়া উঠিল—এই ঘটনার মূল কর্ত্রী রাঙাদি ঘন ঘন সংবাদ আদান প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ষষ্ঠি-চরণ সংবাদ পাইয়াছে—রসিক নাকি প্রকাশ করিয়াছে যে গুরোকে সে খুন করিবেই; সে যেন সাবধানে চলা-ফেরা করে—তাহার সহিত আরও অনেক কথা। কুসুম দুইদিন অন্নজল ত্যাগ করিয়া পড়িয়াছিল তাহার পর আবার উঠিয়া ভাঙা সংসার জোড়া লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠিচরণ গুরুচরণকে কহিল—গুরো, রাত-বেরাতে বেরুতে পারবি

নে। রসিক যদি খুনই করে তবে যেন সাম্‌নাসাম্‌নি লড়ে মরিস। আঁধারে পেছন থেকে যেন না মারে!

গুরুচরণ কহিল—রসিক মারবে? ফুঃ—আর জন-দশেক যদি ডেকে আনে তবে ত!

রাঙাদি গোপনে সংবাদ আনিয়াছে—গুরুচরণ যেন বাহিরে থাকে, কুসুম একদিন আসিবে। গুরুচরণ বলিয়াছে—না, তাকে আস্‌তে বারণ ক'রো। সে যেন রসিকের গেরস্থালী গুছিয়ে নেয়।

গ্রামের লোকও দুইদলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে—একদল গুরুচরণকে অভয় দিয়াছে আর একদল বলিয়াছে রসিককে—এত বড় অন্যায় সহ্য ক'রো না রসিক, আমরা আছি। গুরো না হয় সর্দ্দার হ'য়েছে, কিন্তু লাঠি সড়কি ত আমরা ধরতে জানি।

সেদিন গুরুচরণ মোষমাথার জমি দেখিতে গিয়াছিল—ধান কাটিবার মত হইয়াছে কিনা। জমিতে সোনার ফসল, সোনালী রৌদ্রে চিক্ চিক্ করিতেছিল। সারা বৎসরের শ্রমের পর আজ ফসল ফলিয়াছে। গুরুচরণ কাস্তে হাতে হাসিতে হাসিতে চলিয়াছিল। সে আনমনে গাহিল—

আমার মাঠে সোনার ফসল পাকলো রে,
ঘরে ঘরে আসন তার পাতলো রে।
বন্ধুর খোঁপায় ধানের শিষ
বিঘের ফল্‌লে তিন বিষ।
তোমার টিপ কিন্‌বো রে।

গুরুচরণ একখানা পাটের জমি পার হইয়া আগাইয়া গেল। এইখানা পার হইলেই মোষমাথার জমিটি দেখা যায়—পাটের গাছগুলি মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। গুরুচরণ পাটের গাছগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া

চলিল—কিন্তু ওই জমিটায় লোক কেন? কে যে ধান কাটিতেছে বলিয়া মনে হয়। গুরুচরণ ছুটিয়া গিয়া দেখে রসিক ধান কাটিতেছে এবং আর কয়েকজন ঐ পাড়ার লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গুরুচরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি যে আমার জমির ধান কাটছো, রসিকদা?

—কাটবো, তোর যা কর্‌বার ক্ষমতা কর্‌।

—তোমার কি কেজে করার সখ হ'য়েছে? কিন্তু এটা কি ভাল হ'ল?

—কেন তুই কি করবি—আয় শালা—

রসিক হাতের কাস্তে ফেলিয়া লাঠি লইয়া ছুটিয়া আসিল। গুরুচরণ একটুও না নড়িয়া বলিল—মারবে নাকি?

—আয়, শালা পিরিতের ঝাল তুলি—রসিক দ্বিরুক্তি না করিয়া লাঠি উঠাইয়া গুরুচরণের মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিল কিন্তু গুরুচরণ কাস্তে উঠাইয়া ঠেকাইতে গেলে লাঠির অগ্রভাগ মাত্র তাহার মাথায় লাগিয়া একটু কাটিয়া গেল। গুরুচরণ কপালে হাত দিয়া দেখে উষ্ণরক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় কপালে আসিয়া পড়িতেছে। গুরুচরণ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—বটে রে—আস্পর্দ্ধা! দাঁড়া তবে আসি—

গুরুচরণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

বাড়ীতে আসিয়া বিন্দুমাত্র দেরী না করিয়া গুরুচরণ ঢাল ও একগোছা সড়কি বাহির করিয়া আনিল। ষষ্ঠিচরণ কহিল—কিরে গুরো?

গুরুচরণ সংক্ষেপে কহিল—রসিক মোষমাথার ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে আর মেরেছে।

ষষ্ঠি লক্ষ্য করিল গুরুচরণের গণ্ডের উপর শুষ্ক রক্তধারা। সে চীৎকার করিয়া কহিল—র'সের এতবড় সাহস-আমার ছেলের গায়ে হাত! দাঁড়া গুরো—

ষষ্ঠিচরণের বাঁকা কোমর অকস্মাৎ সিধা হইয়া গেল। সে ঘর হইতে ঢাল ও সড়কি বাহির করিয়া আনিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া তীব্র স্বরে মুখের সামনে হাত কাঁপাইয়া হাঁকিল—আ-আ-আ-আ—

গুরুচরণ সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি অনুসরণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে এই সমর বার্ত্তা প্রচার করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে পাড়ার জোয়ান পুরুষেরা ঢাল সড়কি লইয়া আসিয়া কহিল—কোথায় ?

কেন মারামারি করিতে হইবে তাহা কেহ প্রশ্ন করিল না, সকলে মিলিয়া একটা সমবেত বিকট শব্দে শুধু জানাইয়া দিল—যুদ্ধ আগত।

ষষ্ঠিচরণ কহিল—চলে আয় বাপের ব্যাটারা সব—

গুরুচরণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে। কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, বৃদ্ধ ষষ্ঠিচরণ সোজা হইয়া এমনি তীব্র গতিতে দৌড়াইতে পারে। বাতাসে শুভ্র চুলগুলি উড়িয়া উড়িয়া কেবল জানাইল, সে বৃদ্ধ ষষ্ঠিসর্দ্দার, তাহা না হইলে হয় ত লোকে ভাবিত—এ কাহার জোয়ান ছেলে কেজেয় যাইতেছে।

পায়ের নীচে ঈষৎ শুষ্ক মৃত্তিকা বসিয়া যাইতেছে—ধাবমান জনশ্রেণীর পদতাড়নায় ধান ও পাটের গাছ ছিঁড়িয়া খুঁড়িযা উড়িয়া যাইতেছে। যুদ্ধের উন্মাদনায় কয়েকটি প্রাণী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল ছুটিয়াছে।

ছুটিতে ছুটিতে গুরুচরণ ষষ্ঠিকে প্রশ্ন করিল—একেবারে গেঁথে ফেল্‌বো বাবা !

—না।

কথাটা সংক্ষেপ কিন্তু তাহার গুরুত্ব অনেকখানি—অর্থাৎ কেবলমাত্র জখমই করিতে হইবে না খুনও করিতে হইবে। রসিককে একেবারে খুন করিতে গুরুচরণেরও যেন হাত উঠিতেছিল না।

গুরুচরণ আর একবার সমরধ্বনি করিল—আ-আ-আ-আ—

রসিক উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—জন পনর লোক তীব্রগতিতে ঢাল ও সড়কি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের সমবেত কণ্ঠের তেজোদীপ্ত ধ্বনিতে তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। সেও ঢাল ও সড়কি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নটবর কহিল—রসিকদা, ষষ্ঠিসর্দ্দারও আস্‌ছে যে!

—আসবেই ত? মরতে ভয় পাস্ আর এসেছিস কেজে ক'রতে?

কিন্তু রসিকের উৎসাহবাণী কোন কাজেই লাগিল না। রসিকের সহায়ক লোক কয়েকটি রসিককে সম্মুখে দিয়া একটু পিছাইয়া দাঁড়াইল। রসিক চারিপাশে চাহিয়া দেখিল, সে প্রায় একাই অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া আছে—তাহার পিছনে আর সকলে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়াইয়াছে। রসিক এক পাও নড়িল না—সে জানে ষষ্ঠি কি গুরুচরণের সম্মুখে পড়িলে তাহার কি হইবে, তথাপি সে রুদ্ধনিশ্বাসে দাতেদাঁত চাপিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া দেখিতে লাগিল—গুরুচরণ কোথায়! মরিতে তাহার আর দুঃখ নাই কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে গুরুচরণকে সে একবার দেখিয়া যাইতে চায়—এত ব্যস্ততা, এত ক্রোধ, এত বড় অভাবনীয় দুর্ঘটনা, এক নিমিষেই হয় ত জীবনের শেষ হইবে তথাপি তাহার মনে পড়ে কুসুমের মুখখানি। আসিবার সময় মিনতিভরা স্বরে প্রার্থনা করিয়াছিল—মারামারি ক'রো না ওদের সঙ্গে—তাতে কি হবে! রসিক লাভ ক্ষতির বিচার করে নাই, সে চাহিয়াছে গুরুচরণকে শাস্তি দিতে, তাই জীবন পণেও সে আসিয়াছে অন্যায় ভাবে কেজে বাধাইতে।

নবীন সকালে উঠিয়া একতারা ও ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে হালটের উপর আসিয়া শোনে একদল

লোক ঢাল সড়কি লইয়া ছুটিয়া যাইতেছে—একটি মারামারি আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে মাঠের পানে ছুটিল—কাহার সহিত, কেন তাহা জানিবার অবকাশ হইল না।

তাহার হৃদপিণ্ডের মধ্যে দুপ্ দুপ্ করিয়া উঠিল—হায় মানুষ! ভাইএ ভাইএ কেন মারামারি করে? তুচ্ছ বিষয়, তুচ্ছ এই মোহময় সংসার, তবুও এত তাহার আকর্ষণ, এত তাহার দুর্জ্জয় শক্তি!

নবীন ছুটিল। অদূরে একটা পাটের জমির অন্তরালে যেন কতকগুলি লোক সমবেত হইয়াছে। নবীন ধানের জমি, পাটের জমি ভাঙিয়া ছুটিল।

বার্দ্ধক্যের জীর্ণ শরীরে ছুটিবার মত পটুতা ছিল না তাহাতে ধান ও পাটের গাছ পায়ের আঙুলের ফাঁকে বাধিয়া যাইতেছে। নবীন ভিক্ষাপাত্র ও একতারা লইয়া পড়িয়া গেল। মাজায় একটা চোট লাগিয়াছে, ভিক্ষাপাত্রটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নবীন তবুও ছুটিল।

দুর হইতেই সে বুঝিল ঢাল ও সড়কি হাতে তাহারা মরণ-যুদ্ধে সমবেত হইয়াছে। একপাশে দুইদল লোক সাম্‌নাসামনি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়াইয়া—একটু একটু এগোনো পিছোনো হইতেছে। আর তাহার পাশে দুইটি লোক উদ্ধত সড়কি হস্তে সামনাসাম্‌নি দাঁড়াইয়া সড়কি নিক্ষেপের সময় লক্ষ্য করিতেছে।

নবীনের অন্তর হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—এমনি করিয়া উহারা কেন মরে? নবীনের বুকের ভিতর মোচড়াইয়া উঠিল। সে তারস্বরে হাঁকিল—ওরে তোরা থাম্ থাম্—

সে কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না—সে সময়ও তাহাদের নাই। সকলেই সড়কির গতি ও লক্ষ্যস্থল অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতেছে। মাঝে মাঝে দুই-একটা উড়ো সড়কি এদিক ওদিক যাতায়াত

করিতেছে। প্রভাতের রৌদ্রে তাহার শাণিত ফলাগুলি ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।

গুরুচরণ ছুটিয়া আসিয়া রসিকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল—আয় শালা, তোর জন্মের ভাত কাপড় ঘুচিয়ে দি।

রসিক সড়কি হাতে দাঁড়াইয়া আছে, পাশ দিয়া তাহার উরু ভেদকরা গুরুচরণের পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য ছিল কিন্তু রসিক নড়িল না। রসিককে এমনিভাবে মারিতে তাহার হাত উঠিল না, সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—ঢাল ধরতে শিখিস্ নি, এসেছিস কেজে করতে! এই নে! বলিয়া গুরুচরণ সড়কি দিয়া রসিকের উরুদেশে আঘাত করিল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া সে সামান্য ক্ষত করিল মাত্র। রসিক দাঁড়াইয়া রহিল বিশেষ কিছু করিল না, ঢাল ধরিয়া আক্রমণ করিবার মত ইচ্ছাও যেন তাহার নাই!

গুরুচরণ হাসিয়া কহিল—রসিকদা, আরও একটু দেখার সাধ আছে নাকি?

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে রসিকের নিক্ষিপ্ত একটা সড়কি তীব্রবেগে আসিয়া গুরুচরণের ঢালে বিঁধিল। গুরুচরণ মুহূর্ত্তে সেটাকে দা দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া সড়কি বাগাইয়া ধরিল।

ওদিকে ষষ্ঠিসর্দ্দারের আক্রমণে অন্য সকলে সাম্‌নে ঢাল রাখিয়া পিছু দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। রসিক একাকী গুরুচরণের সাম্‌নে রুদ্ধনিশ্বাসে আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ওই দলের কে যেন 'বাবা গো' বলিয়া পড়িয়া গেল।

গুরুচরণ দেখে নবীনদা দৌড়াইতে দৌড়াইতে চীৎকার করিতেছে—ওরে থাম্ গুরো—রসিক থাম্—

নবীন আসিয়া প'ড়িল এবং গুরুচরণের পিছন হইতে তাহার কোমর ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—ওরে মারিস নি থাম্!

সঙ্গে সঙ্গে রসিক সড়কিটাকে সমস্ত শক্তি দিয়া ছুড়িয়া দিল—গুরুচরণ আবাল্য শিক্ষায় অত্যন্ত তৎপর—সে একটু লাফ দিয়া সরিয়া গেল কিন্তু রসিকের নিক্ষিপ্ত সড়কি নবীনকে মার্জ্জনা করিল না। সড়কির সুধার ফলাটা নবীনের উরুদেশ ভেদ করিয়া ওপাশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। নবীন একবার মাত্র আর্ত্তকণ্ঠে কহিল—ওরে বাবা রে—তাহার পরে দাঁড়াইবার মত শক্তি আর রহিল না, সে পড়িয়া গেল।

গুরুচরণ আগাইয়া গিয়া কহিল—তবে রে শালা—নবীনদাকে খুন করলি! গুরুচরণ উদ্ধত সড়কি লইয়া রসিককে আক্রমণ করিল কিন্তু রসিক আর দাঁড়াইল না, ঢালটাকে সম্মুখে আড়াল করিয়া পিছু ছুটিতে লাগিল এবং কিছুদূরে যাইয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ঢালটাকে পিঠের উপর রাখিয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।

পলায়নপর শত্রুকে আক্রমণ করা কাপুরুষতা তাই গুরুচরণ আসিয়া দাঁড়াইল। ওদিকে তখন শত্রুপক্ষ হটিতে হটিতে গ্রামে যাইয়া উঠিয়াছে এবং ষষ্ঠীচরণ সদলে ফিরিয়া আসিতেছে। গুরুচরণ তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দেখে নবীন ধানের জমির ভিতর পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং উরুদেশের ক্ষত হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইয়া জমির শুষ্ক মৃত্তিকাকে কর্দ্দমাক্ত করিয়া দিয়াছে। গুরুচরণ একটানে সড়কিটাকে বাহির করিয়া ফেলিয়া নবীনের ক্ষতস্থান দুইহাতে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু রক্তধারা তবুও শান্ত হয় না, গুরুচরণের দুই হাত বাহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল—সে একটু ন্যাকড়া খুঁজিল কিন্তু মাঠের মধ্যে তাহা সুপ্রাপ্য নয় তাই সে নিজের গামছাখানা কোমর হইতে খুলিয়া নবীনের উরুদেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রক্তক্ষরণ নিবারণ করিয়া দিল।

ষষ্ঠীচরণ প্রশ্ন করিল—নবীনদাকে কে মারলে ?

—রসিক।

—হায়, হায়, তুমি এ সব কেজে দাঙ্গার মধ্যে কেন এলে নবীনদা ? এর মধ্যে কি আস্‌তে আছে, কেজেয় যে গোবেচারা লোকই মরে।

নবীন কাতরকণ্ঠে কহিল—তোমরা কেন অমন কর ষষ্ঠীদা। তুমি বুড়োমানুষ, তুমিও ক্ষেপে গেলে ?

ষষ্ঠীচরণ হাসিয়া কহিল—আমার পাকাধান কেটে নেবে আর দাঁড়িয়ে দেখবো—না ? আমি ত আর সংসার ছেড়ে বৈরাগী হই নি। ওরে গুরো, কাটা ধানের আঁটি কটা নিয়ে চল। শশী আর বিষ্টু নবীনদাকে নিয়ে চল।

গুরুচরণ কাটা ধানের আঁটি কয়েকটি মাথায় করিয়া লইল এবং দুইজনে নবীনের আহত দেহকে স্কন্ধে করিয়া চলিয়া গেল। গুরুচরণ একটু হাসিয়া কহিল—বাবা, রসিকটা একেবারে মরিয়া, ঢাল ধরতে জানে না, এসেছে কেজে ক'রতে—সাহস কত ?

—হ্যাঁ, ঢাল ধরতে তোরা সকলেই জানিস্—ও আর বলে লাভ নেই। চল্—

নবীন যাতনায় একবার কহিল—ওঃ। তাহার পর বলিল—দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল ? এমনি ক'রে তোরা মানুষ খুন ক'রতে পারিস রে গুরো ? কেমন করে তাজা শরীরে সড়কি মারিস্ ?

গুরুচরণ পিতার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র, কোন জবাব দিল না।

আহত নবীনের দেহকে বারান্দায় রাখিয়া সকলে তামাকু সেবনে প্রবৃত্ত হইল। গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিল—খুব যন্ত্রণা হচ্ছে নবীনদা ?

—আমার সুখের জন্য কি ব্যবস্থা ক'রেছিস্ ভাই ? দে একটু গাঁদা পাতা দিয়ে বেঁধে দে।

গুরুচরণ গাঁদা ফুলের পাতা সংগ্রহ করিতে গেল। ষষ্ঠী বলিল—বিষ্ণু যা, মনিববাবুকে ডেকে আন—দত্তমশায় বাড়ীতেই আছেন।

গুরুচরণ ছেঁড়া ন্যাকড়া সংগ্রহ করিয়া গাঁদার পাতার রস দিয়া নবীনের উরুদেশ ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিল। ষষ্ঠী সকলকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁ, তোরা সব বাপের বেটা বটে কিন্তু ও নিবারণ খামকা পড়ে গিয়ে বাবা গো ব'লে উঠ্‌ল কেন?

কেদার হাসিয়া বলিল—আ'লে বেধে আপনি পড়ে গেছে। সড়কিটা আর মারলুম না, একটা লাথি দিয়েছিলাম তাই ক্যাঁক্ ক'রে উঠ্‌লে—

ষষ্ঠী হাসিয়া কহিল—কিন্তু তোরা ত কিছুই শিখিস্ নি। জোছনা রাতে মাঝে মাঝে এসে ত একটু একটু শিখে যেতে পারিস। কবে মরে যাবো—

—আমরা ত আসতে পারি, কিন্তু তোমাদেরই ত সময় হয় না ষষ্ঠী-খুড়ো। নজরবন্দীটা আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে। সেবার যেমন সাতজন সর্দ্দারকে ঘায়েল ক'রে বেরিয়ে এলে নজরবন্দী না হ'লে শুধু কি সড়কিতে হয় খুড়ো?

ষষ্ঠীচরণ একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল—কতকটা আত্ম-প্রসাদে, কতকটা শিষ্যবৃন্দের শ্রদ্ধায় তৃপ্তি লাভ করিয়া।

অনতিবিলম্বে দত্ত মহাশয় অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষষ্ঠীচরণ একটা জলচৌকি মুছিয়া দিয়া বলিল—বসুন, প্রণাম হই—

সকলে প্রণাম করিল। দত্ত মহাশয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া কহিলেন—হঃ। রসিকের এতবড় আস্পর্দ্ধা কেন হয়? নিশ্চয়ই এ ব্রজ বোসের কাণ্ড। আচ্ছা—আমার বড় প্রজা ষষ্ঠীকে মারাও যা আমাকে মারাও তাই, তোরা পারিস সহ্য কর, কিন্তু আমি সহ্য ক'রব না; যত টাকা লাগে—ও নবীন, নবীন!

নবীন বলিল—কি ? দত্তমশায় ।

—তোমাকে কিন্তু সাক্ষী দিতে হবে, মিথ্যা কিছু নয়, কে মেরেছে ব'ল্‌তে পারবে ত ?

নবীন কাতরকণ্ঠে কহিল—যা হয়েছে যাক্‌, আষাঢ় মাসের দিনে আর মামলায় দরকার নেই । আপনি আর বোসমশায় মিট্‌মাট্‌ ক'রে দিন । ওরা ত জখম হয় নি, হ'য়েছি আমি । তার জন্যে আমি কারও নামে নালিশ করি নে—হঠাৎ যা হয়েছে—

দত্ত মহাশয় তাহার বিরাট টাকটার উপর হাতের তালু ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—সকলে বৈরাগী নয় নবীন, ধর্ম্মতত্ব সকলে বোঝে না । বাঘ ভালুকে বৈরাগী হয় না । যাক্—

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দত্ত মহাশয় কহিলেন—তোরা নবীনকে সঙ্গে ক'রে সহরে নিয়ে চল্‌ । আমি সঙ্গে যাবো, আমি এক্ষুণি দুটো খেয়ে নিয়ে যাবো—কয়েকটা টাকা নিস্‌। ডাক্তারের সার্টিফিকেটটা ভাল চাই, কিছু তাকে দিতে হবে—পুলিসকেও কিছু—আচ্ছা সে হবে'খন তোরা এখনই রওনা দে—

নবীন প্রতিবাদ করিল—ডাক্তারের কোন প্রয়োজন নেই, আমার এ এমনি ভাল হ'য়ে যাবে দত্তমশায় ।

—এমনি ঘা ভাল হতে পারে কিন্তু মনের ঘা ত গাঁদা ফুলের পাতায় যাবে না ।

ষষ্ঠীচরণ একটু চিন্তিত হইয়া কহিল—কিন্তু এ আষাঢ় মাসে টাকা কোথায় পাবো ।

—টাকা ? মনিব থাকে কেন ? যদি না অসময়ে দু'চার টাকা ধার দিতে পারি তবে আমার ভিটেয় তোরা থাকবি কেন । ভাদ্র মাসে ফিরিয়ে দিস্‌ টাকা—ইচ্ছে হয় সেই সঙ্গে কিছু দিস্‌, না হয় আসল দিলেই আমি খুসী ।

যাইবার সময় গুরুচরণকে ডাকিয়া দত্ত মহাশয় কহিলেন—গুরো, হ্যাঁ জোয়ান ছেলের বাপ যে সেই ত ভাগ্যিমান—আমি আছি গুরো। তোদের ভয় কি ?

দত্ত মহাশয় সকল কথাই শুনিয়া গেলেন কিন্তু একটা কথা জানিলেন না, সেটা সেদিন রাত্রির কুসুম-প্রসঙ্গ এবং তাহার আনুসঙ্গিক দুর্ঘটনা।

*

রসিক ও তাহার সঙ্গিগণ সকলে বসু মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। বসু মহাশয় সমস্ত শুনিলেন এবং পরিশেষে মতামত প্রকাশ করিলেন—ওদের আগে এক নম্বর দায়ের না ক'রলে ত মোক-দ্দমায় সুবিধা হবে না রসিক।

রসিক বলিল—যা ভাল বোঝেন করুন। নবীনদাকে মারার ত ইচ্ছা ছিল না হঠাৎ হ'য়ে গেছে। আপনি মনিব, আমাকে রক্ষে ক'রলে তবেই রক্ষে হয়—

বসু মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—ধর্ম্ম কি আর আছে রে রসিক! মনিবকে কেউ কি আর বাপ-মার মত দেখে। সে দিন থাক্‌লে আজ কি আর দেশময় এই অজন্মা হয় ? ফসল দিবি নে, মনিব বাড়ী বিনাকাজে মাড়াবি নে কিন্তু আমার কাজ আমি ক'রবো যতদিন বেঁচে থাকি। আমার ধর্ম্ম আমি রেখে যেতে পারলে হয়! জয় দুর্গা, জয় দুর্গা—

ভগবানের উদ্দেশে একটা প্রণাম জানাইয়া বলিলেন—ভগবান যেন সেই মতি দেন, আমি যেন আমার ধর্ম্মরক্ষা ক'রে যেতে পারি ? কিন্তু তুই হঠাৎ ষষ্ঠী সর্দ্দারের জমির ধান কাটতে গেলি কেন ? সবে সবে ফিরে এসেছিস সেই ঢের। ষষ্ঠী সর্দ্দার কেজেয় গেছে শুনলে যে লোকে পালায়—সেবার একশো লোকে ঘিরে তাকে রাখতে পারে নি।

রসিক কথা বলিল না। নিবারণ কহিল—রসিকের বৌ মারা যাওয়ার

পর কুসুমকে নিয়ে কোনমতে আছে কিন্তু ওই গুরো তার কল্লেণে লেগে ঘর ক'রতে দেবে না—

—কুসুম কে?

—রসিকের শালী। বিধবে।

বসু মহাশয় সমস্তই বুঝিয়া ফেলিযাছেন এমনি ভাবে কহিলেন—ও তাই! কিন্তু কেন?

নিবারণ সেদিনের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। বসু মহাশয় শুনিয়া বলিলেন—ও ঘটিত ব্যাপার, কিন্তু ঘরের বৌ ত নয় যে ক্ষেপে যেতে হবে। যাক্, যা ক'রেছিস তার ত আর চারা নেই। চল্ তবে সহরে সব, দেখি মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে। সকলে যেয়ে কি হবে? রসিক আর নিবারণ চল—

আপাততঃ কর্ত্তব্য এইরূপই স্থির হইল।

*

রসিক যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন বেলা এক প্রহর হইবে। আষাঢ়ের প্রখর রৌদ্র ইতিমধ্যেই উঠানখানাকে তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। রসিক দাওয়ায় নিক্ষিপ্ত ঢাল ও সড়কি ঘরে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে কহিল—কুসুম, তাড়াতাড়ি দুটো রেঁধে দে, সহরে যেতে হবে।

কুসুম ব্যস্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করিল—কি হ'ল? একটা কথা বলারও ফুরসুত নেই যে!

রসিক অত্যন্ত কটু একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—তোর গুরোর কিছু হয় নি—মাঝের থেকে নবীনদাকে সড়কি দিয়ে ফুটো করে দিলাম।

—নবীনদাকে?

—হ্যাঁ। ইচ্ছা ক'রে মেরেছি নাকি! একটু সরে গেল তাই নইলে গুরো বুঝতো—

কুসুম আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কহিল—আমার জন্যে তোমরা কেন এসব কর, তার চেয়ে আমাকে খুন ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দাও, তোমরা সুখে থাকো।

কুসুম আর কিছু কহিতে পারিল না। তীব্র অভিমানে, অব্যক্ত একটা যাতনায় সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার জীবনের প্রতি একটা প্রবল ধিক্কারে সে যেন লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে।

রসিক আপনার মনে একটা অস্থিরতা বোধ করিতেছিল, সে তাই কহিল—থাক্ রে কুসুম। আর ন্যাকা কান্না কাঁদতে হবে না। উঠে রেঁধে দে।

কুসুম ভিজাকণ্ঠে কহিল—চাল ত নেই।

—চাল নেই? ও, নিবারণের কাছে থেকে দু'সের চাল কর্জ্জ করে নিয়ে আয়, নতুন ধান উঠ্‌লে দেব বলিস্।

—তুমি যাও।

রসিক মুখ ভেঙচাইয়া কহিল—তুমি যাও? কেন? তোমার পায়ে কি গোদ হ'য়েছে!

রসিকের প্রতি চোখ দুইটি মেলিয়া ধরিয়া কুসুম কহিল—যদি না দেয়?

—না দেবে কেন? দেবে, যা—

কুসুম কিছু মনে করিল না। ভাবিল, রসিক ত স্বামীর দাবী লইয়াই এ আদেশ করিতেছে, তবে তাহার আর কি? যদি ফিরাইয়া দেয় তবে সে অপমান ত তাহার নয়।

কুসুম উঠিয়া গেল। রসিক চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—কুসুমের এ যেন ভগ্নাবশেষ। শরীর শুকাইয়া রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। পিঠের উপর সেদিনকার লাঠির আঘাত কয়েকটা কালো হইয়া রহিয়াছে এখনও শরীরের সঙ্গে

মিলিয়া যায় নাই। চলিতেও যেন তাহার কষ্ট হয়, হয় ত অন্য কোথায়ও বেদনা আছে। রসিক দেখিল বটে—কিন্তু কোনরূপ অনুশোচনা বা সমবেদনা বোধ করিল না। যাহা ছিল তাহা আর নাই এমনি একটা শূন্যতায় তাহার মন সর্ব্বদা বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে।

*

ষষ্ঠী ও আর একজন দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে এবং রসিক ও নিবারণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে সহরে গিয়াছে। গ্রামখানায় সকলেই একটা বিপদের আশঙ্কায় অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। পুলিশ আসিবে, একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা হইবে, হয় ত কাহারও জেল হইবে—এখন ধান কাটিবার সময়।

গুরুচরণ দ্বিপ্রহরে একাকী বসিয়া বসিয়া তামাকু টানিতে ছিল। নবীনকে এতক্ষণে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে, বুড়া মানুষ, এই আঘাতটা সহ্য করিতে বেশ একটু কষ্ট হইবে। সে তাহাদিগকে থামাইতে না গেলে এমন আঘাতটা লাগিত না। গ্রামের সকলের উপরই তাহার স্নেহ, তাই কোনরূপ অশান্তি তাহার সহ্য হয় না।

খুট্ করিয়া একটা শব্দ হইতেই গুরুচরণ পিছন ফিরিয়া চাহিল। দিগম্বরী পিছনে দাঁড়াইয়া আছে, কি যেন একটা বলিবে। গুরুচরণ দেখে নাই এমনিভাবে বসিয়া রহিল। দিগম্বরী কহিল—তোর লেগেছে মাথায়?

গুরুচরণ কহিল—ও কিছু না।

—নবীনদাকে মারলি কেন?

—আমি মেরেছি?

—তোর জন্যেই ত।

—আমার জন্যে? মারলে ত রসিক।

—তুই ত কুসুমকে নিয়ে গোলমাল বাঁধালি। কুসুম তোর কে? দুপুররাতে গেছে—

—পুরুষমানুষ হলে বুঝতিস্—

—তুই বদমাইস্। সব পুরুষমানুষ—

—মেয়েমানুষ না হলে কি বদমাইসি হয়—তোরাও ত তাই।

দিগম্বরী তিরস্কারের সুরে কহিল—সকলেই তোর কুসুম কিনা?

—চুপ কর্।

—আমি চুপ ক'রলে ত পাড়ার লোক চুপ করে না। দিগম্বরী কথা কয়েকটা বলিয়া যেন অনেকখানি তৃপ্তি পাইয়াছে এমনি ভাবে চলিয়া গেল।

কুসুমের সহিত দেখা করিবার একটা দুর্জ্জয় বাসনা কয়েকদিন যাবত তাহার মনের মধ্যে দেখা দিয়াছে। সেই রাত্রের সেই লাঞ্ছনার পর সে কিরূপ আছে, রসিক তাহাকে আরও মারিয়াছে কিনা জানিবার জন্যে একটা তীব্র কৌতূহল তাহার ছিল কিন্তু এই দ্বিপ্রহরে সেখানে গেলে লোকে দেখিয়া কি বলিবে—রাত্রে অন্ধকারের অন্তরালে যাহা হইয়াছে তাহাতে কাহারও সংশয় থাকিলেও আজ এত কাণ্ডের পর যদি সে যায় তবে সে সংশয় নিঃসংশয়ে দূর হইয়া যাইবে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের জীবনেও হয় ত লাঞ্ছনা বাড়িবে।

আকাশে খানিকটা মেঘ দেখা যাইতেছিল, অকস্মাৎ ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। গুরুচরণ ভাবিল এই অবসর—সে মাঠে গরু আনিবার নাম করিয়া যাইতে পারে।

গুরুচরণ একখানা লাঠি লইয়া বৃষ্টি ভিজিয়া কুসুমের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কুসুম সবেমাত্র খাইয়া উঠিয়া পানের বাটা পাশে করিয়া পান চিবাইতেছিল এবং আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। গুরুচরণ উঠান হইতেই ডাক দিল—কুসুম।

কুসুম চমকাইয়া চাহিল, বলিল—কে? তুমি?

গুরুচরণ একটু দ্বিধার সহিত কহিল—হ্যাঁ আমি। একটু আশ্চর্য্য হ'লে নাকি ?

—হ্যাঁ, তুমি আবার এলে ?

—হাঁ। ভয় নেই। রসিক কি তার পরেও তোমাকে মেরেছে ?

—না।

—তোমায় কি খুব কষ্ট দিচ্ছে রসিক—চল, আমার বাড়ী থাক্‌বে।

কুসুম একটু হাসিয়া গুরুচরণের মুখের দিকে চাহিয়া একান্ত হতাশার সুরে কহিল—ভাগ্যে দুঃখ থাক্‌লে সেকি তুমি ঠেকাতে পারো বন্ধু ? আমার দুঃখ ত যাবার নয়। যে দিন শাঁখা সিঁদুর গেছে সেই দিনই ত সব গেছে বন্ধু !

গুরুচরণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। কত কি বলিবে ভাবিয়া আসিয়াছিল কিন্তু সব যেন অকস্মাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে। গুরুচরণ বলিল—কিন্তু রসিকদা জান্‌লে কেমন ক'রে ?

কুসুম সংক্ষেপে কহিল—রাঙাদি বলে দিয়েছে। একদিন চাল নিতে এসেছিল, ঘরে ছিল না তাই রেগে সে শাসিয়েছিল কিন্তু বেশ শোধ দিয়েছে, না ?

কুসুম হাসিয়া ফেলিল। গুরুচরণ কুসুমের জড়তাহীন কথা কয়েকটি ও অত্যন্ত শান্ত মুখশ্রীর দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। এত দুঃখ লাঞ্ছনার পরেও যে কুসুম এমনি ভাবে কথা কহিতে পারে তাহা যেন কেহ ভাবিতেই পারে না। কুসুম আবার কহিল—আমার জন্যে ভেবো না বন্ধু ! দিগম্বরী ভাল আছে ?

—হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কি কোন দুঃখ নাই।

কুসুম আবার হাসিয়া কহিল—দুঃখ ? না কোন দুঃখ নাই। ক্ষণিক চিন্তা করিয়া কহিল—কিন্তু একটা দুঃখ আমার বড় লাগে—

—কি ?

—আমার মত একটা লোককে নিয়ে তোমরা খুন জখম কেন কর ? এমন কত পোড়াকপালী ত কত জায়গায় রয়েছে কিন্তু এমন ত হয় না !

গুরুচরণ লাঠিখানার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে চুপ করিয়াই রহিল। একটা কিছু বলা দরকার তাই সে বলিল—এমন কিছু ত হয় নি কিন্তু মাঝের থেকে ভালমানুষ নবীনদার প্রাণটা যায় আর কি ?

কুসুম কহিল—তোমাদের এমনই বিচার যে ভালমানুষের প্রাণ যায়।

গুরুচরণ কহিল—হ্যাঁ তাই।

কুসুম একটা পান গুরুচরণের হাতে দিয়া কহিল—আমার জন্যে এমনি আর তোমরা ক'রো না। আমাকে বিদায় দাও, কত লোক আছে, তাদের বাড়ী গতর খাটিয়ে খাবো। তোমাদের ভালবাসার ত সবখানিই পেয়েছি বন্ধু—আর ত কিছুই বাকী নেই। তোমাকে ভালবেসেছিলাম কিন্তু কোন পাপ ত করি নি। আমাকে তোমরা বিদায়ই দাও।

কুসুমের কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ ভিজা হইয়া আসিল এবং সে নীরবে কয়েক ফোঁটা অশ্রুমোচন করিয়া ভিজা চোখ দুইটি মেলিয়া গুরুচরণের মুখখানি দেখিল। গুরুচরণের মনে হইল, সেই যেন অপরাধী এবং যত কিছু ভাল মন্দ ঘটিয়াছে এবং ঘটিতে যাইতেছে সবই যেন তাহারই অসঙ্গত কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। তাই সে কহিল—আমার উপরে রাগ ক'রো না কুসুম। রসিককে সেদিন রাত্রেও আমি এক লাঠির ঘায়ে চুপ করিয়ে দিতে পারতুম কিন্তু কি ক'রবো ? লোকে কি ব'লবে তাই ভেবেই হিজলতলা থেকে ফিরে গেলাম—

কুসুম আবার তাহার ভিজা চোখ দুইটি লইয়া হাসিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সম্পূর্ণ হাসিতে পারিল না। কহিল—বেশ ক'রেছিলে বন্ধু, সেদিন

রাত্রেই যে একটা কেজে হ'য়ে যায় নি সেটা ভালই হয়েছে। কিন্তু আমার জন্যে তোমরা এমনি কর কেন?

—ঘটে যায়। আমরা কি ক'রেছি?

বৃষ্টি থামিয়া আসিল। রৌদ্র ও বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে এক এক ঝলক বাতাস আসিয়া কুসুমের রুক্ষ চুলগুলি উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। আকাশে একখানা বড় রামধনু উঠিয়াছে। রৌদ্রের মাঝে চিক্ চিক্ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা নামিয়া আসিতেছে। কুসুম তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—রামধনু দূর থেকে দেখা যায় কিন্তু কাছে গেলে কি থাকে?

গুরুচরণ কহিল—আচ্ছা, যাই কুসুম।

কুসুম হাসিয়া কহিল—যাই বল্‌তে নেই বন্ধু—এসো—

রসিক বাড়ী ফিরিল সন্ধ্যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ভাল করিয়া ঘন হইয়া উঠে নাই—আইলের দুই পাশে ধানের ও পাটের গাছগুলি হাঁটু সমান হইয়া উঠিয়াছে, সেগুলি বাতাসে একটা সাঁ সাঁ শব্দ করিতেছে; তবুও শোনা যায় কে যেন তাহার বাড়ীতে কথা বলিতেছে। গুরুচরণ কি?

রসিক নিঃশব্দে বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। না, রাঙাদি কথা কহিতেছে। রসিক ডাকিল—কুসুম। রাঙাদি অভ্যর্থনা করিলেন—আয় রে রসিক, কি হ'ল?

—হয় নি বিশেষ কিছু, দুটো ফৌজদারী হ'ল। এখন সাক্ষী সাবুদে যা হয়।

—আহা, সেখানে কিছু খেয়েছিলি?

—সেখানে আর কি খাবো?

রাঙাদি কুসুমের উদ্দেশে কহিল—তাই ত ব'লছিলুম কুসুম, সকাল

সকাল দুটো রেঁধে রাখ, পরিশ্রম ক'রে আস্‌ছে এসেই যাতে দু'টো ভাত পায়।

—কেন রাঁধে নি।

—রাঁধতে যাবে যাবে ক'চ্ছে; আমি বলি শুধু গালে হাত দিয়ে ভাবলে কি হবে? গুরো যে আজ দুপুরেও বিষ্টি ভিজে এসে গেল, তাকে না ছাড়লে দু'কুল যাবে। বেশ আছো, রসিকের ঘর আলো ক'রে থাকো কিন্তু পরের যুক্তিতে নষ্ট হ'লে ইহকাল পরকাল দুইই যাবে।

রসিক নিঃশব্দে দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল।

রাঙাদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—কুসুম ওঠ্, যা একটু হাত পা ধোবার জল এনে দে, তামাক সেজে দে। তাড়াতাড়ি ছ্যাত-ক্যাত ক'রে রেঁধে দে—অন্ধকার হ'ল, যাই রে কুসুম। বুড়োমানুষ এর পরে আর পথ দেখতে পাবো না।

রাঙাদি যে সংবাদটি রসিকের কানে দিবার জন্যে বসিয়াছিলেন তাহা নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

রসিক দাওয়ায় বসিয়া অত্যন্ত শ্রান্তদেহে কি যেন এলোমেলো ভাবিতেছিল। আজও দুপুরে তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া গুরুচরণ আসিয়াছে। কুসুমের ইচ্ছা না থাকিলেও সে কেন আসিবে—কুসুম কি এমনি ভাবে তাহাকে প্রতারিত করিতেছে, কালসর্পের মত অন্তরালে দংশন করিবার জন্যে ফিরিতেছে। পরিশ্রান্ত রসিকের রক্ত তীব্রবেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, সে একটা সঙ্কল্প করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম ঘরের মধ্যে প্রদীপের সাম্‌নে বসিয়া অজ্ঞাত আশঙ্কায় ব্যাকুল হৃদয়ে একটা নিষ্ঠুর অত্যাচারের জন্যে প্রস্তুত হইতেছিল। সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে রসিক ঘরের মধ্যে আসিতেছে।

রসিক বিনা ভূমিকায় কুসুমের একগোছা চুল হাতের মুঠির মধ্যে সবলে চাপিয়া ধরিয়া গম্ভীর উদাত্ত স্বরে প্রশ্ন করিল—গুরো আজ দুপুরে এসেছিল ?

কুসুম অত্যন্ত বেদনায় চুলগুলি তলা হইতে ধরিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—হ্যাঁ, এসেছিল।

—কেন এসেছিল ?

—জানি না।

রসিক দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া কুসুমের পিঠের একটা মাংসল স্থান দুই আঙুলের ফাঁকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া মোড়াইতে মোড়াইতে কহিল—জানিস্ কি না বল্ ?

কুসুমের চোখ দুইটি বাহিয়া জল গড়াইয়া আসিল কিন্তু একবার 'উঃ' বাদে সে কোন কাতরোক্তি করিল না। বেদনার্ত্ত কণ্ঠে কেবল কহিল—সে নিজেই এসেছিল ?

—তুই ডেকেছিলি ?

—না।

আঙুলের মাঝে নিষ্পিষ্ট মাংসটুকুর উপর চাপ বাড়াইয়া দিয়া রসিক কহিল—কি ব'ল্লে বল্ ?

কুসুম হাত দুইটি দিয়া রসিকের হাত ধরিয়া কহিল—উঃ, আর ত পারি না।

—বল্ শালী, বল্—

—তুমি মারো কিনা তাই শুধোলে।

আর একটু মোড়া দিয়া রসিক কহিল—আর ?

—মারো শুনে তার বাড়ীতে যেতে ব'ললে। উঃ—উঃ।

রসিক অশ্লীল ভাষায় আর একটি প্রশ্ন করিল কিন্তু কুসুম তাহার

কোন জবাব না দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আরো মারবে? এখনও হয় নি—

—না, এখনই তোর কি হয়েছে।

কুসুম চুলের আকর্ষণে মাটিতে পড়িয়া গেল। ক্রুদ্ধ রসিক মাঁচার নীচে থেকে তীক্ষ্ণধার একখানা দা আনিয়া কহিল—তোর পীরিতের ঝাল তুলি দাঁড়া—

দা খানা উদ্যত করিয়া তাহার অশ্লীল প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিল—বল্, নইলে তোকে কাট্‌বো—

কুসুম উৎসারিত অশ্রু চোখে কহিল—না।

—তবে কেন আসে?

—সকলেই ত এক জন্যে আসে না। তোমরা ভুল বুঝে আর কত লাঞ্ছনা ক'রবে?

রসিক কুসুমের হাতখানা মোচড়াইয়া ধরিয়া কহিল—তবে তার ওখানে গেলি নে কেন?

কুসুম কাতরকণ্ঠে কহিল—তুমি না তাড়িয়ে দিলে ত যাবো না।

রসিক হঠাৎ থামিয়া গেল। কুসুমের এই কথা কয়েকটির মধ্যে যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা মন্ত্রের মত রসিককে শান্ত করিয়া দিল। সে দা খানা ফেলিয়া দিয়া কহিল—শালী, তোমার রাঁধার সময় হয় না আর গুরোর সঙ্গে বসে গল্প করার সময় হয়? যা শালী—

রসিক কুসুমকে একটা ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল।

কুসুম উঠিয়া গিয়া ডাল ও চাল একত্র তুলিয়া দিল। রসিকের এত অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ করিল না, সে মনে মনে কেবল ভাবিতেছিল—এই অত্যাচার ও লাঞ্ছনার কোথায় শেষ হইবে, কবে? নিত্য যদি এমনি করিয়া চলে তবে কতদিন সে সহ্য করিতে পারিবে।

বাতাসে ল্যাম্পোর আলোক শিখাটা মাঝে মাঝে নিবু নিবু হইয়া আসিতেছে, উনুনের ভিতরের তপ্ত অঙ্গার হইতে বিচ্ছুরিত আলোক তাহার সর্ব্বদেহে পড়িয়াছে। কুসুম কাপড় সরাইয়া দেখিল আহত স্থানটি কালো হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে—ভিতরে সম্ভবতঃ রক্ত জমিয়া গিয়াছে। সে স্থানটায় এখনও সে যাতনা অনুভব করিতেছে। চুলের গোড়া গুলিতে হাত দিবার উপায় নাই। বেদনা তবুও অসহনীয় নয়।

কুসুম আর একবার কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে অভিযোগ করিল—রসিক সমস্ত জানিয়া শুনিয়া, খোঁজ লইয়া তাহাকে মারিল না কেন? কেবল মাত্র রাঙাদির একটি কথা ও তাহার আকস্মিক একটু ভ্রম কি তাহার সমস্ত সেবা যত্ন ও ভালবাসাকে নষ্ট করিয়া দিল! রাঙাদির একসের চাউলের ক্ষতি কি আজও, এত লাঞ্ছনারও শেষ হয় নাই। আর কতবারে তাহা শেষ হইবে? কুসুম ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—হায়, আজ রক্ষা করিবার মত কেহই কি তাহার নাই।

সাম্‌নে তপ্ত উনানে খড়িটা আগাইয়া দিয়া সে চোখের জল মুছিল।

সেদিন মোষমাথার জমির সমস্ত ধান কাটিয়া বাড়ীতে আনিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। উঠানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আঁটিগুলি পড়িয়া আছে কিন্তু সেগুলিকে একত্রে সাজাইয়া রাখিবার শক্তি তাহার আর নাই।

ষষ্ঠীর একটু জ্বরমত হইয়াছিল, সে বারান্দা হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—ওগুলো থাক্ রে গুরো, এখন একটু জিরিয়ে নেয়ে খেয়ে নে।

গুরুচরণ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, বারান্দায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে কহিল—রাত্রে যদি বৃষ্টি হয় তবে উঠোনটি ত মলোনের মত থাক্‌বে না, আর ধান পালা না দিলে গুমিয়ে যাবে।

ষষ্ঠী-আকাশটা ভাল করিয়া দেখিয়া কহিল—বৃষ্টি না'ও হ'তে পারে।

গুরুচরণ নদীর নূতন জলে স্নান করিয়া আসিয়া খাইয়া লইল এবং এই গুরুতর পরিশ্রমের পরে বারান্দার আল্‌সেটার উপর একটু কাত হইতেই আষাঢ়ের মশাকে উপেক্ষা করিয়া করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে গুরুচরণ অকস্মাৎ জাগিয়া গেল। চারিদিকে একটা নিবিড় অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা যেন খাঁ খাঁ করিতেছে—একটা ভাঁপসা গরমে মনে হইতেছিল যেন বাতাস হালকা হইয়া আসিয়াছে দম লইতে অনেক বাতাস লাগে। অদূরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকী পোকা আকাশের তারার মত মিশিয়া রহিয়াছে। বহু বিস্তৃত শান্ত এই অন্ধকারের মাঝে আর কিছুই দেখা যায় না—বহুদূর দিগন্তে ঘন কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে চমকাইতেছে। গুরুচরণ আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিল—এ যেন ব্যাংডুবির বিলের অ-তৈ কালো জল, মাঝে মাঝে ঢেউ উঠিতেছে। সে আলসের উপরেই শুইয়াছিল। উঠিয়া আসিয়া আকাশের দিকে চাহিল—সেখানে একটা প্রবল ঝড় ও বারিপাতের পূর্ব্ব স্থচনা ক্রুদ্ধ চোখের মত ধরিত্রীরে শাসাইতেছে। এই স্তব্ধতা ও শান্ত-প্রকৃতি তাহারই পূর্ব্বাভাষ। ধানগুলি পালা দিয়া না রাখিলে গুমাইয়া যাইতে পারে। অকস্মাৎ গুম্ গুম্ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল।

সে একে একে ধানগুলি সাজাইতেছিল—ক্রমে তাহা তাহার মাথা সমান হইল, একটা মই না পাইলে বাকি ধানগুলি উপরে উঠান সম্ভব নয়। সে গোয়াল হইতে মই লইয়া আসিয়া দেখে কে যেন একটি নারী উঠানে দাঁড়াইয়া আছে।

গুরুচরণ ভীতকণ্ঠে কহিল—কে?

—আমি।

"আমি কে?" তাহা কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল না কিন্তু চল্‌তি মেঘের বুকে একটু বিদ্যুৎ চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল তাহাতে গুরুচরণ চিনিল—দিগম্বরী! গুরুচরণ কহিল—তুই বেরিয়ে এলি যে?

—কুসুমের কাছে গেলি কিনা তাই দেখ্‌তে এসেছি।

—আমি যদি যাই তবে তুই তা ধ'রতে পারিস্!

—পারি বৈ কি? বাইরে ভঙ্গি ক'রে শুস্ ত উঠে যাবার জন্যে।

গুরুচরণ হাসিয়া পালার মাথার সঙ্গে মইটা লাগাইয়া দুই আঁটি ধান লইয়া উঠিয়া গেল। আবার নামিয়া আসিয়া দুই আঁটি লইয়া গেল।

আকাশের বুক চিরিয়া ফাড়িয়া কড় কড় শব্দে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস গাছের মাথা দোলাইয়া নিস্তব্ধ বনানীর স্থির পত্রকে কাঁপাইয়া ছুটিয়া আসিল। আকাশের বুকে পুঞ্জীভূত কালো মেঘ হাল্‌কা হইয়া ছিঁড়িয়া উঠিয়া সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় গাছের ডালপালা বেদনায় যেন আপনাকে আছড়াইতেছে। এখনি বৃষ্টি বন্যার জলের মত ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তাহার পূর্ব্বে ধান কয়েক আঁটি গোছাইতে হইবেই।

গুরুচরণ আর দুই আঁটি আনিয়া রাখিতেই দেখে দিগম্বরী বহুশ্রমে এক আঁটি ধান আনিয়া তাহাকে আগাইয়া দিতেছে। গুরুচরণ পাঁজার উপরে বসিয়া ধান আঁটি লইয়া কহিল—তুই আনলি যে!

—আমি এনে দি, তুই গোছা। আমি না আন্‌লে পারবি একা?

গুরুচরণ ধানের আঁটি পুনরায় আনিবার ফাঁকে বসিয়া বসিয়া ভাবিল—দিগম্বরী ত তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছে। আজ তাহাকে সাহায্য করিবার জন্যে নিশীথ রাত্রে বাহির হইয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—তাহার স্ত্রী তাহার বড় আপনার, [illegible] নিকট; আর

কুসুম যেন দূরাগত যূঁই ফুলের সুগন্ধ, কাছে গেলে ঠিক স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না, আর দিগম্বরী যেন নিত্যকার গৃহরক্ষিত গোলাপ নির্য্যাস। চোখকে ধাঁধাইয়া দেয় না আপনার রঙে, তাহাকে শীতল ও সুগন্ধী করিয়া দেয়।

আর একবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল। দিগম্বরী মাজায় কাপড় জড়াইয়া দুই আঁটি ধান অতিশ্রমে বহন করিয়া আনিতেছে—তাহার মুখখানা বিদ্যুতালোকে অতি সুন্দর দেখা যাইতেছে, কেবলমাত্র আঁটিয়া পরা শাড়ীর একপ্রান্ত বুকের উপরের বন্ধুরতা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছে—এবং তাহারও একটা দিক ঠিক সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই। গুরুচরণের মনে হইল এই দেহ-সম্পদ তাহার—একান্তই তাহার। গুরুচরণ প্রলুব্ধ প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া দেখিল।

দিগম্বরী ধান দুই আঁটি মইয়ের উপর হইতে পাঁজার মাথায় রাখিতেই গুরুচরণ দিগম্বরীর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—এই শোন্, উঠে আয়?

—কেন?

দিগম্বরী গুরুচরণের আকর্ষণে পাঁজার মাথার উপরে উঠিয়া আসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না। গুরুচরণ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাহাকে আপনার কোলের উপর বসাইয়া বিশাল বুকের মাঝে প্রবলভাবে চাপিয়া ধরিল। একটা ভীতত্রস্ত কম্পমান, অতি সুকোমল বুক তাহার বুকের মাঝে নিষ্পিষ্ট হইয়া সর্ব্বদেহে বিদ্যুৎবহ্নি প্রসারিত করিয়া দিল। দিগম্বরীর স্বল্পদেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না কিন্তু কণ্ঠ অনুযোগের সুরে জানাইল—ঠেসে মেরে ফেলবি নাকি?

—হ্যাঁ, তোকে বুকের মাঝে পুরে রাখবো।

আবার বিদ্যুৎ চমকাইল, তাহার মাঝে গুরুচরণ দেখিল, দুইটি

ভীতবিস্মিত আঁখি অপলক-দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। গুরুচরণ মুখখানা নামাইয়া দিগম্বরীর মুখে একটি চুম্বন দিয়া কহিল—তুই কি আমার জন্যে বেরিয়েছিস্!

—ধ্যেৎ, তুই আমার কে? দূর, মুখে ছ্যাপ্ দিলি? মুছে দে—

গুরুচরণ সাদরে মুখখানা মুছাইয়া দিল। দিগম্বরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল—বিষ্টি এল যে, দাঁড়া, ধান আনি। গুরুচরণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল, সে আবার ধান আনিতে লাগিল।

ধানের আঁটিগুলি পালায় গোছান শেষ হইতে না হইতেই টুপ্ টাপ্ করিয়া দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। শেষ আঁটি ধান আনিলে গুরুচরণ আবার দিগম্বরীকে ধরিয়া ফেলিল কিন্তু এবার সে প্রতিবাদ করিয়া কহিল—বিষ্টি আস্‌ছে দেখিস্ না?

—আসুক্। গুরুচরণ টানিয়া তাহাকে আবার বুকের অতি সন্নিকটে আনিয়া কি যেন একটা কহিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই দিগম্বরী কহিল—তুই কুসুমের কাছে যাস্ কেন?

—কেন? গুরুচরণ হাসিল—এ 'কেন'র উত্তর নাই, যাহা আছে তাহা অনুভব করা যায় বটে কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলা যায় না। তাই গুরুচরণ অভিযোগ করিল—তুই যে ঝগড়া করিস্?

—আমি? কই না।

—আর ত ঝগড়া করবি নে?

বৃষ্টির বেগ ও ফোঁটাগুলির মাঝে মাঝে সময়ের ব্যবধান ক্রমেই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। গুরুচরণ তবুও দিগম্বরীকে ছাড়ে না। দিগম্বরী যেন একটা সান্ত্বনার সুরে কহিল—আমি কি চিরদিনই ছোট থাক্‌বো? বড় হব না—

—হবি ত, তখন কি হবে?

দিগম্বরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—যদি সড়কিটা তোর লাগতো ?

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিয়া কহিল—রসিকের মত সাতটায়ও আমার গায়ে সড়কি মারতে পারে না রে! বাবার শিক্ষে, জানিস্ ?

ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। গুরুচরণ দিগম্বরীকে দুই বাহুর মাঝে ধরিয়া একলাফে নামিয়া আসিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। দিগম্বরী সংক্ষেপে তিরস্কার করিল—তুই ত ডাকাত রে। তার পরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, বিদ্যুতালোকে কুসুমের মত একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ছুটিয়া পলাইল। গুরুচরণ ভিজা উঠানে দাঁড়াইয়া আর একবার আত্মপ্রসাদের সঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

ঝড় ও তাহার সহিত প্রবলবেগে বারিবর্ষণ হইতেছিল ষষ্ঠীচরণ গুরুচরণের কণ্ঠস্বরে ও বৃষ্টির শব্দে উঠিয়া একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালাইয়া কাঁচের লণ্ঠনটির মাঝে রাখিল। ঘুমের ঘোরে যেন সে কিছু দেখিতে পাইতেছে না এমনি ভাবে প্রশ্ন করিল—গরুগুলো দেখে এসেছিস ত ?

গুরুচরণ কহিল—হ্যাঁ, ঘরেই আছে।

—ধান ?

— পালা দিয়েছি।

ষষ্ঠী একটু তারিফ করিয়া কহিল—যাক্ সংসার গেরস্থালী একটু বুঝতে শিখেছিস্ এই যথেষ্ট। বারান্দায় বৃষ্টির ছাট আসে তাই সকলে ঘরের মাঝে সমবেত হইল। ষষ্ঠী চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিল তাহার পরে প্রশ্ন করিল—বৌমা, তুমি ভিজলে কি ক'রে ?

দিগম্বরী কথা কহিল না কিন্তু ব'কলমে ষষ্ঠীর স্ত্রী কহিল—ধান তুলেছে তাই।

ষষ্ঠী তাহার স্বভাবসুলভ হাসির সঙ্গে কহিল—ও, তা না হ'লে গুরো একা পারবে কি ক'রে? সে ত বটেই—বটেই। গুরুচরণ মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল,কোন প্রত্যুত্তর করিল না। তাহার মনে হইল দিগম্বরীর সহিত তাহার আজকার এই নৈকট্য যেন তাহার পিতা দেখিয়া ফেলিয়াছে।

মুষলধারে খানিক বৃষ্টি হইয়া একটু যেন দম নিল। গুরুচরণ সোৎসাহে কহিল—বাবা, লণ্ঠনটা দাও। বোসেদের কাণা পুকুরে নিশ্চয়ই 'উদোসে' মাছ উঠেছে। একটু ঘুরে আসি—মা কাঁচিখানা (কাস্তে) আর খালুইটা দাও না।

ষষ্ঠী বলিল—থাক্ গে, রাত্রে বরং ঘুমো একটু।

—না বাবা, নিশ্চয়ই কই মাগুর কিছু পাবো, যাই।

বিশেষ প্রতিবাদ কেহ করিল না। গুরুচরণ কাস্তে ও খালুই লইয়া মালকোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া মাথাল মাথায় বাঁধিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। ষষ্ঠী কহিল—লাঠি নিয়ে যা।

—ও দিয়ে কি হবে?

—সর্দ্দারের ছেলের লাঠি বিনে চ'ল্‌তে নেই, সাপখোপ কত কি থাক্‌তে পারে।

গুরুচরণ লাঠিখানা বগলে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পথ বৃষ্টিতে কর্দ্দমাক্ত ও পিছল হইয়া গিয়াছে। মাথার উপরে ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—স্বল্প অবয়ব মাথালে দেহের অর্দ্ধেকের বেশী রক্ষা করিতে পারে নাই। গুরুচরণ লণ্ঠনের স্বল্প আলোকে পথ চলিতেছিল। পুকুর পাড়ের বাঁশ ও বেতবন পার হইয়া পায়ে চলা পথ

গিয়াছে পুকুরের পূব কোণের 'চোখে'। গুরুচরণ 'চোখে'র নিকটবর্ত্তী হইয়া সতর্ক দৃষ্টিতে পথটা দেখিতেছিল—পথের পাশে কর্দ্দমাক্ত ঘাসের মাঝে কি যেন একটা জিনিষ নড়িতেছে—গুরুচরণ হাত দিয়া দেখে একটা বড় কই মাছ। তাহারই নিকটে আর একটা—আর একটা। সে আনন্দে মাছ কুড়াইতে লাগিল।

চিন্ চিন্ করিয়া অতি সংকীর্ণ একটি জলধারা পুকুরের মাঝে নামিয়া যাইতেছে, তাহার মাঝে কই, মাগুর, সিঙ্গি, বাইম থল থল করিয়া উজাইয়া যাইতেছে। আশে পাশে খুঁজিয়া সে প্রায় এক কুড়ি কই মাছ পাইয়াছে। জলরেখার ধারে কাস্তে হাতে করিয়া আলোটা ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল—কাস্তে দিয়া একটা আঘাত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া একটা মাছ তুলিল—মাঝারি একটা বান। তারপরে আর একটা—একটা মাথামোটা বড় মাগুর। তারপরে—গুরুচরণ মুঠ করিয়া একটা মাছ তুলিয়া থালুইতে রাখিতে যাইতে একটু সন্দেহ করিয়া ভাল করিয়া দেখিল—সেটা ধোড়া সাপ। গুরুচরণ অনুচ্চ কণ্ঠে 'দূর শালা' বলিয়া সেটাকে জঙ্গলের মাঝে ফেলিয়া দিল।

গুরুচরণ উপর হইতে জলরেখা অনুসরণ করিয়া পুকুরের জলের কিনারে আসিতেছিল—দেখে কে যেন একখানা "চারো" পাতিয়া রাখিয়াছে। আর একটু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে, এই নিবিড় অন্ধকারে মাথাল মাথায় দিয়া কে যেন বসিয়া আছে। গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিল—কে?

লোকটি অন্ধকার হইতে জবাব দিল—আমি, রসিক।

গুরুচরণের গায়ের মাঝে হঠাৎ যেন ঝাঁকি দিয়া উঠিল। বগলে লাঠিখানা আছে অনুভব করিয়া সে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিল। রসিক অন্ধকারের মাঝে তাহার দীর্ঘ দেহটা লইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—কে?

গুরুচরণ কহিল—আমি, গুরুচরণ।

—গুরো! রসিক বিস্মিত লইয়া লণ্ঠনের মৃদু আলোকে তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিতে চাহিল। গুরুচরণ লক্ষ্য করিল রসিকের হাতে একখানা পুরাতন কাস্তে ছাড়া আর কিছু নাই। গুরুচরণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল—কি রসিকদা, চম্‌কে উঠলে যে!

—চমকাই নি।

ঠিক পরিহাস কিনা বোঝা গেল না, গুরুচরণ একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কি পেলে?

—গোটা কয়েক মাগুর।

রাত্রের এই নিবিড় অন্ধকারের মাঝে সেদিনের সেই মারামারি, হিংসা, দ্বেষ সহসা যেন উবিয়া গিয়াছে; রসিকও যেন আর গুরুচরণকে সন্দেহ করিতেছে না, তাহার হাতের পাকানো বাঁশের লাঠিটা দেখিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। রসিক প্রশ্ন করিল—তুই কি পেলি?

গুরুচরণ একটু থামিয়া কহিল—কই মাছ, এক কুড়ি হবে। একটা কথা বলি রসিকদা—পরের কথায় নেচে অনেক কুকাণ্ডই ত করেছ কিন্তু বেচারী কুসুমকে খালি খালি আর মেরো না।

—আমি ত পরের কথায় নাচি, তুই কার কথায় রাত দুপুরে কুসুমের সঙ্গে হিজলতলায় ছিলি?

—যেদিন দিন আস্‌বে সেদিন বুঝবে, আজ বললে ত বিশ্বাস ক'রবে না।

রসিক কোন কথা কহিল না। 'চারো'খানা টান দিয়া তুলিয়া দেখিল তাহার মাঝে বেশ মাছ হইয়াছে। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করিতেছিল সম্ভবতঃ রসিক তাই চলিয়া যাইবে। গুরুচরণ বলিল—তুমি চ'ল্‌লে?

—হুঁ।

বোসেদের বাড়ীর ভিতর হইতে কে যেন হাঁকিল—কে রে মাছ ধরে! এর মধ্যে এসেছে সব—তোমাদের জন্যে কি গেরস্থে দু'টো মাছ পাবে না।

গুরুচরণ কহিল—চল, চল রসিকদা, বোসমশায় দেখ্‌লে আবার মাছের ভাগ দিতে হবে! রসিক ও গুরুচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাঁশ ও বেতবনের সরু পথ ধরিল—গুরুচরণ ইচ্ছা করিয়াই আগে গেল না কিন্তু রসিক স্বেচ্ছায়ই গুরুচরণের লাঠিকে অগ্রাহ্য করিয়া আগে আগে চলিল। গুরুচরণ প্রশ্ন করিল—তোমার হাতে ত কিছু নেই আমি যদি পিছন থেকে লাঠির এক বসান্‌ দি।

রসিক পিছন না ফিরিয়াই কহিল—তুই কি পারিস? যারা সর্দ্দার তারা কি চোরা-মার দেয়?

গুরুচরণ কহিল—আমি এই পথে চল্লাম। সে পাশের সরু পথ দিয়া চলিয়া আসিল।

গুরুচরণ চলিতে চলিতে বেশ অনুভব করিল এই কয়েকটা কথা বলিয়া ফেলিয়া সে যেন অনেকটা হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। একটা অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতার গুরুভার অনুশোচনা তাহার বুকের উপরে পাথরের মত বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেটা যেন পড়িয়া গিয়াছে—তবুও গুরুচরণ ফিরিয়া দেখিল, রসিক তাহার পিছনে পিছনে আসিতেছে কিনা?

কয়েকদিন পরে রসিক ধান কাটিয়া আনিয়াছিল কিন্তু তখনও তাহা মাড়াই করা হয় নাই। কুসুম সকালে উঠিয়া পাড়ায় কাজ করিতে গিয়াছে। সকাল হইতে টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল—ধান বেশী নয় আঁটি পঞ্চাশ হইবে, সেগুলি ভিজা উঠানের একধারে পড়িয়া ভিজিতেছিল। রসিক বসিয়া বসিয়া একটা পুরাতন 'দোয়াড়' সারিতেছিল—মরা নদীটা বর্ষার জলে প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে! দু'চারখানা দোয়াড় পাতিতে পারিলে বড় বড় চিংড়ি ও আইড়মাছ পাওয়া যাইবে।

কুসুম কোচড়ে কিছু নতুন ধানের চিড়া লইয়া আসিল। রসিক কহিল—কোছে কিরে কুসুম?

—চিড়ে। মিত্তির বাড়ীতে চিড়ে পারালাম তাই।

রসিক কহিল—ভালই হ'ল। এখন চিড়ে খেয়ে তুই দু' আঁটি ধান পাড়িয়ে চাল কর ত, আমি এগুলো ঠিক করি, রাত্রে চালে ডালে করবি আর—

কুসুম কোন কথা কহিল না। কুলো আনিয়া চিড়াগুলি ঝাড়িয়া কিছু নুন ও কয়েকটি লঙ্কা আনিয়া দিয়া কহিল—খেয়ে নাও। ধান সিদ্ধ করতে হবে ত? আর রোদ না হ'লে চাল ভান্‌ব কেমন ক'রে?

—না হয় চিড়ে ক'রবি। চিড়ে খেয়েই থাক্‌বো—ওই গাছের থেকে একটা শশা এনে দে না!

কুসুম শসা আনিয়া দিল। বহুদিন পরে রসিক যেন পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে এমনি আগ্রহে সে চিড়া চিবাইতেছিল। শসার একফালিতে কামড় দিয়া সে কহিল—খুব মিঠে ত শশাটা। সে আর একফালি কুসুমের জন্য রাখিয়া দিয়া কহিল—খেয়ে দেখিস্ কুসুম, খুব মিঠে শশা।

কুসুম উজ্জ্বল চোখ দুইটি মেলিয়া ধরিয়া কহিল—আমার লাগবে না। তুমিই খাও।

রসিক কহিল—না রে না, একটু খেয়ে দ্যাখ্‌ই!

রসিক নিবিষ্ট মনে চিড়া চিবাইয়া যাইতেছিল, কুসুম দুই আঁটি ধান আনিয়া পা দিয়া মাড়াইয়া ধান বাহির করিতেছিল এমনি সময় রসিক খড়ের পালাটার পাশ দিয়া দৃষ্টি করিতে করিতে কহিল—কে আসে রে?

কুসুম একটু তাকাইয়া কহিল—কই কে?

যিনি আসিতেছিলেন তিনি পালাটার অন্তরাল হইতে অকস্মাৎ

একেবারে উঠানের মাঝখানে আবির্ভূত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—রসিক অ—রসিক।

কুসুম তাড়াতাড়ি একটু ঘোমটা দিয়া ঘরের মাঝে চলিয়া গেল। রসিক সাদরে কহিল—আসুন মনিববাবু—আসুন বসুন!

সে তাড়াতাড়ি একখানা পীড়ি মুছিয়া বারান্দায় বোসমশায়কে বসিতে দিয়া কহিল—তামাক্ সাজি? ওরে কুসুম, একটু কলার পাতা এনে দে—

কুসুম তাড়াতাড়ি একটু কলার পাতা আনিয়া সাম্‌নে রাখিল। বোস্‌মশায় আড়চোখে কুসুমকে একটু দেখিয়া লইয়া কহিলেন—এ তোমার কুসুম, না?

রসিক কোন কথা কহিল না কিন্তু একটু স্মিত হাসিতে জানাইয়া দিল যে এই সেই কুসুম। বোসমশায় কলার পাতার ঠোঙ্গায় কলিকাটা পুরিয়া টানিতে টানিতে কহিলেন—রসিক, এদিকে ত সর্ব্বনাশ বেশ পাকাপাকি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

রসিক শঙ্কিত ভাবে কহিল—কেন? কি হয়েছে মনিববাবু?

—তোমার জেল যেন আর ঠেকায় না।

—জেল? মনিবাবু, এই ধানের বতরের সময় যদি জেলে যাই তবে তার চেয়ে ত মরে যাওয়াই ভাল। আমাকে বাঁচান—না বাঁচালে একেবারে মরবো।

বোসমশায় একটু হাসিয়া কহিলেন—বাঁচানোটা যদি আমার হাতের মধ্যে থাকতো তবে ত কোন ফ্যাসাদই হ'ত না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের উপর এনকোয়ারি এসেছে, জানো ত সে বেটা ঘুসখোর আর কেই বা না! ষষ্ঠী তাকে বেশ কিছু দিয়ে এমন রিপোর্ট দেওয়াচ্ছে যাতে তোমার সাজা হবেই।

রসিক ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কহিল—এখন উপায় ?

—হেঁ হেঁ উপায় কি নেই রসিক—আছে। তবে তা'কি তুমি পারবে ?

—পারবো, বলুন—

—প্রেসিডেণ্টকে যদি বেশী দিতে পারো তবে হয়, নইলে—

রসিক চিন্তা করিয়া কহিল—কোথা থেকে দেবো ? আমি যে আজ দু'দিন বাদে এই কটা চিড়ে খাচ্ছি। আপনি বাপ মা, আপনি না রক্ষে ক'রলে কে ক'রবে! রসিক প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

—অসময়ে আমরা ত বাপ মা, কিন্তু মারামারি করার আগে কি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে ? তখন ত গ্রাহ্যও করিস নি। আর আমার কাছে মজুত টাকা আছে তাই দিয়ে এখন তোমাকে রক্ষে ক'রবো ?

রসিক বোস মহাশয়ের পা দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—পায়ে পড়ি বোসমশায়, আমাকে বাঁচান। কত দরকার ?

—অন্ততঃ দশটাকা এখন, তার পরে কি হবে জানা যাবে।

—দ—শ—টাকা!

—হ্যাঁ। একটু চিন্তা করিয়া বোস মহাশয় কহিলেন—হ্যাঁ, একটা উপায় আছে। আমার ত আউস নেই, তা তোর ধান কিছু দিলে আপাততঃ আমি দিয়ে আট্‌কাতে পারতাম—

রসিক বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—এ ক'টি ধানই যে আমার সম্বল। আমি কি খাবো!

—হ্যাঁ, জেলে গেলে আর খাওয়ার দরকার হবে না।

—না না, আচ্ছা তাই দিয়ে আস্‌বো, আপনি যেমন ক'রে হোক্ বাঁচান।

বোস মহাশয় ধানগুলির দিকে তাকাইয়া কহিলেন—কিন্তু এ আর

ক' কাঠা হবে? দশটাকার ধান কি হবে? যাক যা হয় পরে পাট বিক্রি ক'রে দিবি।

রসিক সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ধানগুলির দিকে চাহিয়া রহিল—কত শ্রমে কত আকাঙ্ক্ষায় প্রাপ্ত এই ধান ক'টি। দিনের পর দিন উহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে আর রসিকের বুক আশায়, পরিতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাই গমনোন্মুখ প্রিয়জনের বিদায় পথের পানে যেমন করিয়া মানুষ তাকাইয়া থাকে রসিকও তেমনি করিয়া ধানগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

বসু মহাশয় একটু হাসিয়া ধানটাব পরিমাণ অনুমান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

গুরুচরণ 'দোয়াড়' 'বানা' ও অন্যান্য মাছ ধরিবার সরঞ্জাম লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নদীতে যাইতেছিল, হঠাৎ দত্তমশায় ডাক দিয়া কহিলেন—ওরে গুরো, তোর বাবা বাড়ীতে আছে?

—হ্যাঁ, কেন মনিববাবু?

—শোন্ শোন্, ওরে ষষ্ঠী।

ষষ্ঠীচরণ তাড়াতাড়ি একখানা চৌকী আনিয়া যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—বসুন, কি খবর?

দত্ত মহাশয় তাহার কেশবিরল মাথাটির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—বোস্ ত রসিকের হ'য়ে বেশ তদ্বির আরম্ভ ক'রেছে। প্রেসিডেণ্টের কাছে তদন্তের ভার এসেছে—তিনি যা রিপোর্ট কচ্ছেন তার মর্ম্ম হ'চ্ছে এই যে গুরোই নবীনকে সড়কি মেরেছে।

গুরুচরণ বিস্মিত হইয়া কহিল—বলেন কি দত্তমশায়?

—বলি অমনি, টাকায় কি না হয় বল? রাত দিন হয় এ ত ভারি ব্যাপার।

ষষ্ঠী কহিল—এখন উপায়?

—উপায় বেশী টাকা দেওয়া। প্রেসিডেণ্ট নেহাত আমার বন্ধু লোক তাই বল্‌লে, নইলে হয় ত কাজ শেষই ক'রে ফেল্‌তো কিন্তু তারই বা দোষ কি দেব, কিছু না পেলে তারই বা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো পোষাবে কেন?

—কত চাই?

—অন্ততঃ টাকা কুড়ি।

ষষ্ঠী কলিকাটা দুই হাতের মধ্যে রাখিয়া কয়েকটা টান দিয়া কহিল—আপনি যা ভাল হয় করুন। ভাদ্রমাসে পাট হ'লে সবই একসঙ্গে দেব।

দত্ত মহাশয় কহিলেন—আচ্ছা দেখি, কতদূর কি হয়? যেমন ক'রে হোক্ তদ্বির ত ক'রতে হবে!

গুরুচরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল—সে তাহার সরঞ্জাম লইয়া নদীর পথে রওনা দিল।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সেদিন দত্ত মহাশয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া কহিলেন—দত্তমশায়, দেশসেবা করাটা বড় কঠিন কর্ম্ম। ফুটবল খেলায় রেফারি যেমন কিছুতেই প্রশংসা পায় না, তেমনি দেশসেবাও তাই। আপনারা দশজনে যেমন আমাকে প্রেসিডেণ্ট করেছেন আমার ত তেমনি কর্ত্তব্য ক'রে যাওয়া চাই। একজন ব'লবে ও বদলোক, আর একজন ব'লবে ভাললোক।

দত্ত মহাশয় হুঁকাটার টানের ফাঁকে কহিলেন—হ্যাঁ, তা ত বটেই। কিন্তু আমাদের এই মামলাটার কি ক'রছেন?

বোস মহাশয়কে পূর্ব্বেই ডাকিয়া আনা হইয়াছিল, তিনি সাগ্রহে কহিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ত বটেই তবে আমাদের এই মামলাটার কি ক'রছেন? কারণ আমার আর দত্ত মহাশয়ের প্রজাদের মধ্যে একটা বিরোধ চলুক—এটা ত বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রেসিডেণ্ট একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—বিরোধ ত আগেই ঘটে গেছে, এখন ওকথা ভেবে ত লাভ নেই বোসমশায়। তবে ধরুন দত্তমশায়—

দত্ত মহাশয় কহিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রেসিডেণ্ট তাহার কথায় খেই ধরিয়া কহিলেন—যদি সত্যিই গরীব হয়, আর বিরোধ বাড়িয়ে লাভ না থাকে তবে ওটা মিটিয়ে ফেলাই ভাল, তবে দত্ত মশায়ের প্রজাটি ত একটু শাঁসালো শুনছি।

দত্ত মহাশয় কহিলেন—আজ্ঞে ওটা বাজে কথা, কিছু না। তারপর আষাঢ় মাস, বুঝছেনই ত তবে যা হয় এদিক ওদিক ক'রে ওটা শোধ করে ফেলাই ভাল।

প্রেসিডেণ্ট একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—মিটিয়ে ফেলাই ভাল সে কথাটা ত সত্যিই, তবে সে হাত ত আমার নয়। আমার রিপোর্ট করার কথা—এই পর্য্যন্ত।

বোস মহাশয় কহিলেন—কথাটা অবশ্য ঠিক কিন্তু রসিক, মানে আমার প্রজাটির ত দুদিন উপোস চল্‌ছে সেখানে কি কিছু হবে? জেলে যেতে হলে যেতে হবে।

—হ্যাঁ, হবে। কিন্তু বতরের সময় গেলে ত মরবে। এখন আপনাকে ত রক্ষে করা উচিত।

—উচিত ত নিশ্চয়ই, কিন্তু আমারও ত ফুঁ সরছে না।

দত্ত মহাশয় কহিলেন—রস থাকলে বেরোয় প্রেসিডেণ্ট ছাহেব কিন্তু শুকনো গাছে ত রস বেরোয় না।

প্রেসিডেণ্ট একটু ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে কহিলেন—ফৌজদারী চল্‌লে রস আপনিই বেরুবে দত্তমশায়। আর কিছু না পারলেও সেটা ত পারবো।

দত্ত মহাশয় একটু ভীত হইয়া কহিলেন—সেটা ত অবশ্যই পারেন, তবে—বোসমশায় কি বলেন ?

বোস মহাশয় কি বলিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই জানিতেন তাই একটু বিষণ্ণভাবে বলিলেন—উনি যদি নাই ছাড়েন তবে আর কি আষাঢ় মাসের দিন—গোটাপাঁচেক—

প্রেসিডেণ্ট হাসিয়া কহিলেন—এটা কি ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছে বোসমশায় ?

—না-না-না, বলেন কি ? যা শক্তি তাই বলেছি এতে কিছু মনে না করাই ভাল। আপনার দয়ার শরীর তাই বল্‌তে সাহস পেয়েছি।

দত্ত মহাশয় ধুয়া ধরিয়া কহিলেন—আজ্ঞে তাই, তা না হ'লে একথা আপনার মত লোককে কি বলা যায়, আর ধরুন আপনার দ্বারাই ত আমরা আছি। আব্দারটা আপনার কাছেই ক'রবো ত!

—তা বটে, কিন্তু আব্দারটা যে আলালের ঘরের দুলালের মত শোনাচ্ছে। যাক্ আপনারা যা ব'ললেন তার পর আমার আর কিছু বলা সাজে না। তবে আর একটু বাড়ালে ভদ্রতা হ'ত, মশা মেরে হাত কালো করা।

বোস মহাশয় কহিলেন—কিছু মনে ক'রবেন না—এর পরে যদি সুযোগ হয়—তবে—

প্রেসিডেণ্ট একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—আচ্ছা উঠি। মনে রাখবেন।

একখানা পাঁচ টাকার নোট পকেটে করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটু ভদ্রতার সঙ্গে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দত্ত মহাশয় বিরক্তির সঙ্গে কহিলেন—যাক্, সাম্‌নের বার ইলেকসনে সুদ সমেত নিলেই হবে।

রসিক সকালে গরু কয়েকটিকে হালটের উপর বাঁধিয়া দিয়া আসিয়া দেখে কুসুম দাওয়ার উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া বমনের চেষ্টা করিতেছে। রসিক তামাক সাজিতে সাজিতে কহিল—কি হ'ল রে কুসুম ?

কুসুম কহিল—বমি বমি ঠেকছে, মুখে জল আসছে, গায়ের মাঝে কেমন কেমন করছে।

—কেন ?

কুসুম একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়া কহিল—কেন তা জানো না ?

—আমি জান্‌বো কেমন ক'রে ?

—বৌ নিয়ে গেরস্থালী কর নি ? মানুষের বমি বমি ঠেকে কখন ?

—ও, তা এতদিন ত হ'ল কি করি ?

—আজ তিনমাস ধরে ব'লছি, যে সন্দেহ হয় তা গ্রাহ্যই করছো না। এখন আমি কি করি ? এখনও চেষ্টা করো—

রসিক বিষণ্ণভাবে কহিল—ধানগুলো বোসমশায় নিয়ে গেল। চুরি ক'রে যা রেখেছি আর কাটার "প'ড়েত" দিয়ে যা পাবো তাতে হয় ত ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত চ'ল্‌তে পারে কিন্তু এখন রাঙাদির কাছে গেলে সে কি অল্পে ছাড়বে ?

—তবে কি আমি মুখ পোড়াবো এখন ? যেদিন নিয়ে এসেছিলে সেদিনই ত জানো যে এসব ঝামেলা পোয়াতে হবে। এত লাঞ্ছনা ক'রলে, মারলে তাতেও ত কিছু হয় নি।

রসিক গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল—উপায় ?

—আমি মেয়েমানুষ হ'য়ে উপায় ক'রবো নাকি ?

রসিক সান্ত্বনা দিবার স্বরে কহিল—ভাবিস্ নি, একটা উপায় নিশ্চয়ই ক'রবো।

—উপায় ক'রতে ক'রতে সব জানাজানি হ'য়ে চুণ কালি পড়তে আর বাকী থাকবে না।

রসিক আর কিছু কহিল না। চুপ করিয়া বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। আষাঢ়ের মেঘমেদুর সকাল-বেলাটায় যেন জগতের সমস্ত বিষণ্ণতা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। স্থির সবুজ পাতাগুলি আকাশের কালো মেঘের সহিত মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—অদূরে কাহার আমগাছের একটা পরগাছায় লালফুল কালোর কোলে চিক্ চিক্ করিতেছে—হিজলের ফুলগুলি কাদার মাঝে ঝরিয়া পড়িতেছে। বাঁশ বাগানের মাঝে বাঁশের পাতা পচিযা একটা আর্দ্রতার গন্ধ প্রকাশ করিতেছে। পাটের ক্ষেতের সোঁয়াপোকা বাড়ী পর্য্যন্ত আসিতেছে।

রসিক নূতন ধানের চিড়া ও কাঁটাল খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বিশেষ কোন কাজ নাই, গরুর জন্যে ঘাস কাটিতে হইবে মাত্র। রসিক পাড়ার উপর দিয়া রাঙাদিদির ওখানে যাইতেছিল, নিবারণ ডাকিল—ওরে রসিক, শোন্ শোন্—তামাক খেয়ে যা।

রসিক তাহার ঘরের দাওয়ায় মেটে মোড়ায় বসিয়া কহিল—তোমার ধান সব কাটা হ'ল ?

—না রে, আমার ত বেশী ডাঙ্গামাঠে, নামি ধান। এই মাসের শেষাশেষি কাচি ধ'রতে পারবো। তোর ত জলি আউস সব কাটা শেষ ?

—হ্যাঁ। একখানা জমিতেই ছিল, আর সব বাওড়া।

নিবারণ হুঁকাটা আগাইয়া দিয়া কহিল—মামলার খবর শুনেছিস ?

—না, নতুন কি খবর আবার ?

—প্রেসিডেণ্টবাবু যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে ত মামলা চলবে। বোসমশায় দত্তমশায় দু'জনের কাছ থেকে টাকা পেয়েও শেষে এই কর্ম্ম ক'রলে। দত্তমশায় ত বললে, তার উপর রাগ আছে তাই নইলে এমন—

রসিক আর একটু চিন্তিত হইয়া কহিল—মামলা ত চলবে কিন্তু চালাবে কে? গুরোর ধান আছে একরকম ভাবে হয় ত পারবে কিন্তু আমার যে কিছুই নেই। তোমাদের জমিতে ধান কেটে তবে হয় ত কিছু পাবো।

—মিটিয়ে ফেলে দে।

—তাই ক'রতে হ'বে কিন্তু গুরোর কি কোন বিচার হবে না?

নিবারণ হাসিয়া কহিল—লোক-লজ্জাই ত তার শাস্তি, আর কুসুম ত ঘরের বৌ নয়।

রসিক উঠিল। সেও বহুবার ভাবিয়াছে কুসুম ত তাহার ধর্ম্মপত্নী নয় তবে তাহার মন এমন ঈর্ষায় ভরিয়া উঠে কেন? কুসুম কাহারও সহিত হাসি তামাসা করিলেই বা তাহার সহ্য হয় না কেন? কিন্তু কিছুতেই সে পারে না। কুসুম তাহাকে ভালবাসে না একথা ভাবিতেই তাহার মনটা বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

রসিক রাঙাদির উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—রাঙাদি।

রাঙাদি মালসার আগুনে তামাকের পাতা পোড়াইয়া গুড়া তৈয়ারী করিতেছিল। একটু চাহিয়া দেখিয়া কহিল—কে? রসিক? আয় রে বোস্।

রসিক দাওয়ায় অবস্থিত একখানা ছেঁড়া বস্তার উপর বসিয়া কহিল—বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি রাঙাদি। তুমি রক্ষা না ক'রলে এখন আর উপায় নাই।

রাঙাদি রসিকের মুখের পানে চাহিয়া, বিপদটা যেন অনুমান করিয়া ফেলিল বলিয়া বোধ হয়। তার পরে একটু হাসিয়া কহিল—বিপদ ত একটাই কিন্তু আমার কি-ক্ষেমতা বল্। কুসুমকে বলিস্ রাঙাদি কিছু পারবে না—একদিন একসের চাল চাইতে গেলাম সে কত কি ব'ল্লে।

রসিক কহিল—চাল কি ঘরে ছিল? ছিল না, তাই হয় ত দিতে পারে নি। কিন্তু তুমি যদি এ কাজটা না ক'রে দাও তবে কি মুখে চুণ-কালি মাখ্‌তে বল।

—না রে রসিক, তিনকাল যেয়ে এককালে ঠেকেছে এখন কি ওসব করা যায়। এখন জপ্‌তপ্‌ করি—

রসিক কহিল—মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রলে কি ধর্ম্ম হয় না রাঙাদি। আর আমি ত তোমার কোন অপকার করি নি। সেবার যখন রোগে পড়েছিলে তখন একা আমিই ত তোমাকে টেনেছি। এখন তোমাকে আর কি ব'ল্‌বো। তুমি গুরুজন তোমার পায়ে পড়ি, তোমাকে রক্ষে ক'রতেই হবে।

রাঙাদি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সদ্য দগ্ধ গুঁড়ার কিরূপ স্বাদ হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া কহিল—হুঁ, বুঝি ত সবই, তবে তোমার কুসুম যে কথার পাত্র নয়। সে আমাদের মত বুড়িকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। তবে তোমাকে জন্মাবধি টান্‌ছি, টান্‌বো। তোমার মুখ চেয়ে অধর্ম্ম ক'রতে হ'লেও ক'রতে হবে।

রসিক অনেকটা খুশী হইয়া কহিল—তাই ত, বলি তুমি থাকতে আমার ভাবনা কি?

—কিন্তু ত্যাখ্‌, রসিক, পঞ্চাশ টাকার কমে এ সমস্ত কাজ হবে না।

রসিক অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—বল কি দিদি, পঞ্চাশ টাকা

যে গরু বাছুর ঘর বিক্রি ক'রলেও হয় না। শেষে কি আমাকে ভিটে ছাড়া ক'রতে চাও—

রাঙাদি অত্যন্ত নির্লজ্জের মত কহিল—কিন্তু আমারও ত বাঁচতে হবে, কেউ ত সাহায্য করে না দু'বেলা দু'টো ত খেতে হবে।

—কিন্তু একসঙ্গে পঞ্চাশ টাকা জোটাবো কেমন ক'রে? তার পরে ঘাড়ের উপর ফৌজদারী মামলা রয়েছে। তবে ভাদ্র মাসে পাট বেচে তোমায় কিছু দিতে পারবো, এখন যে দু'বেলা ভাত জোটানোই যাচ্ছে না দিদি।

রাঙাদি একটু গম্ভীর হইয়া কহিল—কত ভাদ্দর যাবে কিন্তু দিদির কথা মনে থাকবে না। কত ত দেখলাম—কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি। আগাম টাকা না নিয়ে কাজ আমি করি না।

অনেক রকম ভাবে দরদস্তুর চলিল, কিন্তু রাঙাদি কিছুতেই কমে রাজি হইল না। অবশেষে একটু আশা দিয়া কহিল—আচ্ছা যা, কুসুমের কাছে শুনে দেখি তার পরে যা হয় ব'ল্‌বো, আর তার কাছে সব বলে আস্‌বো।

রসিক উঠিয়া দাঁড়াইল—রাঙাদি আঁচলের আড়ালে একটু হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, আয় রে রসিক।

সন্ধ্যার পর ষষ্ঠীচরণকে ডাকিয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন—ষষ্ঠী, প্রেসিডেন্ট ব্যাটা দুই পক্ষের ঘুষ খেয়ে এমন একটা রিপোর্ট দিয়েছে যাতে মামলা ত চল্‌বেই অধিকন্তু সাক্ষী সাবুদ ভাল না হ'লে গুরোরও কিছু হ'য়ে যেতে পারে। নবীনকে কে সড়কি মেরেছে তা বোঝা যায় না। ওরা ত প্রমাণ ক'রবে গুরোই মেরেছে।

ষষ্ঠীচরণ এরূপ মামলা বহু দেখিয়াছে, সে ব্যাপারটার গুরুত্ব

অনুভব করিয়া কহিল—তা ত ক'রবেই কিন্তু আমার জমিতে যে ওরা ধান কেটেছে এটা ত প্রমাণ করা যাবে—

—যায় ভাল, না যায় যদি তবেই ত মুস্কিল। দিন ত বোধ হয় সামনের সপ্তাহেই হবে। সাক্ষীসাবুদ সব যাতে ঠিক ঠিক শমন হয় তার জন্যে মোক্তারবাবুকে কিছু দিয়ে আসতে হয় কারণ জানো ত ফৌজদারী মামলায় চাই তদ্বির। আমি বুড়ো মানুষ তাতে জলকাদার পথ, যেতে হ'লে ত নৌকায় যেতে হয়।

ষষ্ঠী কহিল—যদি এতই হ'ল তবে কি আর নৌকো ভাড়া হবে না? আপনি যান্—যা দরকার ক'রে আসুন।

দত্ত মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন।

বোস্ মহাশয় ডাকিয়া রসিককে অনুরূপ কথাই বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মাঝে আর একটা কথা পাদপূরণ হিসাবে ছিল। সে কথাটির তাৎপর্য্য এই যে নগদ টাকা না পাইলে তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। রসিক চিন্তিত মনে ফিরিয়া গিয়াছে।

গ্রামে মনোহরবাবু বলিয়া একজন স্কুলমাষ্টার ছিলেন। লোকে তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত। ষষ্ঠী ও রসিক উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া গেল—মনোহর পণ্ডিত তাহাদের দুইজনকেই ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

ষষ্ঠী গুরুচরণকে কহিল—পণ্ডিতমশায় আবার ডাকলে কেন রে?

গুরুচরণ একটু চিন্তা করিয়া কহিল—বর্গা জমির কথা হয় ত—তার জমিতে ত বাওড়া বোনা আছে।

—না রে, ও নয়, জমি ত তার দেখা!

যাহাই হউক ষষ্ঠীচরণ একখানা নড়ি লইয়া উপস্থিত হইল—কিন্তু

রসিককে পূর্ব্বেই উপস্থিত দেখিয়া একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—আমাকে ডেকেছেন পণ্ডিতমশায় ?

মনোহরবাবু কহিলেন—তোমাদের দু'জনকেই ডেকেছি। রসিক ত আগেই এসেছে। বোসো তামুক খাও—

রসিক কলিকাটি বেঞ্চির প্রান্তভাগে নামাইয়া দিয়া কহিল—এই যে কল্‌কে—

ষষ্ঠী তামাক টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিল—কেন ?

পণ্ডিতমশায় কহিলেন—ভাখো, আষাঢ় মাস, টাকা পয়সার সকলেরই টানাটানি। আউস ধান দু-চার আঁটি সকলে যা পেয়েছ তা যদি এখন বেচে মোকর্দ্দমা চালাতে হয় তবে—শ্রাবণ ভাদ্র খাবে কি ? আর তোমরা একই গ্রামের লোক, ভাই ভাই, স্বজাতি এক্ষেত্রে তোমাদের বিবাদ চিরদিন থাকবে না কিন্তু টাকা পয়সা খরচ করে বৃথা কষ্ট পাবে। মানুষ মানুষই দেবতা নয়, ভুল ত্রুটি সকলেরই হয়, হ'তে পারে। কাজেই একজনের অপরাধকে চিরদিন মনে করে রাখা চলে না। গুরুচরণ জোয়ান ছেলে, কুসুমের সঙ্গে যদি একটু আসনাই ক'রে থাকে সে অন্যায় ক'রেছে—আর সেজন্যে রসিক যেমন রাগের মাথায় অমনি ক'রেছে অন্য যে কেউ হ'লেও ক'রতো। তোমরা মামলা মিটিয়ে ফ্যালো—সংবাদ পেলাম নবীনের ঘা সেরে গেছে। শিগ্‌গিরই আসবে। রসিক কি বল ?

রসিক কহিল—আমার কি ইচ্ছে যে মামলা করে ফতুর হই ?

—ষষ্ঠী কি বল ?

ষষ্ঠী কহিল—রসিক ছেলেমানুষ যা ক'রেছে তার জন্যে যদি ক্ষমা চায় তবে মিটিয়ে নিতে পারি। গ্রামের বুড়ো বলে ত একটা খাতির করা উচিত—আমার জমিতে কাঁচি দেওয়ার আগে সেটাও ভাবা উচিত ছিল ?

মনোহর একটু হাসিয়া কহিল—মানুষের মাথা যখন খারাপ হয় তখন

কি উচিত অনুচিত ভাবে? আর রসিক তোমার ছেলের মত, তোমার পায়ে ধরলেও ত তার অপমান নেই—

রসিক কোন কথা কহিল না, ষষ্ঠী কহিল—কিন্তু দত্তমশায়কে না ব'লে ত কিছু হ'তে পারবে না।

—তিনিই খরচপত্র ক'রে সমস্ত ক'রছেন। মনিব—

মনোহরবাবু কহিলেন—দত্তমশায়, বোসমশায়দের কাছে গেলে আর হবে না। মামলা মিটলে ত তাদের লোকসানই হবে। তোমরা দু'জনে ঠিক ক'রে মোক্তার দিয়ে সোলের দরখাস্ত দিয়ে এসো—

ষষ্ঠী চিন্তা করিয়া কহিল—তা ত হয় না পণ্ডিতমশায়। দত্তমশায়ের কাছে না শুনে—

—আচ্ছা বেশ শুনেই ক'রো কিন্তু একটা কথা তোমাদের বলি, তারা যদি মামলা মিটোতে না রাজি হয় তবে জেনো তারা তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। আমার কোন স্বার্থ নেই, তোমাদের ভালর জন্যেই বললাম। ভেবে দেখো, পরের কথায় নিজের সর্ব্বনাশ ক'রো না।

মামলা মিটাইবার কথা যথাসময়ে দত্তমশায়ের কর্ণগোচর হইল, তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন—পণ্ডিতের বুদ্ধি আর কত হবে? একটা কথার জবাব দাও ত—তুমি খুন ক'রলে রাজা কি তোমায় ছেড়ে দেবে? মিটিয়ে ফেলা যায়?

ষষ্ঠী কহিল—হ্যাঁ, তাই ত।

—ব্যাপারটা খুব সিদে—রসিক হয় ত দু-চার টাকা দিয়েছে তাই উনি মামলা মিটানোর জন্যে এত চেষ্টা ক'রছেন কিন্তু আমরাও ত ধানের চালের ভাত খাই। তা নইলে, যিনি তোমাদের কেউ নয়, মনিব নয় কিছু নয় তার এত মাথা ব্যথা কেন বল ত?

চরণ মনে মনে ভাবিল—নিঃস্বার্থভাবে জগতে কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে ইহা ত সম্ভব নয়। তাই মনে মনে দত্ত মহাশয়ের কথাটা কিছু বিশ্বাস করিয়া কহিল—কিন্তু পণ্ডিতমশায় ত তেমন লোক না, রোগ ভোগ হ'লে নিজেই ত দৌড়ে অষুধের বাক্স নিয়ে আসেন। তবে—

দত্ত মহাশয় কহিলেন—ওর হোমিওপ্যাথি অষুধ ত কেউ খায় না, রোগও সারে না তবুও কুমড়ো কচু যদি কিছু হয় এই জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। জগতে স্বার্থ না হ'লে কেউ কিছু করে?

ষষ্ঠীচরণ ভাবিয়া দেখিল—উপকার করুন আর নাই করুন পণ্ডিত মহাশয় অন্ততঃ কাহারও অপকার করেন না, তবুও দত্ত মহাশয়ের যুক্তি অগ্রাহ্য করিবার মত নয়। ষষ্ঠী তাই একটু চিন্তা করিয়া কহিল—যা ভাল বোঝেন তাই করুন। তদ্বির ত ঠিক রাখতে হবে।

—হ্যাঁ, এইটেই বিষয়ী লোকের কথা, মিটানোর কথাটা, একটা চাল হয় ত! চাল দিলে যদি তদ্বির ছেড়ে দি তবে সুবিধা হতে পারে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—এ কথাটা হতে পারে। বোসমশায় চালটা খেলেছেন মন্দ নয়—

বলা বাহুল্য বোস মহাশয়ও অনুরূপ যুক্তি রসিককে দিয়া তাহাকে সমস্ত সমজাইয়া দিয়াছেন এবং রসিকের শেষ কয়েক কাঠা ধান বিক্রয়লব্ধ কয়েকটি টাকা লইয়া তাহাকে জেলের হাত হইতে মুক্তি দিবার জন্যে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়া মহকুমায় যাইবেন জানাইয়াছেন। দত্ত মহাশয় অবশ্য নৌকায়ই যাইবেন।

*

দত্ত মহাশয় নদীর ধারে বৈকালে হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন। সবুজ চরটা নতুন জলে ডুবিয়া গিয়াছে। পাড়ের উপর দিয়া যে রাস্তাটা

বরাবর চলিয়া গিয়াছে সেটা শুষ্ক বালুকাময়—নদীর ধারের বটগাছ দুইটি প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার আশ্রিত পাখীগুলি পরপার হইতে ফিরিয়া আসিতেছে—ওপারের বাবলাতলায় মহিষগুলি জলের মধ্যে বসিয়া আছে। গাছের মাথায় ঘুঘু ডাকিতেছে। কোন এক অলস গৃহস্থের গরু তখনও নদীর তীরে বাঁধা রহিয়াছে। দুইটা বুভুক্ষিত শালিক তাহার পীঠে চড়িয়া আটালু খাইতেছে।

গুরুচরণ একখানা গামছা পরিয়া দোয়াড় পাতিতেছিল—উরু পর্য্যন্ত জল কিন্তু 'বানা' দিয়া বাঁধ দিতে হইয়াছে অনেকখানি। দত্ত মহাশয় বেতের বাঁকা লাঠিটা ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—কি রে গুরো, কি মাছ পেলি? দেখি—

গুরুচরণ খালুইটা আগাইয়া লইয়া কহিল—এই ক'টা চিংড়ে আর একটা গুঁজি আইড়।

দত্ত মহাশয় মাছ কয়টা অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া লইয়া কহিলেন—বেশ, বেশ মাছ হ রে গুরো। না তোদের আর ধর্ম্মকর্ম্ম রইল না। বুড়ো হ'য়েছি কবে মরে যাবো তখন মনে মনে বলবি, হায় রে একদিনও তাকে দুটো চিংড়ি মাছ খাওয়ালাম না।

রাত্রের মাছ নাই তাই গুরুচরণ মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিল কিন্তু উপায় নাই তাই বলিল—নিবেই যাবেন দত্তমশায় না দিয়ে আস্‌বো?

—না না, আবার অন্ধকারে যাবি কেন? একটা কচুর পাতায় বেঁধে দে, আমিই নিয়ে যাবো।

গুরুচরণ অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাছ কয়েকটা বাঁধিয়া দিয়া আবার জলে নামিল। দু'খানা দোয়াড় তখনও দেখা হয় নাই—তাহার ভাগ্য ভাল তাহাতে বেশ মাছ পড়িয়াছে।

দত্ত মহাশয় মাছ ক'টা হাতে করিয়া পুলকিত অন্তরেই বাড়ির দিকে

ফিরিয়াছিলেন। হঠাৎ দেখেন সামনেই মনোহর পণ্ডিত যাইতেছে। হাঁকিয়া কহিলেন—ওহে পণ্ডিত, হাতে কি ?

—মাছ। ইস্কুল থেকে ফেরার পথে একেবারে হাট ক'রে ফিরলাম।

—কি মাছ ?

—চিংড়ি। তা ছাড়া আর কোন মাছই নেই আনবার মত। আপনিও ত প্রায় চার আনার মাছ সংগ্রহ করেছেন দেখছি।

—হ্যাঁ। গুরো ভালবেসে দিলে, না এনে কি করি। যাকে বলে স্নেহের দান। কিন্তু পণ্ডিত, এই ফৌজদারী মেটানোর জন্যে তোমার সখ হ'ল কেন ?

—সখ কেন ? খামকা উকিল মোক্তার কতকগুলো টাকা নেবে আর তার চেয়েও বেশী নেব—

—বল, বল, থামলে কেন ? শুনতে বাকি নেই, আমি আর বোস-মশায় দুই তাদ্বিরকারক যে কিছু খাচ্ছি তা ত বলতে বাকী রাখো নি। সামনেই বল—লজ্জা কি ?

পণ্ডিত মহাশয় একটু ভীত হইয়া কহিলেন—না ঠিক অমন কথা ত বলি নি—তবে—

—তবে মানে—ও সব বুঝি পণ্ডিত কিন্তু কথাটা কি জানো ? তোমার চাল বুঝবার বয়স হ'য়েছে, রসিক নেহাতহ গরীব, তার টাকা ক'টা খেয়ে কি ভাল ক'রলে ভায়া ! কাজে ত কিছুই ক'র নি।

পণ্ডিত একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—থাক্ দত্তমশায়, আপনি ত বিশ্বাস ক'রতে পারবেন না যে মানুষ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবেও পরের উপকার ক'রবার জন্যেই উপকার ক'রতে পারে। তবে আর তর্ক করে লাভ নেই ওটা আপনি বুঝবেন না।

দত্ত মহাশয় পুনরায় হাসিয়া কহিলেন—ওটা বিশ্বাস ক'রতে ত পারিনে

পণ্ডিত, এতখানি বয়সে ওটা ত দেখি নি, আর হঠাৎ মহাপুরুষ কেউ জন্মেছেন এটা বিশ্বাস করাটা কি বেকুবী হবে না ?

মনোহর পণ্ডিত তীক্ষ্মদৃষ্টিতে দত্ত মহাশয়কে একবার দেখিয়া লইয়া কহিলেন—মানুষ নিজের মন দিয়ে অপরের মনটা বিচার করে, তাই ও বিশ্বাস আপনি ক'রবেন না জানি। আচ্ছা যাই—বড় পরিশ্রান্ত—

দত্ত মহাশয় কহিলেন—থামো থামো, শোনো। একটু গালাগালি দিলে বলে মনে হ'ল কিন্তু একটা ব্যাপারে সাবধান ক'রে দি। আমার পিছনে লেগে বিড়ম্বনা ডেকে এনো না।

—আপনার সঙ্গে লাগবো ? বলেন কি ? যাদের চুষে ছিবড়ে ক'রছেন তারা ছিবড়ে হ'লে, আপনিও সঙ্গে সঙ্গে হবেন—তা জানেন ? তবে যা ভালো বুঝবো তা কি ক'রবো না।

—ভাল লোক থাকতে হ'লে সেটা না করাই ভাল। ওটা ক'রলে লোকে তোমাকে আহম্মক বলবে।

এমন নির্লজ্জভাবে কেহ পাপ ও অন্যায়কে সমর্থন করিতে পারে তাহা বোধ হয় মনোহর পণ্ডিত পূর্ব্বে দেখেন নাই, তাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া দ্রুতপায়ে চলিয়া গেলেন।

কুসুম চিনের কয়েকটি ভাত মুখে দিয়া দুপুরে অত্যন্ত বিষণ্নমনে বসিয়াছিল। ভাবিতেছিল—রসিক ত কিছু করিল না, এখন এই লোক-লজ্জার হাত হইতে কি করিয়া মুক্তি পাওয়া যায়। লোকে কি বলিবে, আর ত এ কাহিনী দেহের মাঝে গোপন করিয়া রাখা যায় না।

রাঙাদি অত্যন্ত ধীর মন্থর গতিতে উঠানটি পার হইয়া কহিল—অ-কুসুম। তোর ব'লে কি হ'ল। আবার একটা বেয়াদ্দি হ'ল নাকি ?

রাঙাদিকে দেখিয়া তাহার সমস্ত শরীর ঘৃণায় যেন ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে প্রেত দেখিয়া যেমন বুক কাঁপিতে থাকে তেমনিভাবে বুকের মাঝেও কাঁপিতে লাগিল। কুসুম হাসিবার একটু অক্ষম অভিনয় করিয়া কহিল—এস রাঙাদি—পান খাও।

—রাঙাদিকে আদরের ঘটা পড়ে গেছে দেখছি। কি হ'ল রে কুসুম—একমুঠ চালের জন্যে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলি, আর আজ যে বড় মায়া দেখ্ছি। বলেছি ত, রাঙাদির হাতে পড়তে হবে।

কুসুম রাঙাদির দুই-পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—দিদি, আমাকে লোক-লজ্জার হাত থেকে বাঁচাও দিদি। আমি তোমার গোলাম হ'য়ে থাকবো—আর আমায় বিশ্বাস করো, চাল সত্যিই সেদিন ছিল না। আজও ত চালের ভাত খাই নি, চিনের ভাত খেয়েছি নুন দিয়ে—তোমার পায়ে পড়ি দিদি। কুসুম কাঁদিয়া ফেলিল।

—কেন আউস ধান কি হ'ল?

—সব বিক্রি ক'রে মামলা চালাচ্ছে, নইলে যে জেল হয়। পঞ্চাশ টাকা ও কোথা হ'তে দেবে? একটা গরু বিক্রি করে তবে কয়েক কাঠা ধান কিনে ছিল তাও ত বেচতে হয়েছে।

রাঙাদি দাঁতে গুড়ো দিয়া একটু যেন চিন্তা করিয়া কহিল—কেন? তোর গুরোকে দিতে বল্—ব্যায়ারাম কেন সৃষ্টি হ'য়েছে তা ত আর জানিস্ না।

—না, রাঙাদি। সে আমায় দেবে কেনো? আর তার ত কোন দোষ নেই।

রাঙাদি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, এমনি না হ'লে পীরিত। গুরোর গায়ে যেন আঁচড় না লাগে, কেমন? তবে তোরা কি দুপুর রাত্রে হিজলতলায় বসে কীর্ত্তন করিস্?

—তোমায় ছুয়ে ব'লছি রাঙাদি, আমি পাপ করি নি। কুসুম এমনভাবে কথাটা কহিল যেন পাপ ও পুণ্যকে সে আভিধানিকভাবে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে।

রাঙাদি চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল—কিন্তু টাকা ত আমার চাই, বিনিটাকায় ত এসব হয় না। অষুধপত্র কিন্‌তে হবে, সংগ্রহ ক'রতে হবে।

—কিন্তু অত টাকা কোথায় পাবো? ভাদ্রমাসে পাট বিক্রি ক'রে তোমায় দেবে বলেছে।

—ওসব কথা রাখ্‌ কুসুম। কাজ হয়ে গেলে আর কেউ টাকা দেয় না। দশটাকা আগাম না হ'লে কাজ ক'রবই না। আর দশটাকা ভাদ্রমাসে দেবে, আর যদি আমার কথা শুনিস্‌ তবে—

—নিশ্চয়ই শুন্‌বো দিদি, তোমার কথায় অবাধ্য আর হবো না।

—ঠিক ত?

—হ্যাঁ, ঠিক। মরতে ব'ললেও পারবো।

রাঙাদি প্রথামত একটু ভণিতা করিয়া কহিল—ওই যে কেদারের ভাই বিপিন তার বৌ মরে গেছে। সে তোকে টাকা পয়সা, গহনা সব দিতে চায়। বলি ঘরের বৌ ত আর নয়, এই সময় আখের গুছিয়ে নে। মাঝে মাঝে আস্‌বে আমি আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে রাখবো আর রসিককে তুকতাকে ক'রবো কাণা, তোর ভয় কি? কেমন রাজি ত —তা নইলে আমার দ্বারা কিছু হবে না—তার বাড়িতে থাকৃতে পারিস্‌—

কুসুম প্রতিজ্ঞা করিবার সময় ভাবিতেও পারে নাই যে এমনি একটা প্রস্তাব রাঙাদি করিবে। কথাটা শুনিয়া তাহার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল কিন্তু সে সহসা জবাব দিল না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল—কি দেবে? মাসে মাসে না—

—হ্যাঁ, মাসে পাঁচ টাকা দেবে।

—তোমায় ?

—আমায়—না! আমার কথা ছেড়ে দে—তোদের মুখ দেখ্‌লেই সুখী। তবে কিছু দেবে বই কি, নইলে আমারও ত পেট চলা চাই। বাতাস খেলে ত পেট ভরে না লো!

কুসুম কহিল—রোগ সারলে তার পরে ত ?

—হ্যাঁ, তা বই কি ? আগে আর কেমন ক'রে হয়।

কুসুম একটু হাসিয়া কহিল—লজ্জা কিন্তু—

—না না, আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখবো বল্‌ছি। তা ছাড়া এটা ওটা ত মাঝে মাঝে পাবিত।

—যদি লোকে ঠিক পায় ?

রাঙাদি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল—হায় রে! আমি থাক্‌তে লোকে ঠিক পাবে!

আরও কয়েকটা কথা বলিয়া রাঙাদি অনেকটা সফলতার আনন্দ লইয়া চলিয়া গেলেন। কুসুম যেমন ভাবে বসিয়াছিল তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল।

রসিক আসিয়া প্রশ্ন করিল—রাঙাদি কি ব'লল রে ?

কুসুম রাঙাদির সমস্ত কথাই কহিল এবং কেদারের ভ্রাতার প্রস্তাবটির কথাও বাদ দিল না। সে প্রস্তাবে তাহার সম্মতির কথাটাও গোপন করিল না।

রসিক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—রাজি হ'লি ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

কুসুম হাসিয়া কহিল—বলেছি, কাজটা হ'য়ে গেলে পরে। তা নইলে

রাঙাদি যে রাজি হয় না, আর শেষে কথা যে রাখতেই হবে এমন কি কথা আছে।

রসিক ব্যাপারটা বুঝিয়াছে এমনি ভাবে বলিল—ও তাই বল্। তোর ত বুদ্ধি আছে রে কুসুম, ভেবেছিলাম বোকা কিন্তু এখন দেখছি রাঙাদিকেও টেক্কা দিয়েছিস্।

কুসুম একটু ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া কহিল, রক্ষে করো, তোমার রাঙাদিকে টেক্কা দেওয়া আমার চৌদ্দপুরুষেরও কম্ম নয়।

—যাক্, এখন গোটা-দশেক টাকা যোগাড় ক'রতে পারলেই হয়।

—হ্যাঁ, কিন্তু আজ রাত্রে কি খাবে?

—চিড়ে আছে না?

—একগাল হ'তে পারে।

—আজকের দিন ওইতেই যাবে, কাল যা হয় ক'রবো।

ক্ষুধার্ত্ত রসিক অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায়ই শুইয়াছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে বেশ একটু গরম পড়িয়াছিল, রসিক জাগিয়া গেল, কুসুম অত্যন্ত নিশ্চিন্তে তাহারই শয্যার এক কঠিনতর অংশে ঘুমাইয়া আছে। রসিক কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করিল কিন্তু ঘুম আসিল না। সে উঠিয়া আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

মালসার তলায় একটু ঘুঁটের আগুন ছিল, আঙুল দিয়া সেটি ভাঙ্গিয়া লইয়া সে কলিকায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিল। কাল কি করিয়া উদারান্নের সংস্থান করা যায়? পাড়ায় কেহ আর চাল ধার দিবে না। সকলেই বিরক্ত হইয়া গিয়াছে।

অত্যন্ত একাকী রসিক বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

আকাশে কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়া আছে। উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে

বহু দূরাকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে। গাছপালা সব অত্যন্ত শ্রান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কালো আকাশের কোলে কৃষ্ণতর বাঁশ ও তালবৃক্ষের কাণ্ডগুলি ছায়ার মত দাঁড়াইয়া আছে। দুই-একটা জোনাকী বাগানের মাঝে যেন পথহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত আকাশ থম্ থম্ করিতেছে—আর তাহার নীচে সমস্ত পৃথিবী শান্ত ভীতভাবে রুদ্ধনিশ্বাসে আঁখি মুদিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

গুরু গুরু—গুম্ করিয়া আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন বিরাট একটি বিস্ফোরক বোমা ফাটিয়া গেল। তন্দ্রাগত কুসুম ঘুমের ঘোরে কাঁপিয়া উঠিয়া বিছানা হাতড়াইয়া দেখিল কেহ নাই। মৃদুস্বরে কহিল—কই গো, কোথায় গেলে ?

রসিক বারান্দা হইতে কহিল—এই যে এখানে তামাক খাচ্ছি।

কুসুমও গরম বোধ করিতেছিল, সেও বাহিরে আসিয়া কহিল—উঃ কি গরম! বৃষ্টি আস্‌ছে বুঝি!

—আস্‌ছে নয় এল ব'লে।

পৈঠায় পা ঝুলাইয়া একটা খুঁটি হেলান দিয়া বসিয়া কুসুম চোখ বুজিয়াই কহিল—বিষ্টি আসে কই ?

—ভোর তামাৎ আস্‌বে। বাইরে এলি কেন ?

—এলাম। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কুসুম কহিল—তোমার বুঝি ক্ষিধে পেয়েছে ?

—ক্ষিধে ত পায়ই—তোর পেয়েছে ?

—নাঃ, মেয়েমানুষের কি ক্ষিধে অত হ'লে বাঁচে ? কুসুম মৃদু একটু হাসিল কিন্তু নিবিড় অন্ধকারের মাঝে রসিক তাহার কিছুই দেখিল না। রসিক জানিত, কুসুম সবকয়েকটি চিড়াই তাহাকে দিয়াছিল কিন্তু রসিক তাহা ঠিক পাইয়া কিছু অংশ রাখিয়া দিয়াছিল।

রসিক আগাইয়া আসিয়া কুসুমের অতি সন্নিকটে বসিয়া কহিল—তোরে এনে ত খাওয়া পরাও দিতে পারলাম না। তাতে তোর মনে মনে খুব রাগ, না?

—আমার রাগ? আমার আবার রাগ দেখলে কবে? রাগের পুরুষ ত তুমি! ওরে বাবা—

—তোর ত মনে মনে—আজ রাতে ত খেলি নে।

কুসুম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল—আজকাল যে মার না? রাঙাদি ব'ললেই ত হ'ল—

—কি?

—গুরুচরণ এসেছিল একথা যে কেউ ব'ল্‌লেই ত মার—তা আজ কয়দিন মার না কেন? কেউ বলে নি বুঝি?

—পরের কথা শুনেই বুঝি আমি মারি?

কুসুম সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিল—তবে, আমার কাছে শুনেই মার বুঝি?

রসিক কুসুমকে আকর্ষণ করিয়া কহিল—তুই কেন গুরুচরণের সঙ্গে আস্‌নাই করিস্—তার সঙ্গে তোর ভালবাসা?

কুসুম প্রশ্ন করিল—তুমি গুরোকে ভালবাসো না?

—আমি ত—তার গুণকে ত ভালবাসিই।

—আমি বাসলেই কি দোষ? মেয়েমানুষের কি সবটাতেই দোষ?

—না, তবে গুরোর সঙ্গে—

কুসুম হাসিয়া কহিল—সে ত আর আস্‌বে না। তার জন্যে আর ভাবনা কি? সড়কি খেতে আর কি সে আসে?

ঠাণ্ডা হাওয়া বৃষ্টির সূচনা জানাইয়া দিল। নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতা উড়াইয়া লইয়া একটা সড়্ সড়্ শন্ শন্ শব্দ প্রবাহিত করিয়া দিয়া দুই-চার

ঝলক বাতাস বহিয়া গেল। রসিক কহিল—চল্ ঘরে যাই—একঘুম রাত্রি এখনও আছে।

কুসুম কহিল—যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন ছেলেমানুষ হ'চ্ছ, না? রাঙাদির টাকার কি ক'রলে? আর কত দেরী?

—হবে, টাকা জুটতে পারলেই হয়। রসিক কুসুমের অসাড় এবং অনিচ্ছুক দেহটাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ্ ঝাপ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া পড়িল।

রাত্রির বৃষ্টি রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ করিয়া সকাল পর্য্যন্ত চলিতেছিল। রসিক ও কুসুম নিশ্চেষ্ট ভাবে দাওয়ায় বসিয়া ছিল—রাঁধিবার কিছু নাই, করিবার কিছু নাই। কেবল এক কলসী পানীয় জল আনিতে হইবে মাত্র। উঠানের সঞ্চিত বৃষ্টির জল দাওয়ায় কিনার দিয়া ক্ষীণ স্রোতাকারে বহিয়া যাইতেছে। দুইটা ভিজা কাক বৃক্ষশাখায় বসিয়া ভিজিতেছে—দারিদ্র্যের শতধারে লাঞ্ছনা বর্ষণের মাঝে তাহারা যেন অত্যন্ত নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া আছে। একটা ডাহুক খড়ের শূন্য পালার নীচে খাবার খুঁজিয়া ফিরিতেছে—ভিজা পাতা বাহিয়া অশ্রুধারার মত টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। আর্দ্র পৃথিবীর উপর একটা বিবশ নীরবতা বিষণ্ণতার মত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আকাশে ছেঁড়া মেঘগুলি এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিক ফিরিতেছে।

কুসুম কহিল—এখনই একটু জল নিয়ে আসি—চানও সেরে নি।

—জল ত আনবি, খাবি কি?

কুসুম হাসিয়া কহিল—জলই খাবো।

দাওয়ার একটা জায়গার খড় কিছু পচিয়া গিয়াছে সেখান দিয়া জল পড়িতেছিল। সেখানে একটা নারিকেলের মালা বসান ছিল, কুসুম

সেটায় সঞ্চিত জলটুকু ফেলিয়া দিয়া কহিল—মাম্‌লা যদি মিটিয়ে ফেল্‌তে তবে ত ধান বিক্রি ক'রতে হ'ত না।

—আমি ত মিটোতেই চাই ওরা যে ভারী তদ্বির ক'রছে। কিন্তু আজ সত্যিই কি খাবো?

কুসুম কহিল—সে কাঁঠালটা বোধ হয় পেকেছে।

—কোনটা? বোসেদের বাগানের?

—হ্যাঁ। কুসুম হাসিল। সে জানিত কয়েকদিন পূর্ব্বে রাত্রিতে রসিক এই কাঁঠালটি চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। গোপনেই ছিল কিন্তু কুসুম বুঝিয়া ফেলিয়াছে তাই হাসিল।

—বোসমশায় যে এতগুলো টাকা নিলে সবই কি মামলায় লাগবে? তাই তারও কিছু ত আমার ঘরে আসা চাই, এতে আর দোষ কি?

কুসুম সমর্থন করিয়াই যেন কহিল—না দোষের কি?

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে রাঙাদি একটা মেটে কলসী লইয়া আসিয়া কহিলেন—ওরে কুসুম ঘাটে যাবি নাকি?

কুসুম কহিল—বসো রাঙাদি, যাবই ত। বৃষ্টি একটু ধরুক—

—বিষ্টি কি আর ধরবে? চল, এক্ষুনি যাই। রসিক তোমাকে একটা কথা বলি, তিন মাস পার হ'লে কিন্তু আর পারবো না, টাকাটা দুই-চার দিনের মাঝেই দিয়ে দাও, যাতে সামনের শনিবারে পারি তার পরে কিন্তু আমার দ্বারা আর হবে না।

রসিক কহিল—দেব বই কি। অবিশ্বাস কর কেন রাঙাদি? ভাদ্রমাসে সব দেব।

—তবে ভাদ্রমাসেই তোমার কাজ করিও।

কুসুম কলসী লইয়া বাহির হইয়া আসিল। ভিজা পথ কিন্তু কর্দ্দমাক্ত নয়, বিষ্টিতে কাদা ধুইয়া গিয়াছে। ঘাসের উপর দিয়া বেশ যাওয়া যায়

কিন্তু পচা বাঁশের ও অন্যান্য গাছের পাতা পথটাকে একটু কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছে। ঝড় ঝাপটায় কতকগুলি বাঁশ হেলিয়া প্রায় মাথা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। কুসুমকে ডাকিয়া রাঙাদি কহিল—ওই দ্যাখ্ কেদারের ভাই বিপিন, কেমন জোয়ান দেখেছিস্। ওই যে বাঁশ কাটছে। আর খুব ভালো লোক—খুব সরল—

রাঙাদি সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—ওরে বিপিন, কি করিস ? বিষ্টিতেও কামাই নেই ?

বিপিন হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া কহিল—এই ত, যন্তর তৈরী ক'রবো—'দোয়াড়', 'থাদুন', তাই বাঁশ কাটছি।

কুসুমের জন্যেই কিছুক্ষণ বাক্যালাপ ও হাসি তামাসা চলিল কিন্তু কুসুম একবার ফিরিয়াও চাহিল না। অত্যন্ত ঘৃণায় ও অপরিসীম লজ্জায় সে ঘোমটা টানিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। মানুষ যে এমন নির্ল্লজ্জ, এমন ঘৃণিত ভাবে জগতের শ্রেষ্ঠ কামনাকে কুৎসিত করিয়া তুলিতে পারে তাহা সে জানিত না।

ঘাটে তাহাদের পূর্ব্বেই কে কে যেন আসিয়াছে। পশ্চিম পাড়ার বধূগণ আসিয়াছে—দূরে কে যেন 'দোয়াড়' তুলিতেছে। ঘোলা জলের মাঝে বসিয়া সকলে হাস্য পরিহাস করিতেছে—রিম্ রিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। জলের ভিতর হইতে কে যেন উঠিয়া দাঁড়াইল—দিগম্বরী।

সায়া ব্লাউজহীন নগ্ন দেহের উপর কেবলমাত্র শাড়ীখানি জলে ভিজিয়া আঁটিয়া বসিয়াছে। রাঙাদি সেই দেহের মাঝে একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া কহিল—ওরে নাতবৌএর ত যৈবন এসেছে রে! গুরোর ত বরাত ভাল।

রাঙাদির নগ্ন রসিকতাটায় সকলেই মাথা নীচু করিয়া হাসিতে

লাগিল, কেবলমাত্র দিগম্বরী লজ্জায় মরিয়া পুনরায় জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন দেহকে লুব্ধদৃষ্টির অন্তরাল করিয়া ফেলিল।

কুসুম চাহিয়া চাহিয়া দিগম্বরীর বয়ঃসন্ধির সুডৌল সুন্দর দেহ ও সমুন্নত বক্ষ দেখিয়া কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিয়া পড়িল। দুই-এক জন কুসুমের মুখের পানে চাহিল—নিবারণের স্ত্রী ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—কুসুমের কি হবে!

কুসুম কোন কথা কহিল না—রাঙাদি কহিল—কুসুমের আবার হবে কি লো? শ্রীকৃষ্ণ ষোলো শো গোপিনীর মনহরণ ক'রেছে আর গুরো কি দু-চার জন তোকে পারবে না?

নিবারণের স্ত্রী একটু রুষ্ট স্বরেই কহিল—সকলেই ত আর তোমার মত সতী নয় রাঙাদি।

রাঙাদি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তিরস্কারের সঙ্গে কহিল—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সব সতীপণা রেখে দে। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো। অসতী সতী নিন্দেন, বেশ্যা নিন্দেন কোতোয়াল, চোর চন্দন নিন্দেন যেরতো নিন্দেন মাতোয়াল।

একটা কিছু বেমানান হইতেছে মনে করিয়া কুসুম দিগম্বরীকে উদ্দেশে করিয়া কহিল—কি লো সই, চিনতেই পারিস না যে! আমরা যে আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়েই গেলাম।

দিগম্বরী একটা কটু কটাক্ষ করিয়া কহিল—যে চেনার সে ত চেনে, আমার আর দরকার কি?

রাঙাদি কহিলেন—ও মা। নাতবৌর কথা ফুটেছে, বয়সের কাল ত!

কুসুম অতি সংক্ষেপে স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে হয়—সকলেই যেন তাহাকে অন্তরীক্ষে ব্যঙ্গ করে এবং তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন খুঁজে। সমস্ত মনোযোগ দিয়া সে দেহের যে

অভাবনীয় অনীপ্সিত পরিবর্ত্তনকে ঢাকিয়া রাখিতে চায় তাহাই যেন উহাদের চক্ষে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া পড়ে। সে তাই মানুষের সাম্‌নে নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া কথা বলিতে সাহস পায় না।

আষাঢ়ের এই বৃষ্টি তৃতীয় দিনেও থামিল না। ঘাট-মাঠ সমস্ত বর্ষণে এবং বর্ষার জলে ভরিয়া উঠিতেছে। কাঁঠাল শশা সমস্ত নিঃশেষ করিয়া কালকার দিনটা চলিয়া গিয়াছে। আজকার সারাটা দিন নির্জ্জলা উপবাস ছাড়া গত্যন্তর নাই। বর্ষণমুখর প্রাহ্ণে রসিক দাওযায় বসিযা তাহাই ভাবিতেছিল। কাল রাত্রে আউসের মাঠে যাইয়া সে কিছু ধান চরি করিতে চেষ্টা করিযাছিল কিন্তু বাড়ী হইতে নামিতেই পাটের জমির আইলে কি একটা সাপ তাহার পা জড়াইয়া ধরিযাছিল তাই আর বেশীদূর যাইতে তাহার সাহস হয নাই। রাঙাদি টাকার জন্য অত্যন্ত জিদ করিতেছে।

রসিক কুসুমকে ডাকিয়া কহিল—কিছু মুসুরী সিদ্ধ ক'রে রাখ, আজ তাই খেতে হবে আর ওর মাঝে ওই কুমড়োটা কেটে দিস্। দে'খি বোসমশায় দত্তমশায় কিছু দেন নাকি?

রসিক মাথাল মাথায় দিয়া রওনা দিল। গরুটাকে গোয়ালে একমুঠি ঘাস দিয়া সে নিজে নিজেই কহিল—ওই খা আজকার মত, আমাদের ত আর ঘাস খেলে চলে না।

কুসুম কিছু মুসুরী সিদ্ধ করিয়া রাখিয়া রসিকের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বৃষ্টির জন্যে কেউই ধান ভানিতে ডাকে না, নতুন ধানের চিড়াও কেহ করে না। নানা কথার মাঝে তাহার বিপিনের কথা মনে পড়িল, উঃ লোকটা চোখ দুইটা দিয়া যেন তাহার দেহটা গিলিতেছিল, যেমন করিয়া সাপে ব্যাং গিলিতে থাকে। গুরুচরণ আর আসিবে না

হয় ত, সেই বা কেমন করিয়া তাহাকে আসিতে বলিবে। কুসুম আপনার দেহটা ভাল করিয়া দেখিল, রসিকের লাঞ্ছনার চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই তবুও সে মনে মনে ভাবে ও লোকটি একেবারেই নিঃসহায় তাই মনে মনে বড়ো করুণা হয়।

রসিক অত্যন্ত বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিল। কুসুম প্রশ্ন করিল—কি হ'ল?

রসিক কহিল—কি আবার হবে? বোসমশায় কিছু দিতে পারবেন না জানালেন। দত্তমশায় বল্‌লেন কিছু বন্দক না রাখলে পারবেন না। পিতলকাঁসা আছে যে দেব?

রসিক কি যেন একটা কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ভাবিতেছিল। কুসুম মৃদুস্বরে কহিল—আমার একটা রুপোর পৈচে আছে, সেইটা রেখে—

রসিক বিমনা ভাবে কহিল—না না, কিছু লাগবে না। কাল টাকা আসবেই এবং সব টাকাই আস্‌বে।

—কেমন ক'রে?

—চুপ্‌ কর্‌। মেয়েমানুষ সব কথায় তোর দরকার কি?

কুসুম চুপ করিল। রান্নাঘরে যাইয়া যাহা সিদ্ধ করিয়া ছিল তাহা একটু নাড়িয়া দেখিয়া কহিল—মুসুরী এখন দেব নাকি?

—হ্যাঁ দে, চান ত করাই হ'য়ে গেছে।

বাদল দিনের সন্ধ্যা যেন অতি শীঘ্রই নামিয়া আসিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যে বাতাস বহিতেছিল তাহাতে কুপির আলোক কয়েকবার নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত রসিক অন্ধকারের মাঝে অত্যন্ত দ্রুত হুঁকা টানিতেছিল। কুসুম অন্ধকারে দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া হুঁকার শব্দ শুনিতেছিল আর ভাবিতেছিল, এমনি

উপবাসে আর কতদিন চলিবে। যে লোকটি অন্ধকারে বসিয়া হুঁকা টানিতেছে উহার দেহে কর্ম্মক্ষমতাও ত ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে। যে বলদটা উহাকে এত ভয় করে সে আজ তাহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ঘাসের বোঝা মাথায় করিয়া আনিবার শক্তিও যেন আর ওর মাঝে নাই। কুসুম কহিল—আজ বিকেলে দোয়াড় দেখেছ?

রসিক হাসিয়া কহিল—দেখে কি হবে? মাছ পেলে খাবি কি দিয়ে?

প্রশ্নটা সমীচীন হয় নাই মনে করিয়া কুসুম আর কথা কহিল না।

অন্ধকারের মাঝে একটানা বৃষ্টি ও বাতাসের শব্দ হইতেছে। গাছের মাঝে বাতাস যেন হাঁপানীর রোগীর মত শ্বাসকষ্ট ভোগ করিতেছে। আকাশের বুকে মাঝে মাঝে যে বিজলীরেখা ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা অন্ধকারের নিবিড়তাকে যেন ক্ষণে ক্ষণে বাড়াইয়া দিতেছিল। রসিক কহিল—চল ঘুমুই। কুসুম কিছু কহিল না। অন্ধকারেই রসিকের পিছু পিছু ঘরে যাইয়া তাহার শয্যাংশ গ্রহণ করিল।

গভীর রাত্রি।

বৃষ্টি তেমনি করিযাই একটানা শব্দ করিয়া যাইতেছে। বায়ুতাড়িত বৃষ্টিকণা বাঁশের বেড়ার উপর চট্‌পট্‌ করিয়া উঠিতেছে। রসিক কুসুমের নিশ্বাস অনুভব করিয়া বুঝিল সে ঘুমাইতেছে। বাহিরে আসিয়া শিকলট টানিয়া দিয়া রসিক চাহিয়া দেখিল—অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। নিবিড় কালো অন্ধকার সমুদ্রের তলদেশে বাঁশের পল্লবময় পত্রগুলি দুরন্ত নক্র শিশুর মত ঝাঁপটিয়া বেড়াইতেছে। গাছগুলি গভীর তলদেশের গুপ্ত পর্ব্বতশ্রেণীর মত বিরাট শাখাপ্রশাখা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বীভৎস অন্ধকারের মাঝে একটী আর্দ্র গন্ধ সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। রসিক

একখানা ভাঙ্গা দা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল আছাড়ি না থাকিলেও দা খানায় ধার আছে। পঙ্কিল পিছল পথে পা টিপিয়া টিপিয়া সে নামিয়া আসিয়া হালটে উঠিল। বৃষ্টি চট্‌পট্‌ করিয়া তাহার পিঠের উপর পড়িতেছে। কাপড়খানাকে শক্ত করিয়া পরিয়া সে যাইতে চাহিল কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বিদ্যুৎ চমকের আলো এই বৃক্ষছায়ায় ঘনান্ধকার পর্য্যন্ত যেন পৌঁছায়ই না। একখানা কলমকাটা কঞ্চি পায়ের একটা অংশে যেন খানিকটা ঢুকিয়া গেল। বেদনাটা যথেষ্ট না হইলেও অল্প নয়, টিপিয়া একটু রক্ত বাহির করিয়া দিয়া সে আবার চলিল।

চলিতে চলিতে কি যেন একটা গায়ে বাধিয়া ছড়িয়া গেল—বেতের শিস্‌। কয়েকটা কাঁটা ভাঙিয়া দেহের মাঝে রহিয়া গেল। আশে পাশে হাত দিয়া দেখে বেতবন, যাইবার পথ নাই—কেমন করিয়া সে এখানে আসিল! বসিয়া বসিয়া সে হাতড়াইতে লাগিল—কিন্তু পচা গাছের পাতা এবং আগাছার জঙ্গলে কোন্‌টা পথ তাহা ঠিক করা গেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাইল না। কি যেন একটা জানোয়ার ভিজা বন ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল, সম্ভবতঃ শিয়াল না হয় খাটাস। উপরে কোন একটা বৃক্ষের ডালে একটা নেউল ঝাঁপ দিল, কয়েক ফোঁটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল গায়ে আসিয়া পড়িল। হাতের একটা স্থানে চুলকাইতেছে—একটা চিণা জোঁক রসিকের অভুক্ত দেহ হইতে রক্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেটাকে ফেলিয়া দিয়া আপন মনে কহিল—দূর শালা।

বিদ্যুৎ চমকাইল। পথপার্শ্বের একটা জঙ্গলে সে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—পুনরায় পথ ধরিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। নদীর ধারের পথটা যেন একটু আলোকিত—একখানা নৌকা ঘাটে বাঁধিয়া আছে। তাহার

মাঝিরা, না হয় আরোহিগণ মৃদুকণ্ঠে কোনরূপ আলোচনা করিতেছে।

রসিক দত্তমশায়ের পুকুরের পাড় দিয়া বাড়ীর পিছনে তাল-গাছটার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। একটা কক্ষে আলো জ্বলিতেছে, জানালাটা ঈষৎ উন্মুক্ত। একটা স্থানে একটা ছিদ্র আছে—সে চোখ দিয়া দেখিল—

দত্তমশায়ের পুত্র ও পুত্রবধূ এই ঘরে রহিয়াছে। বধূ প্রায় অর্দ্ধনগ্ন দেহে স্বামীর বুকের মধ্যে শুইয়া কি যেন কহিতেছে, স্বামী হাসিয়া হাসিয়া কি যেন প্রশ্ন করিতেছে। বধূটির গৌর সুন্দর যৌবনোজ্জ্বল দেহখানার প্রতি একটু দৃষ্টি বুলাইয়া সে মনে মনে খুশী হইল। মনে মনে তারিফ করিল—এমনি না হলে ভদ্দরলোকের বৌ।

শিয়রে একটা টেবিলে ডিবায় পান রহিয়াছে—বধূ আদরে পান খাওয়াইয়া দিয়া কি একটা আব্দার করিল, বৃষ্টির শব্দে তাহা শোনা গেল না। রসিক মনে মনে হাসিল—নবতম প্রেমের এই আতিশয্য দেখিয়া!

ফিরিয়া আসিয়া আমগাছের তলায় ঘনান্ধকারে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল কিন্তু আলো তবুও নিভিল না। রসিক আবার উঠিয়া গেল—তাহারা তবুও গল্প করিতেছে। রসিক প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। মনে মনে গালাগালি দিল—শালারা এখনও প্রেম চালাচ্ছে!

রসিক ইচ্ছা করিয়াই জানালাটা ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিল কিন্তু জানালাটায় কেন শব্দ হইল তাহা কেহ দেখিতে উঠিল না। তাহার রসিকতাটা একেবারেই বৃথা গেল। সে তাই পুনরায় তিরস্কার করিল—এঁ্যা একেবারে মস্‌গুল! চোর এয়েছে তাও দেখ্‌তে বেরুনোর সময় নাই।

রসিক চলিয়া আসিল। আবার পিছল পথে খানিক চলিয়া বোস-মশায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। নিঝুম বাড়ীখানা, কেহই জাগিয়া নাই। নিবিড় অন্ধকারের মাঝে বাড়ীখানা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—বোস-মশায়ের গভীর নাসিকাধ্বনি বাহির হইতেই শোনা যায়। বাড়ীখানি পরিক্রমা করিয়া রসিক নিশ্চিন্ত হইল—সকলেই ঘুমাইতেছে।

রান্নাঘরখানা খড়ের। দরজায় একটা তালা দেওয়া, রসিক অপেক্ষা না করিয়া দায়ের লেজের মোড়া দিয়া তালাটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ঘরের মাঝে অন্ধকার কিন্তু একটা বিদ্যুৎ চমকে সে ঘরের সমস্ত দেখিয়া লইল। হাঁড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেখে তাহার মধ্যে ভাত রহিয়াছে—তখনও কবোষ্ণ। একগ্রাস খাইয়া দেখে খিচুড়ী।

খিচুড়ীর গন্ধ যে এত সুন্দর, তাহার স্বাদ যে এত উপাদেয় তাহা রসিকের কাছে স্বপ্নাতীত। সে গোগ্রাসে কয়েক গ্রাস মুখে পুরিয়া দিয়া বসিয়া পড়িল—পেটের মাঝে বেদনা করিয়া উষ্ণ একটী তরল পদার্থ ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়া সে খাইতে লাগিল—হাতড়াইয়া দেখে বাটিতে কি যেন একটা পদার্থ আছে—কামড় দিয়া দেখে ডিম ভাজা। অত্যন্ত সুস্বাদু—রসিক খাইতে খাইতে একটা অভূতপূর্ব্ব আরাম বোধ করিতেছিল। মনে মনে ভাবিল,—ইহার একটু যদি কুসুমের জন্য লইয়া যাওয়া যাইত! কিন্তু না—ফুরাইয়া গিয়াছে! আর কুসুম কি চুরি করা জিনিষ খাইবে!

খাইতে খাইতে গলায় বাধিয়া যাইতেছে—রসিক দেখিল, জলের অভাব নাই। মেটে কলসীতে জল রহিয়াছে, মুখ লাগাইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া সে খানিক জল খাইয়া ফেলিল। মনে মনে হাসিয়া ফেলিল—পানের ডাবরটা এ ঘরে থাকিলে হইয়াছিল আর কি?

রসিক ভিজা কাপড়ে হাতটা মুছিয়া কার্য্যান্তরে মন দিল। ঘরে

এঁটো থালা প্রায় খানছয়েক আছে, বাটি ও গ্লাসের পরিমাণ অনুরূপ। সেগুলিকে মাথায় করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। গ্রামের প্রান্তে একটা এঁদো পুকুর ছিল, সেটা প্রায় জলে ভরিয়া গিয়াছে—রসিক একটা কিছু স্থির করিয়া সেই দিকেই চলিল।

এঁদো পুকুর কচুরীপানায় ভরিয়া রহিয়াছে—একটা গাছ নিশানা করিয়া রসিক গলাজলে নামিয়া পড়িল এবং থালা কয়েকখানা রাখিয়া উঠিয়া আসিল। যাহা হউক এক ডুবেই তোলা যাইবে। এটা গ্রামের প্রান্তে—সহসা কেহ নামিবে না।

বাড়ীর পথে হাঁটিতে হাঁটিতে সে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল—যাক্ কাল রাত্রে ব্যবস্থা করা যাইবেই।

কুসুম তেমনি ঘুমাইতেছে—হয় ত উঠে নাই। রসিক নিঃশব্দে দরজা দিয়া শুইতে গেল। হঠাৎ কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গিয়েছিলে?

—তোর তা দিয়ে দরকার? চুপ ক'রে ঘুমো।

—চুরি করেছ?

রসিক কহিল—না, চুরি ক'রবো কেন? আমি কি চোর?

—না, ত্যাখো, চুরি ক'রলে তোমার কাছে আমি থাক্‌তে পারবো না, উপোস সহ্য হবে কিন্তু লোকের ওই নিন্দা সহ্য হবে না।

—হ্যাঃ, সব শালাই সাধু। যা মেয়েমানুষের অত খোঁজ কেন? ঘুমো।

কুসুম আর কিছু কহিল না, একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া ফিরিয়া শুইল।

*

সেদিন রহিয়া বহিয়া বৃষ্টি হইতেছিল কিন্তু শীঘ্রই আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে এমনি একটা আভাষ পাওয়া যাইতেছে। কুসুম সকালে উঠিয়া দাওয়ায় বসিয়াছিল—দেহের মাঝে একটা কেমন যেন সুখকর অস্বস্তি বোধ করিতেছে, একটা অকারণ বিবমিষা রহিয়া রহিয়া উদ্‌ব্যস্ত করিতেছে। উদরের গভীর তলদেশে ছোট্ট একটি মাছের মত, চীনা পুতুলের মত ক্ষুদ্র একটু জীব যেন নড়াচড়া করে—মনে হয় কোন একটা অদৃশ্য তন্ত্রীকে সে দুই হাতে ধরিয়া জীবনরস পান করিতেছে—হয় ত অপরিণত মুখে তৃপ্তির হাসি হাসিতেছে। কুসুম চোখ বুজিয়া তাহা যেন অনুভব করে, তাহার দেহের রস রক্ত মেদ যেন নবরূপে অঙ্কুরিত হইতেছে—দেহে যেন নূতন জীবন সঞ্চার হইয়াছে। কিসের একটা অনুভূতি ঐ অদৃশ্য অজ্ঞাত বস্তুটিকে যেন বড় আপনার করিয়া তুলিয়াছে।

চলমান ঐ মাংসপিণ্ডটি একদিন বড় হইবে—পূর্ণ অবয়ব মানুষে পরিণত হইবে। গুরুচরণের মত বাবরী চুলে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে মেষের পিছু পিছু ছুটিবে। বারমাসী গান গাহিয়া মাঠে বাইবে, হাসিবে, কাঁদিবে, ভালবাসিবে—কুসুমের মত কত জন তাহার শ্যাম সুগঠিত দেহটিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখিবে। তাহার মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব, সুখ দুঃখ সমস্তই দেখা দিবে। তাহারই উদরের নিভৃত কোণে সৃষ্টির এই গভীরতম রহস্যের ইন্দ্রজালে নূতন সৃষ্টিকার্য্য চলিয়াছে—কুসুম যতই অনুভব করে ততই যেন মুগ্ধ হইয়া যায়।

তবুও একটা শারীরিক অসুস্থতা, ভবিষ্যতের একটা অত্যাসন্ন দুর্ভাবনা এবং উদ্বেগ তাহাকে যেন দুঃখিত করিয়া তুলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রাণীটির দুর্লভ হাত হইতে নিষ্কৃতি চাই—নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে অথবা নিষ্কৃতি পাইতে হইবে মনে করিয়াই যেন ব্যাকুল হইয়া

উঠিয়াছে। কুসুম শিহরিয়া উঠে—কিন্তু সমাজ-কলঙ্ক তাহাই বা কেমন করিয়া সে সহ্য করিবে। লোকে কি বলিবে—অথচ বার-বার নানা সুখস্বপ্ন যেন তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিয়া যায়।

রসিক সকালে উঠিয়া কোথায় যেন গিয়াছিল—এতক্ষণে ধামায় করিয়া চাউল তৈল প্রভৃতি নানা সওদা লইয়া ফিরিল। একটু উল্লাসের সহিত কহিল—নে ভাল করে রাঁধ কুসুম, দেখি দোয়াড় দু'টোয় কিছু পাওয়া যায় নাকি!

--কোথায় পেলে এসব?

—থালা বিক্রি করে, আজ ত খাই, তারপরে পাট হ'লে আবার কিন্‌বো। হ্যাঁ, আর একটা কথা তোকে বলি, রাঙাদিকে টাকা দিয়ে এসেছি কালই কিন্তু সে আস্‌বে। যা বলে ঠিক ঠিক যেন করিস্‌।

কুসুম একটু ভীতভাবে কহিল—আমার যে বড্ডো ভয় করছে—

রসিক সাহস দিয়া কহিল—ভয় কিরে! কত জনই ত করে, আর রাঙাদি বহু ক'রেছে কাজেই বেশ পারবে। জানিস্‌, ওকে দেশ-দেশান্তর থেকে লোকে নিতে আসে।

কুসুম কোন সান্ত্বনাই পাইল না, একটা অনাগত বিপদের আশঙ্কায় তাহার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। হয়ত কত কষ্ট হইবে, কত বেদনা সহ্য করিতে হবে। আর ওই ক্ষুদ্র প্রাণীটি, সে যেন কি করিবে—

রসিক কুসুমের দিকে না চাহিয়াই দোয়াড় দেখিবার জন্যে নদীর ঘাটে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে আহারান্তে রসিক বসিয়া বসিয়া 'সলা' চাছিতেছিল—কুসুম তাহাকে একটা সুরচিত পান দিয়া প্রশ্ন করিল—টাকা কোথায় পেলে? রাঙাদির টাকা!

রসিক পান চিবাইতে চিবাইতে কহিল—মেয়েমানুষ তুই,—তোর ওসবে দরকার? আত্মীয় কুটুম কি আমার থাকতে নেই?

টাকা যে কি করিয়া এবং কেন সংগৃহীত হইয়াছে তাহা কুসুম বুঝিযাছিল। কুসুম ব্যথিত ভাবে কহিল—অমনি টাকার দরকার নেই, ভারা ভেনে এ মাস চালিয়ে দেব। অত ভাবনা কিসের?

রসিক তাহার দিকে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া আবার নিবিষ্ট মনে কাজ করিতে লাগিল। কুসুম দাওয়ায় বসিয়া সুদূর আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। সে যেন স্পষ্ট অনুভব করে—তাহার দেহের কোন এক গভীরতম প্রদেশে ভগবানের সৃষ্টিকার্য্য চলিয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় একটি অতিক্ষুদ্র পরমাণু তাহার রক্তমেদমজ্জা শোষণ করিয়া ধীরে ধীরে বড় হইয়া উঠিতেছে—একদিন পৃথিবীর আলোয় আসিয়া পূর্ণ-মানবাকারে ভগবানের ঈপ্সিত কার্য্য করিয়া যাইবে। ঐ ক্রমবর্দ্ধমান পরমাণু যেন ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত স্নেহ-সুধা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিয়াছে—সে ইচ্ছাকে, সে আকর্ষণকে সে কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছে না। বার বার তাহার মনে হয় যাহা আসিতেছে তাহা দুর্লভ, তাহা ব্যতীত তাহার জীবন অসম্পূর্ণ। নানা সুখস্বপ্ন তাহার অন্তরকে সুবাসিত করিয়া দেয়—দত্তমশায়ের নাতির মত দুরন্ত, 'দাতি' লইয়া কুকুর তাড়া করে, 'নিনি' অর্থে নিড়ানী লইয়া সমগ্র উঠানে গর্ত্ত করিয়া বেড়ায়—পিসিমার পিছন পিছন ঘুরে আর বলে 'পিমা' আর মাঝে মাঝে সোল্লাসে মাতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কহে—মা, মা, ডুডু—

কুসুম দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—থাক্, কাজ নেই।

—কি, কাজ নেই?

—'রাঙাদির এসে দরকার নেই।

রসিক বিস্মিতভাবে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া কহিল—তারপরে, তুই কি ক'রবি ?

কুসুম ভীতকণ্ঠে জবাব দিল—ভগবান যাকে পাঠিয়েছেন তাকে তুমি ফিরিয়ে দেবে কেন ? কাজ নেই রাঙাদির দিয়ে—

রসিক মুখ ভেংচাইয়া কহিল—কাজ নেই! ভগবান পাঠিয়েছেন—মুখ দেখাবি কি ক'রে ? আমি বা মুখ দেখাবো কি ক'রে ? মলে যে শেয়াল শকুনে খাবে, কেউ ছোঁবে না তোকে—

কুসুম হাসিল। ধীরে ধীরে কহিল—মরেই যদি যাই তবে শেয়ালেই খাক্, আর আগুনেই থাক্ এক কথা—

—তোর কি ? আমাকে যে একঘরে করবে।

—আমি তোমার বাড়ী থাকি ব'লে করে না ?

রসিক কহিল—না, পাড়ায় ত কতই আছে তোর মত, কিন্তু শুনেছিস্ ছেলে-পুলে হয় ?

কুসুম আবার হাসিয়া কহিল—রাখ্‌লে দোষ নেই ওইটেই দোষ ? কেন ?

রসিক অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে অশ্লীল কয়েকটা গালাগালি দিয়া কহিল —তুমি একেবারে 'কুদি' কিচ্ছু বোঝো না—যা মোড়োলদের কাছে শুনে আয় শালী—

কুসুম আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। রসিক উত্তেজিতভাবে কলিকাটায় আগুন দিয়া ঘন ঘন টানিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে কুসুম ভয়ে ভয়ে কহিল—একঘরে হ'য়ে থাক্‌তে ভয় করে ? আমার কিন্তু করে না—চল আমরা অন্য গাঁয়ে চলে যাই—দূরে যেখানে কেউ জান্‌বে না।

রসিক পুনরায় গালাগালি করিয়া কহিল—তোর বুদ্ধিতে খাই কিনা, পাড়ায় এত লোক তোর মত থাক্‌তে কেউ একঘরে হয় না, আমি হবো

কেন রে? সকলেই ত করে, রাঙাদি তেজারতী করে কিসের জোরে, জমি আছে, না চাষ করে?

কুসুম চুপ করিয়া রহিল। বুকের মাঝে রুদ্ধকণ্ঠ একটা ক্রন্দন যেন ধ্বনিয়া উঠিল—হায়! ওই শিশু কি কাহারো কাছে কোনদিন নালিশ করিবে না? এমনি করিয়া পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ হইতে বঞ্চিত হইয়া সে কি অভিমান করিয়া, অভিশাপে এই জীর্ণ সমাজকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে না। ভগবানের দানকে যাহারা এমনি করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে!

কুসুমের চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল—একটা দুর্ব্বহ আশঙ্কা, একটা অনিবার্য্য অভিসম্পাত সে যেন মনে মনে বরণ করিয়াই ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

কুসুমের যেন মনে হয়, কাণে কাণে কে যেন কহে—মা! অত্যন্ত সংগোপনে, অত্যন্ত হ্রস্বকণ্ঠে সে যেন কাণে কাণে ডাকিয়া যায়; আর রসিক যেন দুর্ব্বার হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দেয়। ভয়ে আশঙ্কায় দুঃখে সে ঘুমের মাঝে, মাঝে-মাঝে চমকাইয়া উঠে—রসিক তেমনি বাহিরে বসিয়া 'দোয়াড়' মেরামত করিতেছে—নিরুদ্বিগ্ন নির্ব্বিকার স্নেহহীন মমতাহীন পাষাণমূর্ত্তির মত,—বাষ্পচালিত যন্ত্রের মত সমাজের নির্দ্দেশে কাজ করিয়া যায়, কোন প্রতিবাদ করে না। যন্ত্রের মত কোন অসতর্কতা, কোন হৃদয়কে মার্জ্জনা করে না। রসিক যেন রক্ত-মাংসহীন যন্ত্র—প্রাণহীন, হৃদয়হীন।

বোস মহাশয় সকালে ভিজিতে ভিজিতে দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দত্ত মহাশয় অভ্যর্থনা করিলেন—এসো ভায়া এসো। কি খবর ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে—

—আর ভাই সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে রান্নাঘরে এঁটো বাসন ছিল সব চুরি হয়ে গেছে।

—কাল রাত্রে? হ্যাঁ, রাতটা চোরের রাত্রিই ছিল। বড় ঘরে সেঁধোয় নি ত?

—না, তবে চোরটা আবার হাঁড়ি থেকে খিচুড়ীও খেয়ে গেছে। সব গেল—জাত জন্ম। কি জাত না কি জাত এখন সে হাঁড়ি কে ছোঁয়?

—হ্যাঁ, চোর যদি জাতটাও ব'লে যেতো! দত্ত মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন।

—তুমি ত হাস্‌বেই, উঃ কতকষ্টে থালাবাটি ক'খানা ক'রেছিলাম। বুকের মাঝে যেন চিড়খেয়ে গেছে। দেখি থানায ত একটা ডাইরী করি।

দত্ত মহাশয় সাংসারিক লোক, লাভ ক্ষতি হিসাব করিয়া কহিলেন—কোন লাভ নেই। থালা বাসন যা গেছে তা ত' ফিরে পাবেই না, লাভের মধ্যে দারোগা কনেষ্টবল খাওযাতে খাওয়াতে আরও কিছু যাবে। ওর মাঝে যেও না। সাবধান হ'যো তা হ'লেই হবে।

—তবুও—

—তবুও কি ব'লছো, দাগীগুলোকে ক্ষেপালে চুরি আরও বাড়বে বই ক'মবে না। পুলিশে কি ক'রবে?

—কিছুই ক'রবো না?

—করো—গিন্নির গলা ধরে কাঁদো গিয়ে, আর কি ক'রবে।

দত্ত মহাশয়ের সহিত আলাপে থালা বাটি হারাইবার শোকটা যেন একটু প্রশমিত হইয়া গেল। ভগবান দিলে যে উপায়ে গিয়াছে, অনুরূপ কোন উপায়ে পুনরায় আসিতে পারে—অন্ততঃ বন্দকী বাসন কিছু হইয়া যাইবে তাই বোস মহাশয় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—ভগবান দিয়েছিলেন তিনিই নিয়েছেন—আবার কৃপা হ'লে দেবেন।

দত্ত মহাশয় হাসিয়া কহিলেন—ভগবান অন্য সময় না হোক আষাঢ় মাসে একটু সজাগ থাকেন, হ'য়ে যাবে ভাই কোন চিন্তা ক'রো না। পুলিশ ফুলিশ ডেকে আর খরচা ক'রো না। আস্‌বে ভাই, যেমন ক'রে গেছে তেমনি ক'রেই আস্‌বে।

দত্ত মহাশয় যে কথাটার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহা বসু মহাশয়ের প্রীতিকর না হইলেও তিনি নিরুপায় ভাবে তাহা সহ্য করিলেন এবং কথাটা ফিরাইয়া দিবার জন্যে কহিলেন—তোমার ভক্তের অভাব নেই। তাই ভগবানের কৃপা হয় কিন্তু আমার ভক্তই নেই।

দত্ত মহাশয় একটু উষ্মাসহকারে কহিলেন—চোরাই থালা হয় ত আট আনায় কিনেছ তার জন্যে এত শোক কেন? কিন্তু পুলিশ এনে খামকা তাল বাড়িও না। ব্যবসা মাটি হবে—

কে যেন বারান্দায় ছাতা নামাইয়া রাখিয়া ঘরে ঢুকিল। দত্ত মহাশয় সোৎসাহে কহিলেন—এই যে নবীন যে! কবে এলে?

—এসেছি কাল। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলে।

—ভাল হ'য়ে গেছে সব?

—হ্যাঁ, কিন্তু হাঁটুতে যেন একটু টান লাগে, একটু খুঁড়িয়ে চ'ল্‌তে হয়।

—হোক্ সেরে যাবে, ওরকম হয়। এসো বসো তামুক খাও। কিন্তু যে রসিক ব্যাটা এমনি খুন ক'রতে পারে তাকে জেলে পাঠাতেই হবে।

বোস মহাশয় প্রতিবাদ করিলেন—জেলে পাঠানো কি অত সোজা দত্ত! আমার প্রজা, একটু লড়াই ক'রতে হবে—

—লড়াই—ক'রতে হয় ক'রব, তোমার ভয়ে গর্ত্তে যাবো নাকি? জমিজমা রক্ষা ক'রতে হবে। নবীন কহিল—কেন রাগ ক'চ্ছেন দত্তমশাই, ওরা ত অপরাধ করে নি। ভুল করেছে—

দত্ত মহাশয় কহিলেন—ধর্ম্মকথা আখড়ায় গিয়ে ব'লো নবীন। অপরাধী

যদি শান্তি না পায় তবে কি গ্রামে থাকা যাবে—আজ জোর ক'রে ধান কাট্‌লে, কাল মাথা কাট্‌বে—

নবীন একটু হাসিয়া কহিল—হঠাৎ একটা জিদ, একটা রাগের মাথায় ক'রে ফেলেছে তার জন্যে কি রাগ করা যায় দত্তমশাই। আর ওরা ত ছেলে মানুষ, মেয়ে মানুষ নিয়ে একটু কেঁজে দাঙ্গা ত ক'রবেই—

দত্ত মহাশয় কহিলেন—এই যে তোমাকে জন্মের মত খোঁড়া ক'রে দিলে, এত কষ্ট পেলে, এতেও কি রাগ হয় না। এটা কি ভাল হ'ল, এর পরে বাড়ীবাড়ী মেগে খাবে কি ক'রে!

নবীন হাসিয়া উঠিল—জন্মের মত আর কি খোঁড়া ক'রবে, মেয়াদ খুব অল্পই বাকী! আর রাগ সত্যিই নেই। ছেলে মানুষ ও রকম ক'রে থাকে।

দত্ত মহাশয় দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, বৃদ্ধাঙ্গুলিটি দ্বারা একটী অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া কহিলেন—করুক। তোমার···। বেশ, কিন্তু আমার প্রজার ধান কাট্‌বে সে—এত বড় স্পর্দ্ধা!

—আর কাট্‌বে না, মিটিয়ে ফেলুন!

দত্ত মহাশয় হুঁকাটাকে নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন—বুঝেছি নবীন। আমার চুলও সাদা হ'য়েছে। বোসের টাকা খেয়ে যদি সাক্ষী গোলমাল কর, তবে ভাল হবে না নবীন ব'লে রাখছি।

নবীন হাসিয়া কহিল—টাকা খেয়ে! টাকায় আমার কি দরকার দত্তমশায়। সংসারে যার কেউ নেই—

বোস মহাশয় এতক্ষণ শুনিতেছিলেন কিন্তু প্রজাহিতৈষণার ধর্ম্মবুদ্ধিতে অকস্মাৎ যেন অনুপ্রাণিত হইয়া কহিলেন—দত্ত, ছাখো, বোস টাকা দিয়ে সাক্ষী কেনে না—সত্যি কথা ব'লবে তাতে যা হয় হবে। নবীন সত্যি কথা ব'লো—

—হ্যাঁ! যুধিষ্ঠির সব! তুমি, নবীন বোরেগী।

নবীন হাসিয়া কহিল—পাপী ত দত্তমশায় বটেই কিন্তু টাকা দিয়ে কি ক'রবো? তবে ওরা যদি জেলে যায়—রসিক কি গুরুচরণ কোনটাই যে সয় না!

প্রজাহিতৈষণার এতটা দুর্ব্বার বাসনায় দত্ত মহাশয় সহসা যেন ক্ষেপিয়া গেলেন—নবীন ও বোস মহাশয় উত্তেজনাকে না বাড়াইয়া বৃষ্টির মধ্যেই প্রস্থান করিলেন।

*

সেদিন সকালে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল কিন্তু আকাশ মেঘ-মেদুর। মাঝে মাঝে শীতল আর্দ্র বাতাসে শরীরের মাঝে কেমন একটা ঠাণ্ডা অশ্বস্তি বোধ হয়। বিবস্ত্র দেহের মাঝে যেন শীত শীত করে। রসিক সকালে উঠিয়া বসিয়া মৎস্য ধরিবার সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেছিল। দুশ্চিন্তার কিছু নাই, গৃহে যে খাদ্য সঞ্চিত হইয়াছে তাহাতে আরও কিছুকাল নির্ব্বিঘ্নে যাইবে।

রাঙাদি কতকগুলি শিকড়, দু' চারটা বটিকা, এবং আট অঙ্গুলি পরিমিত একখানা বৃক্ষের শীর্ণশাখা লইয়া আসিয়া কহিলেন—অঃ রসিক নে, আজই ত দিন হ'ল। ও কুসুম কোথা?

কুসুমের বুকের মধ্যে হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল—অন্তরের কোণে যেন একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল কিন্তু ঝ'ড়ো বাতাসে যেন নিবু নিবু হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ নিভিয়া একটা শ্রীহীন গন্ধে সমস্ত অন্তরাকাশ ছাইয়া যাইবে। কুসুম কোন জবাব দিল না।

রসিক কহিল—ঘরে আছে।

রসিকের অন্তরও একটা শঙ্কা ও উদ্বেগে অত্যন্ত অশ্বস্তি বোধ করিতেছিল। আগতপ্রায় কোন ভগবানের ইচ্ছাকে সে যেন ফিরাইয়া

দিতেছে এমনি একটা পাপের কণ্টক যেন সর্ব্বদাই হৃদপিণ্ডটাকে বিদ্ধ করিয়া রক্তাক্ত করিয়া দিতেছে। রসিক তবুও আনমনে কাটারি দিয়া 'সলা' চাছিতেছিল।

ঘরের মধ্যে রাঙাদি যেন কি একটা করিতেছে। একটু মন্ত্রপুত শিকড় কুসুমের চুলে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এই পর্য্যন্ত সে দেখিয়াছে তাহার পর কাণ ঘরের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়াছে মাত্র। কুসুম মাঝে মাঝে এক একটা কাতরোক্তি করিতেছে—রাঙাদি ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন কহিতেছে।

হঠাৎ কুসুম চীৎকার করিয়া উঠিল—উঃ—উঃ আর না আর না, উঃ আর পারি না।

রসিক চুপ করিয়া ভাবিতেছিল—এমনি একটা ভয়াবহ চিকিৎসা নৈপুণ্যের ফলে গঙ্গাচরণের বিধবা মারা গিয়াছিল—ভুষ্টুর বিধবা চিরদিনের মত রুগ্ন হইয়াছিল, ছয়মাস ভুগিয়া পচিয়া গলিয়া মারা গিয়াছিল। কুসুম যদি অমনি করিয়া···এ···রসিক আর ভাবিতে পারে না। অমনি সুন্দর সুকোমল দেহ, ও কি এমনি হইবে। আহা! কত কষ্টে, কত উপবাস করিয়া পরের বাড়ী ভারা ভানিয়া সে তাহাকে খাওয়াইয়াছে। এমনি করিয়া সে একদিন তাহার নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে কাতরোক্তি করিয়াছিল—আর যে পারি না। কিন্তু কোন অভিযোগ করে নাই, কোন প্রতিবাদ করে নাই। কেন তাহাকে মারিলাম! যদি এমন কিছু হয়—

রসিকের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল, কাটারি কোন পথে চলিতেছে তাহা বোঝা যাইতেছে না। কাটারি থামাইয়া চোখ পরিষ্কার করিয়া লইল। রাঙাদি যেন কত কষ্ট দিতেছে—না জানি, কত বেদনায়ই কুসুম এমনি সজল আর্ত্তনাদ করিতেছে।

রসিক মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিল—হায়, কুসুম যদি তাহার স্ত্রী হইত! কেন সে এত অল্প বয়সে বিধবা হইল! কত জায়গায় ত বিধবা বিবাহ হয়, তাহার হইল না কেন? তাহাদের সমাজে নাই কেন? একঘরে হ'লেই বা কি?

রসিক অত্যন্ত নিরুপায়ের মত, আপনার সমস্ত আত্মনির্ভরতাকে অবিশ্বাস করিয়া, পৌরুষকে অস্বীকার করিয়া, অজ্ঞাত অদৃশ্য মহাশক্তির পায়ে মাথা নোয়াইয়া মনে মনে কহিল—ভগবান ওর ভাল ক'রো, আমি কালীপূজো ক'রবো মানত ক'রছি।

তখনও মাঝে মাঝে কুসুমের সবিনয় হ্রস্ব এক একটু আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছে। রসিক আর সহ্য করিতে পারিল না, প্রশ্ন করিল—কি রাঙাদি? কি হ'য়েছে!

—কি আবার হবে। কুসুম তোমার ননীর পুতুল, ফুলের ঘায় মূর্চ্ছো যান। কত শত ক'রলাম এমন চেঁচাতে ত দেখিনি কোন দিন। ছিঃ ছিঃ শেষে আমার জাত জন্ম যাবে, লাকে কি ব'লবে—

পরাজিত শত্রু যেমন করিয়া প্রাণ ভিক্ষা করে, তেমনি করিয়া রসিক কহিল—রাগ ক'রো না রাঙাদি। ও ত এমনি কষ্ট করে নি কোনো দিন। ঘরে এনে ত সুখী ক'রতে পারি নি, তুমি আর কিছু ব'লো না—

রাঙাদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া কহিল—কেন? কি বলেছি?

কার্য্যান্তে রাঙাদি যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল। কহিল—এক দিনরাত এমনি শুয়ে থাক, কাল সকালে এসে যা হয় ক'রবো।

বৈকালে বোস মহাশয় সংবাদ দিলেন, কল্য মোকর্দ্দমার দিন, সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে, না গেলে মোক্তার জামিন জব্দ হইবে এবং তাহারও জেল হইবে। রসিকের না যাইয়া উপায় নাই

আসন্ন বিপদ যতই গুরুতর হোক, যাইতেই হইবে। গেলে যে ফিরিয়া আসা যাইবে এমন নয়, যদি মোকর্দ্দমায় শাস্তি হয় তবে হয়ত ছয়মাসের মধ্যে আর আসা হইবে না।

রসিক চিন্তান্বিত হইয়াছিল বটে কিন্তু মনে মনে ঠিক বুঝিয়াছিল যে যাইতেই হইবে। ঘরে কুসুম পড়িয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। মেঝের মাদুরের উপরে শায়িত কাপড়ে ঢাকা যে দেহটা মাঝে মাঝে বেদনায় কাঁপিয়া উঠিতেছে তাহা হয়ত চিরদিনের মত নিস্তেজ হইয়া যাইবে—হয়ত নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে। এমনি অসময়ে সে কাছেও থাকিতে পারিবে না।

প্রত্যুষে রসিককে যাইতে হইবে। রসিক উঠিয়া দরজা খুলিতেই এক ঝলক প্রভাতের অস্বচ্ছ আলোক ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। মেঘমেদুর জ্যোৎস্না রাত্রের মত আধা আলোয় রসিক দেখিল—শুভ্র বস্ত্রখানার খানিকটা যেন অন্ধকারময়, মনে হয় পিচের মত কালো। এ আলোয় সাদা আর কালো ভিন্ন অন্য রং বোঝা যায় না।

রসিক ডাকিল—কুসুম, কুসুম, কেমন ঠেক্‌ছে রে ?

অন্ধকারে কুসুমের মুখ দেখা গেল না তবে কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল যে সে দুর্ব্বল। হাসিয়া হাসিয়া সে কহিল—ভাল ঠেকবার ত কথা নয়। এক রকমই—

রসিক হাত মুখ ধুইয়া পান্তা ভাত খাইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কয়েকটা কথা বলিবার জন্য তাহার মন ছটফট্ করিতেছিল, সে তাহাই কহিবার জন্য ঘরের মধ্যে গেল। এতক্ষণে নবাগত ভোরের আলো স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। আতঙ্কের সঙ্গে সে অস্ফুট শব্দ করিল—রক্ত !

কুসুমের মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায়—রক্তহীনতাবশতঃ যেন পাংশু বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুসুম একটু স্মিত হাস্যে কহিল—কই না !

রসিক মাদুরের পাশে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—কি ক'রবো রে কুসুম।

যেতে ত হবেই, তোর কত কষ্টই না হবে! যদি জেল হয় তবে হয়ত ছ'মাসেও আর আসা হবে না। শেষ কয়েকটা কথা কহিতে কহিতে রসিকের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে থামিয়া গেল।

কুসুম সহানুভূতি জানাইয়া কহিল—না, জেল হবে কেন ?

রসিক একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—গাইটাকে দেখিস্, যদি আর না আসি। আর বাড়ীটায় গাছ-পালা আছে ওরা ফল দেবে—

রসিক আবার থামিয়া গেল। কুসুম কহিল—ভয় নেই, যদি বাঁচি, ওদেরও বাঁচিয়ে রাখবো।

রসিক কুসুমের মাথায় হাত রাখিয়া, সযত্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—কেমন ক'রে যাইরে কুসুম!

এতক্ষণের সমস্ত সংযমকে উপেক্ষা করিয়া রসিকের চোখ দুইটি অশ্রু-প্রলেপে আর্দ্র হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া বিপন্ন কুসুমকে ফেলিয়া সে যাইবে!

কুসুম সান্ত্বনা দিল—ভয় নেই, তুমি যাও।

রসিক একটু ইতস্ততঃ করিয়া, চোখ মুছিয়া লইয়া কহিল—যদি জেলই হয়, আর যদি তোর ইচ্ছে হয় তুই গুরোর ওখানেই না হয় থাকিস্। আমি ফিরে আস্‌লে ইচ্ছে হয় আসিস্ না হয় নাই আসিস্।

রসিক একটা আশঙ্কায়, কুসুমকে সারাজীবনের মত হারাইতে বসিয়াছে এমনি একটা ব্যথায় কাতর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে ভাবিল, ছয়মাস জেলে থাকিয়া যখন ফিরিবে তখন আসিয়া হয় ত দেখিবে এঘর শূন্য, এ বাড়ী শূন্য। চৈত্রের ধূসর পাণ্ডুর মাঠের মত নিষ্ঠুর শুষ্কতায় উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেখানে তাহার মনের মানুষটি দিবারাত্রি নিরাকার শরীরে আসা যাওয়া করিবে।

কুসুম কহিল—ভয় নেই, তুমি যাও কিচ্ছু হবে না।

রাঙাদি উঠান হইতে ডাক দিলেন—অ কুসুম, কেমন আছিস্? তুই কোথা যাবি রে রসিক?

রসিক কহিল—মোকর্দ্দমার দিন আজ। সহরে যাবো।

রসিক উত্তেজিত হইয়া ছিল। রাঙাদির পা দু'টিকে অযাচিত ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—রাঙাদি, আমি চল্‌লাম, হয় ত জেলে যাবো কিন্তু তুমি দেখো কুসুম যেন কষ্ট না পায়। ফিরে এসে তোমার দেনা সুদ সমেত শোধ ক'রবো দিদি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বলো, কুসুমের ভার নিলে—

রাঙাদির কথার যে কি মূল্য, তাহার প্রতিশ্রুতি যে কতখানি নির্ভরযোগ্য তাহার সবই রসিক জানিত. তবুও ডুবিবার পূর্ব্বে মানুষ যেমন অকিঞ্চিৎকর তৃণখণ্ডকেও পরম নির্ভরযোগ্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, রসিকও তেমনি করিয়া রাঙাদির অত্যন্ত অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতিটির জন্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

রাঙাদি কহিলেন—রসিক পা ছাড়, আমি ত তোর পর নয়। কুসুমকে আমি থাক্‌তে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমি যদি বেঁচে থাকি কুসুমও বেঁচে থাক্‌বে। যা তুই সহরে, তোর জয় হোক। আজই ফিরে আস্‌বি ভয় কি? পুরুষের দশ দশা, কখনও হাতি কখনও মশা!

রসিক আপনার ব্যাকুল প্রয়োজনের জন্যেই হয়ত রাঙাদিদিকে সাক্ষাৎ পরমাত্মীয়া বলিয়া গ্রহণ করিল, তাহার এই অর্থহীন অভিনয়টুকুতে সে যেন অনেকটা সান্ত্বনা পাইল।

গমনোন্মুখ রসিক আপনার জীর্ণ মলিন উত্তরীয় প্রান্তে চোখ মুছিয়া লইয়া অত্যন্ত কাতরস্বরে কহিল—রাঙাদি, ও যদি ভাল হ'য়ে গুরোর বাড়ী থাকৃতে চায়, তাই যেন থাকে। আমি ফিরলে ইচ্ছে হয় আস্‌বে, না হয় আস্‌বে না। এই গাঁয়ে চিরদিন আমাকে থাক্‌তেই হবে এমন ত নয়।

রাঙাদি কহিলেন—এসো রসিক, ভাবনা ক'রো না। মা কালীর ইচ্ছেয় মঙ্গল হবে বই কি ?

রসিক আপনার দুর্ব্বলতাকে ঢাকিবার জন্যে আর একবার অজ্ঞাত নির্ভরযোগ্য একমাত্র শক্তির প্রতি একটা আন্তরিক প্রণাম করিয়া রওনা দিল। মনে মনে কহিল, আমার যাই হোক্, কুসুম যেন ভাল হয়ে ওঠে।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর—সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত প্রকৃতি কবোষ্ণ শ্যামপক্ষ মেলিয়া যেন পৃথিবীকে উষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আকাশে পালকের মত মেঘমালা যেন চোখের উপরে একটা কোমল পেলব স্পর্শ দিয়া যায়। কোথায় কোন দূরে এক কাঠঠোকরা পাখী অক্লান্ত পরিশ্রমে সুদৃঢ় চঞ্চুর আঘাতে বিশুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডে গর্ত্ত করিতেছে—তাহার একটা একটানা শব্দ কুসুমের কাণে আসিয়া বাজিতেছে। তন্দ্রাগত চেতনা যেন সহসা জাগিয়া উঠিল, কুসুম অত্যন্ত ভারী চোখের পাতাটাকে টানিয়া তুলিয়া শব্দ অনুসরণ করিল কিন্তু কোথায় সে পাখী বুঝিতে পারিল না। তাহার দেহের মাঝেও অমনি একটা সবল চঞ্চুর আঘাত যেন কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশ ছিদ্র করিয়া ফেলিতেছে। রক্তাক্ত বিবস্ত্র অজ্ঞানতার মাঝে কুসুম কেবল সেই বেদনাটাকে অনুভব করিতেছে—দেখা যায়, গাভীটা চোখ বুঁজিয়া রোমন্থন করিতেছে। রসিক যদি না ফিরে তবে উহার যত্ন লইতে হইবে—গাছগুলি যেন মরিয়া না যায়।

পেটের মধ্যে একটা তীব্র বেদনায় সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া উঠিল—পেশীগুলি যেন সহসা বিবশ হইয়া গেল। অত্যন্ত ক্ষুদ্র একজন গুরুচরণ বা রসিকের মত একটা প্রাণী যেন তাহার অঙ্গের প্রতি শিরা উপশিরা প্রাণপণ জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, আর রাঙাদির পাশবিক

প্রক্রিয়া ও সমাজের নিষ্ঠুর বিধানের সুতীক্ষ্ণ লৌহমুষ্টি যেন তাহাকে তীব্র বেগে টানিতেছে। কুসুম মনে মনে যেন কহিতেছে, অমনি করিয়া টানিও না। অসহায় অদৃশ্য সেই শিশুটির ব্যাকুল বাহুর প্রার্থনা তাহার অন্তরকে স্নেহরসে, করুণার অশ্রুতে সিক্ত করিয়া দিতেছে। কুসুমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখ নিমীলিত করিল। অন্ধকার—সীমাহীন অপার অন্ধকার। জঠরের এমনি অন্ধকার সমুদ্রে ও ব্যাকুল আগ্রহে হয় ত আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু সমুদ্রের তলদেশের আকর্ষণ যেন তাহাকে টানিয়া ক্রমশঃই তলদেশে লইয়া যাইতেছে। তাহাকে এই অন্ধকারের মধ্যে যদি না ডুবিয়া যাইতে হয় তবে হয় ত একদিন গুরুচরণের মত গান গাহিয়া বেড়াইত—হয়ত অমনি জোয়ান হইত—কিন্তু রক্ষা সে ত করিতে পারিল না···এ অন্ধকার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া কে তাহাকে তুলিয়া আনিবে—হায়, এই পাষাণ মানুষগুলির কেহই কি তাহাকে উদ্ধার করিবে না!

অপরিজ্ঞাত, অদৃষ্ট ঐ শিশুটির বাঁচিবার অসহায় প্রয়াসকে কল্পনা করিয়া কুসুম কাঁদিয়া ফেলিল—মনে মনে ভাবিল অত্যন্ত বেদনায় আর চোখের জল পড়িবে না কেন? এমনি বেদনা ত সহনাতীত!

সমস্ত বেদনাকে ছাপাইয়া একটা দুর্ব্বহ নিষ্ফল সমবেদনায় তাহার অন্তরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে। ওই অন্ধকার সমুদ্রের ক্ষুদ্র মৎস্য শিশুর মত নিরুপায় প্রাণীটি যদি পৃথিবীর উপর চোখ মেলিতে পারিত তবে হয়ত গুরুচরণের মত শক্তি সামর্থ্য গুণ ও কণ্ঠ লইয়া তাহার হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে পারিত কিন্তু তবু নিরুপায়। প্রতি পরমাণু যেন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে তাহাকে টানিয়া ধরিতেছে মাতৃ-জঠরের নিশ্চিন্ততা ছাড়িয়া সে যেন কিছুতেই যাইতে চাহিতেছে না।······

সহসা শরীর যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এমনি বেদনায় কুসুম অভিভূত হইয়া পড়িল, সে বেদনা চেতনা অনুভূতির বাহিরে। সে প্রাণপণে

কি যেন একটা ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুই পারিল না। একবার মাত্র বীভৎস চীৎকারে জনহীন নিথর বাড়ীটাকে বেদনার্ত্ত করিয়া দিয়া, একবার মাত্র উহু-হু করিয়া সে সংজ্ঞা হারাইল। তাহার পর কি হইল সে তাহা জানে না।

রসিক মহকুমা হইতে ছুটিতে ছুটিতে যখন বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। ঈশান কোণে একখানা মেঘ পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে—একটা রুদ্র ভয়াবহ ভঙ্গিতে পৃথিবীর পানে লুব্ধনেত্রে চাহিয়া আছে। রসিক উঠানের উপর উঠিয়াই উচ্চকণ্ঠে কহিল—কুসুম, কুসুম—আমি খালাস হয়ে গেছি রে। মামলা খারিজ হয়ে গেছে রে—

কিন্তু উন্মুক্ত দরজার অন্তরাল হইতে কেহ জবাব দিল না, কেহ কাতরোক্তি করিল না। রসিকের বুকের মাঝে ধড়াস্ করিয়া উঠিল—তবে কি শেষ হইয়া গিয়াছে! দেহ রক্তহীন হইয়া নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে!

সহরে যাইয়া সে বিড়ি দেশলাই কিনিয়াছিল। চাদরের প্রান্ত হইতে দেশলাই খুলিয়া দরজার বাহির হইতে তাহা জ্বালাইয়া দেখে—রক্তাক্ত অজ্ঞানতার মাঝে জীর্ণ মাদুরে কুসুম শুইয়া আছে। রসিক ল্যাম্পটাকে ধরাইয়া কুসুমের মুখপানে চাহিল—রক্তাভ আলোকে তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে সভয়ে, অত্যন্ত অনিশ্চয়তার সঙ্গে তাহার কপালে হাত দিল—তাহা বরফের মত শীতল, আস্তে আস্তে বুকের মাঝে হাত দিল, অত্যন্ত ক্ষীণ শব্দে বুকের মাঝে হৃদপিণ্ডটা ধুক ধুক করিতেছে।

রসিক ডাকিল—কুসুম, কুসুম—বেঁচে আছিস্? আমি যে খালাস হ'য়ে গেছি—

কুসুম জবাব দিল না। মাথাটাকে সে সোজা করিয়া রাখিল কিন্তু সে পুনরায় গড়াইয়া পড়িল। স্তূপাকার পেশীহীন মাংসের মত তাহার দেহটা পড়িয়া আছে। এমনি দুঃসময়ে কি করিতে হয় সে তাহা জানে না, কেমন করিয়া এ মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে তাহাও সে বুঝিল না, কাজেই অত্যন্ত অসহায় ভাবে দ্রুত রাঙাদিদির শরণাপন্ন হইল—বাড়ীর নীচে হাঁটুজল হইয়াছে। ছপ্ ছপ্ করিয়া জল ভাঙিতে ভাঙিতে সে সোজাসুজি রওনা দিল।

ফিরিয়া আসিয়া রসিক কুসুমের সংজ্ঞাহীন দেহখানি শোয়াইয়া দিল। ল্যাম্পের শিখাটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার রক্তাভ আলোক কুসুমের শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের উপর খেলা করিতেছে। কুসুমকে এত সুন্দর যেন কোনদিন দেখায় নাই, রক্তহীন, মুখখানি শুভ্রতর, নিদ্রিত মুখখানি যেন অপূর্ব্ব একটা প্রসন্নতায় ভরা। রসিক ডাকিল—কুসুম, কুসুম—

কুসুম অত্যন্ত ভারি চোখের পাতা দুইটিকে যেন যথেষ্ট চেষ্টায় একটু ফাঁক করিয়া চাহিল—অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—কে ?

—আমি, আমি রে কুসুম।

—কি হ'ল ?

—খালাস হ'যে গেছি রে, মামলা খারিজ হয়েছে। তোর কেমন ঠেকছে ?

ওষ্ঠের প্রান্তভাগ হাসিবার চেষ্টায় ঈষৎ বক্র করিয়া কুসুম কহিল—ভাল।

—একটু গরম দুধ এনে দি, কেমন ?

—দাও।

রসিক দুগ্ধবতী গাভীটাকে দোহন করিয়া কিছু দুধ সংগ্রহ করিয়া

আনিল, উনুন জ্বালাইয়া সযত্নে দুধটুকু গরম করিয়া আনিয়া কহিল—কুসুম খেয়ে নে।

রসিক কুসুমকে আপনার বাহুর মধ্যে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইল। কম্পিত হস্তে কুসুম দুধের বাটি ধরিয়া দুই এক চুমুক খাইয়া যেন একটু সবল বোধ করিল। রসিকের মুখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি রাখিয়া কহিল—আমি কি বাঁচবো গো? কেন এত কষ্ট করছো—

রসিক তাহাকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—আমাকে ফেলে যাবি কোথা? যেতে পারবিনে—

কুসুম আবার হাসিল, যেন যাইবার সময় তাহার একেবারেই আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সান্ত্বনা একেবারেই নিষ্ফল। ক্ষয়িষ্ণু যক্ষ্মা রোগীকে দীর্ঘায়ু হওয়ার আশীর্ব্বাদের মত হাস্যকর।

রসিক কুসুমকে পুনরায় শোয়াইয়া দিয়া ঘরখানা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল। একটা পুরাতন হাঁড়ি আনিয়া তাহার মাঝে কি যেন একটা দ্রব্য ভরিয়া উপরে মাটি দিয়া হাঁড়িটার মুখ বন্ধ করিতেছিল। মাটি বৃষ্টিতে কাদা হইয়া গিয়াছে তাহা ঠিকমত আঁটিয়াছে কিনা তাহা ল্যাম্পের আলোয় পরীক্ষা করিতেছিল। কুসুম প্রশ্ন করিল—ওকি দেখি?

—কিছু না, হাঁড়ি।

কুসুম ব্যগ্রতার সঙ্গে পুনরায় কহিল—দেখি, একবারটি দেখি।

—না, রে, এ কিছু না, শুধু হাঁড়ি।

কুসুম হাঁড়িটার পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া কহিল—আমি ত জানি। একবারটি দেখি—ও যে 'মা' বলে ডেকেছিল আমায়—

রসিক কহিল—না রে পাগল, শুধু—হাঁড়ি। রসিক হাঁড়িটাকে লইয়া বারান্দায় রাখিল। কুসুম কি যেন একটা কহিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল

না, মুদ্রিত চোখ দুইটি হইতে উৎসারিত অশ্রু আঁখিপ্রান্তে বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। রসিক সযত্নে চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল—ওরে পাগল, মা ব'লে আর কে ডাক্‌বে বল্! তেমনি অদৃষ্ট নিয়ে ত আসিস্ নি—তুই স্বপন দেখেছিস্?

কুসুম কহিল—হ্যাঁ তাই। মা বলে আমাকে আর কে ডাকবে? কুসুম আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল যেন ঐ ক্ষুদ্র হাঁড়িটা তাহার বুকের শিরা ধরিয়া টানিতেছে। যে অদৃশ্য অজ্ঞাত প্রাণীটি এতক্ষণ তাহার সমস্ত অণুপরমাণুর সহিত মিশিয়া ছিল তাহা কুসুমকে নিঃশেষে নিঃস্ব করিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছে। পৃথিবীর মৃত্তিকায় যে মূল রসসংগ্রহ করিতেছিল তাহা যেন সহসা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, অন্তর বার বার ডাকিতেছে—ফিরে আয় ফিরে আয়—মাতৃ-জঠরে ফিরে আয!

কুসুম আকুলকণ্ঠে আর একবার কহিল—একটু দেখি—

রসিক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাহিরে আসিল, তাহার পর নিঃশব্দে হাঁড়িটাকে হাতে লইয়া বাড়ীর নিচে হাঁটু জলের মাঝে ছপ্ ছপ্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

গ্রামের মাঠটা প্রায় জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট নালাগুলি জলে ভরিয়া গিয়াছে। বাঁশ বনের ছায়া-ঢাকা হালটটায়ও হাঁটু জল—নদীর জল বেগে বিলের পানে চলিয়াছে। সেই হালট বাহিয়া রসিক আপনার অভিচার সঞ্চিত কৃতকার্য্যকে, অপর একজনের অন্তর ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়াছে নদীর জলে বিসর্জ্জন দিবার জন্যে। চারিপাশের ঘনীভূত অন্ধকারের মাঝে একটা না একটা জলের কলকল শব্দ ও বৃষ্টির টপটপ শব্দ শোনা যাইতেছে। নারকীয় অন্ধকারের তলদেশে রসিক যেন হিংস্র হাঙ্গর শিশুর মত আপনার সহজ প্রবৃত্তি তাড়িত হইয়া জলকেলি করিতেছে। রসিক চলিয়াছে—ছপ্ ছপ্।

কে একজন হাঁকিল—কে যায়। ওখানে কই—জাল আছে, দাঁড়াও।

—কে ?

—গুরুচরণ। রসিকদা নাকি ? এদিকে নৌকোয় এসো। কোথায় যাবে ?

—নদীতে।

—কেন ? দোয়াড় দেখতে যাবে ?

—হ্যাঁ।

—এস এই নায়, আমিও বাড়ী যাবো।

রসিক জল ভাঙিয়া নৌকার নিকটবর্ত্তী হইল। গুরুচরণ কহিল—যাক্ খালাস হ'য়ে গেছ রসিকদা, বেঁচে গেলাম। সারাজীবন কেবল ভাবতাম আমার জন্তেই রসিকদা জেলে গেল ?

—হ্যাঁ, বাঁচলাম কিন্তু আমাকে জেলে দিলে তোর কি লাভ হ'তো রে গুরো ? দত্তমশায়ই ত মামলা চালালে।

—কি করবো রসিকদা, মনিব, কিছু ত বলা যায় না। যাক্ এতরাত্রে দোয়াড় 'ছাইতে' যাবে কেন ?

—কুসুমের বড়ো অসুখ। সহর থেকে এসে দেখি খাওয়ার কিছু নেই, দেখি যদি দু' একটা মাছ পাই।

—তার জন্তে নদীতে যাবে কেনো ? কই মাছ একফুড়ি মত পেয়েছি গোটাকয়েক নিয়ে যাও।

—না পাই ত নেব—চল্ নদীতে যাই।

রসিক নৌকায় উঠিয়া বসিল। গুরুচরণ লগি খোঁচাইয়া নৌকা চালাইতে চালাইতে কহিল—যে অত্যাচার করেছ কুসুমের উপরে, কত মেরেছ তা অসুখ করবে না ?

রসিক যেন লজ্জিত হইল। অন্ধকার না হইলে গুরুচরণও দেখিতে

পাইত রসিকের মুখে একটা পরিতাপের সুস্পষ্ট আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। রসিক ধীরে ধীরে কহিল—না রে, মারিনি ত তেমন।

—তেমন মানে? আর মারলে যে মরেই যেতো—

—তোর জন্তেই ত—

—ভুল,রসিকদা। পরের কথা শুনে আমাকে খুন ক'রতে চাওতুমি!

নৌকাটা নদীর মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। গুরুচরণ তাই প্রশ্ন করিল —তোমার দোয়াড় কোথায়?

রসিক একটা দিক দেখাইল, মাঝনদী দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয় কারণ ডাঙ্গার কুলে কচুরীপানা জমা হইয়া আছে। গুরুচরণ তাহাই চলিল, রসিক অকস্মাৎ হাতের হাড়িটাকে ফেলিয়া দিল। গুরুচরণ ব্যস্ত ভাবে কহিল—কি পড়ে গেল রসিকদা?

—কিছু না।

—কিছু না, পড়লো যে! কি পড়লো?

—ও, মাছ, ডাফি দিল—

—না কি ফেললে বলো না।

আর একদিন শুনিস্, চল এখন ফিরে যাই। মাছ দু'টো দিবি ত দে, আর দোয়াড় দেখে কি হবে?

গুরুচরণ আর জিদ না করিয়া কহিল—চল। বাতাস আর বৃষ্টিতে শীতও ক'রছে।

গুরুচরণ খালে 'বাঁধাল' দিবে বলিয়া সকাল হইতেই বাঁশের নানারূপ 'বেতি' তুলিতেছিল। জল দেখিতে দেখিতে খাল-বিল ভরিয়াফেলিতেছে—বাঁধাল দিতে হইলে এই প্রকৃষ্ট সময়। নদীর চিংড়ি ও বিলের কই সকলই

একসঙ্গে মিলিবে। ষষ্ঠীচরণ কাটারি দিয়া বেতি চাঁছিতেছিল গুরুচরণ নারিকেলের কাতায় টানা দিয়া রাখিয়া বেতি তুলিতেছে।

গুরুচরণ কহিল—বাবা, কাল বৃষ্টি নাম্‌লো, তা না হলে দু'পণ কই পেতাম। বাতাস আর বৃষ্টিতে মাঠে তেষ্টাতেই পারলাম না।

—যাক্ গে, কুড়ি চারেক ত হ'য়েছে—বেশ ডাগর কই।

—'বানা' বানাতে হবে, খালের 'নাওদাড়া' ত ন'হাত হ'লেই হবে কেমন?

—হ্যাঁ।

কে যেন ডাক দিল—ষষ্ঠী সর্দ্দার! ষষ্ঠী সর্দ্দার।

ষষ্ঠী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আসুন, মনিববাবু আসুন।

দত্ত মহাশয় নৌকা হইতে নামিয়া জলভাঙ্গিয়া বাড়ীর উপর আসিয়াছেন। ষষ্ঠী একখানা চৌকি মুছিয়া বসিতে দিল—বসুন দত্তমশায়। কি ভাগ্যি আপনি এসেছেন, খবর দিলে আমিই ত যেতে পারি।

দত্ত মহাশয় ধীরে ধীরে গামছা দিয়া পায়ের পাতার উপর পর্য্যন্ত মুছিতে মুছিতে কহিলেন—দেখলে ব্যাটা ন'বনের কাণ্ডখানা। হারামজাদা, নেমকহারাম কোথাকার। এতবড় পাজী যে হলপ ক'রে ডাহা সত্যি কথাগুলো ব'লে এলো! রসিক ইচ্ছে ক'রে মারে নি, সোহাগ ক'রেছে, না? ব্যাটা তবে পনর দিন হাসপাতালে পড়ে রইলি কেন?

গুরুচরণ কহিল—ভালই হ'ল, ও গোলমাল মিটে যাওয়াই ভাল।

দত্ত মহাশয় উষ্মা সহকারে কহিলেন—থাম্ গুরো থাম্! ছেলেমানুষ সব তার মধ্যে কথা বলতে নেই। বোসো ষষ্ঠী—নবীনদা তোমাদের ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির আর কি? একটা মিথ্যা কথা বলতে পারলে না। ব্যাটা নেমকহারাম। সেবার যখন মরতে প'ড়েছিলি, তখন ষষ্ঠী তুমি ত খাইয়ে বাঁচালে আর কাল একটু হ'লে সে ত গুরোকেই জেলে পুরতো।

ষষ্ঠী মাথা নাড়িয়া কহিল—সত্যিই, কিন্তু নবীনদা ত মিথ্যে বলে না তাই। যদি অভ্যাস থাকতো তবে আমার জন্যে ব'লতো বইকি ?

—মিথ্যে বলে না। আমরা ভদ্দর লোক হ'য়ে, শিক্ষিত লোক হ'য়ে পারি, তিনি পারেন না। কেন? অন্যায় যে করে তাকে শাস্তি দিতে মিথ্যাকথা বলা কি পাপ? রসিক আজ ন'বনেকে ফুটো ক'রলে কাল যে তোমার ভুড়ি ফাঁসাবে—তা বোঝো ?

গুরুচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—আমাদের ভুঁড়ি ফাঁসাতে তার দু'চার জন্ম যাবে দত্তমশায়! পিছন থেকে ছাড়া সাম্‌নে থেকে কখনই পারবে না।

—পিছন থেকে যে মারবে না তা আন্দাজ করাটা বেকুবী। যাক, তোমরা আমার প্রজা, তোমাদের বিপদে আপদে বুক দিয়ে এসে পড়া আমার দরকার, তাই আসি। তোমরা খুশী হ'লে আমরাও খুশী।

ষষ্ঠী সর্দ্দার কহিল—যাক্‌ গে, দত্তমশায়, এবার ছেড়ে দিলাম পরে পেলে হাতে নাতে দিয়ে দেবো। আর একটা খোঁচা ত সেও খেয়েছে।

দত্ত মহাশয় ষষ্ঠী ও গুরুচরণকে স্পষ্টই বুঝাইয়া দিলেন—নবীনের সাক্ষ্যতে মামলাটা ফাঁসিয়া গিয়াছে তাহা না হইলে তিন বৎসর জেল অনিবার্য্য ছিল—যেরূপ বুক দিয়া তদ্বির করিয়াছেন তাহা বড় আত্মীয়ও করে না। এ কথা পিতাপুত্র অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইল। দত্ত মহাশয় অতঃপর প্রসঙ্গান্তরে মনোযোগ দিলেন। কহিলেন—এ সব কি হচ্ছে রে গুরো ?

—বাঁধালের জোগাড় করি।

—তুই যে সেদিন চরে চিংড়ি মাছ ক'টা দিয়েছিলি তা সত্যিই যেন অমৃত। ভালবেসে দিলে অমনি হয় খেতে—তোদের বয়সে কত মাছ মেরেছি। একবার······

দত্ত মহাশয় যৌবনের একটা মৎস্য শিকার অভিযান বর্ণনা করিয়া

চুপ করিলেন। ষষ্ঠীসর্দ্দার কহিল—ওরে গুরো, ডাগর দেখে কয়েকটা কই মাছ এনে দে। মনিব যখন বাড়ীর ওপর এসেছেন—হ্যাঁ, ওই কই মাছ একটু ডাগর না হলে অখাদ্য।

গুরুচরণ ইতস্ততঃ করিতেছিল, পিতার ইসারায় উঠিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর গুরুচরণ ও দিগম্বরী ধরাধরি করিয়া জল সমেত মাছের কল্‌সীটা বাহিরে আনিয়া বড় একটা থালুইতে ঢালিয়া ফেলিল। কয়েকটা মাঝারি কইমাছ লইয়া গুরুচরণ বাকীগুলি আবার জিয়াইয়া রাখিল। দিগম্বরী কহিল—ওই বুঝি ডাগর মাছ?

—চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়ী, ডাগর মাছ কষ্ট ক'রে মেরেছি কি ওর জন্যে নাকি? বাবা কি বোঝে?

—বলে দেবো তোর বাবাকে?

—তোর নাক কেটে দেব যদি বলিস্—যাঃ—

দিগম্বরী খানিক জল গুরুচরণের গায়ে ছিটাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। গুরুচরণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই সে রান্নাঘরে শাশুড়ীর নিকট উপস্থিত হইল।

বাহিরে আসিয়া মাছ কয়টা দত্ত মহাশয়ের সাম্‌নে রাখিয়া কহিল—তেমন ডাগর মাছ নেই। বেছে নিয়ে এলাম।

ষষ্ঠীচরণ উঁকি দিয়া কহিল—ওই ত ডাগর, ওর চেয়ে বড় মাছ এখন আর হয় না। সে খেয়েছি আমরা, আধ হাত এক একটা কই পেকে হলদে হ'য়ে গেছে।

কয়েকদিন পরে—

আকাশ আজ কয়েকদিন বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, রসিকের [illegible] আসিয়াছে। রসিক দুধ বেচিয়া সেদিন হাট হইতে

বঁড়শী কিনিয়া আনিয়াছিল, বৈকালে সেগুলিও জেয়ালার টাকি মাছ লইয়া অদূরে "দাওন" দিতে গিয়াছে। আজকাল নতুন বর্ষার জলে বোয়াল মাছ বেশ পড়ে—তালের ডোঙ্গায় করিয়া সে সেদিন ছোট ছোট সাতটা বোয়াল ধরিয়া আনিয়াছিল।

কুসুম সন্ধ্যার প্রাক্কালে পৈঠার উপরে পা ছড়াইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল দেহটাকে খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। কি ভাবিতেছিল তাহা বলা যায় না তবে মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া মানুষ যেমন একটা শূন্যতা বোধ করে সেও তেমনি একটা অনুদ্দিষ্ট অকারণ শূন্যতার আশঙ্কায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। জীবনটা যেন মুহূর্ত্তে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—এই ঘর-সংসার, এই পরিশ্রম এই ভালবাসাবাসি এ সব যেন আজ একান্তই অর্থহীন। গৃহ আছে কিন্তু তাহাতে বধূর অধিকার নাই, ভালবাসার লোক আছে কিন্তু স্বামী নাই, পুত্র আছে কিন্তু তাহার 'মা' বলিয়া ডাকিবার অধিকার নাই। কুসুম তাই একাকী বসিয়া একটা পীড়াদায়ক শূন্যতার সঙ্গে বেদনা অনুভব করিতেছিল—দুর্ব্বল দেহটা যেন বিগত একটা দুঃখের ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চোখ দুইটি বার বার সজল হইয়া উঠিতেছিল—ওই দিগম্বরীর অধিকার লইয়া সে যদি গুরুচরণের গৃহে থাকিতে পারিত—

কি যেন একটা শব্দ হইতেই কুসুম ফিরিয়া চাহিল ; রাঙাদি নিজেই একটা তালের ডোঙ্গায় লগি খোঁচাইতে খোঁচাইতে আসিয়া ঘাটে নামিয়াছেন। রাঙাদি গুড়ার কৌটা হইতে একটু গুড়া দিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—কি রে কুসুম কেমন আছিস্?

কুসুম মৃদুস্বরে কহিল—এসো রাঙাদি।

—আসবোই ত। এই ত শরীর সেরেই গেছে ব'লতে হয়,' গায়ে জোর পাচ্ছিস্?

কুসুম হাসিয়া কহিল—জোর পাবো, আর এ জন্মে নয়।

—কি হ'লো? আরে নেকী, আমরা অমন দু'চারটে রোগ ত ভোগ করেছি সবই জানি। তবে তোর ননীর শরীর—অমন একটু রোগে কি হয়! বিপিন তোকে কি ভালই বাসে, রোজ জিজ্ঞাসা করে কেমন আছে? বংশের ছেলে ওর মায়া-দয়া থাকবে না? ওর ভালবাসা পায় ভাগ্যমানে।

কুসুমের শরীরটা একটা বীভৎস ঘৃণায় ঝাঁকি দিয়া উঠিল। এই অক্ষম দুর্ব্বল দেহে বিপিনের নামটাই যেন তাহাকে ধর্ষিত করিবার জন্য যথেষ্ট। আর রাঙাদির মুখে এই ভণিতার অর্থ যে কি তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত, তাই একটু হাসিয়া কহিল—জিজ্ঞাসা করে?

—হ্যাঁ লো রোজই করে, তোকে দেখবার জন্য ডোঙ্গায় চড়ে আনাচ-কানাচ দিয়ে কতবার যায় কিন্তু তোকে দেখ্‌তে পায় না বলে কত আফশোষ। ওর হাতে বেশ টাকা পয়সা আছে কিন্তু দেমাক ব'লতেও নেই। জানিস্?

কুসুম আবার একটু জাগিয়া কহিল—তাই নাকি? তোমাকে দেয়?

রাঙাদি কহিলেন—এমনি কি আর দেয়, কাজ যদি করি ত তোর মত তারাও দেয়। তোর ইচ্ছে হ'লেই ত আমার টাকার অভাব থাকে না।

—ও তাই বুঝি বিপিন ভালো?

—ভালো ছাড়া আর কি? তার প্রশংসা সবাই করে। গুয়োর মত নেমকহারাম সে নয়—সে নূনের গুণ গায়! তোকেও সোণার গওনা দেবে বলেছে।

কুসুম আবার একটু ম্লান হাসিয়া কহিল—সকলেই কি এ জগতে সোণার গওনা চায় রাঙাদি?

—তুই চাস্ না?

—চাই বই কি, তবে বিপিনের কাছ থেকে নয়। ও যদি দেয় দিক।

—ফুঃ, রসিক দেবে সোণার গওনা, যাকে ধান ভেনে তুই খাওয়াস—

কুসুম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, এমনি নির্ল্লজ্জতার সম্মুখে কি জবাব দেওয়া যায়? রাঙাদি আবার কহিল—হাটবার ত' শনিবার। রসিক হাটে গেলে ফিরতে রাত একপ্রহর, আলাপ ক'রে দেখবি। কেমন সুন্দর লোক।

কুসুমের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত স্নায়ুর মধ্য দিয়া একটা শিহরণ খেলিয়া গেল। একটা বিজাতীয় ঘৃণায় লজ্জায় তাহার সর্ব্বশরীর যেন অকস্মাৎ বেপথুমান হইয়া উঠিল। কুসুম কহিল—উঃ কি দুর্ব্বল হ'য়েছি দিদি, হঠাৎ মাথার মধ্যে কেমন ঘুরছে, উঃ—আর যে পারি না।

কুসুম আর যেন কথা কহিতে পারিল না,সে আঁচল পাতিয়া সেখানেই শুইয়া পড়িল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম সঞ্চিত হইয়া সন্ধ্যার আলোকে চিকমিক করিতেছিল, রাঙাদি তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—ও মা, একেবারে ঘেমে গেলি দেখ্‌ছি,আচ্ছা থাক্ থাক্ শরীর একটু ভাল হোক্। এতবড় অসুখটা তোর গেল, গুরো একবার দেখতেও এল না? কি নেমকহারাম তাই দেখ্‌।

কুসুম কথা কহিতে পারিতেছিল না, বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল—সেটা যেন স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কুসুম বুকের মাঝখানটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—একটু জল গড়িয়ে দেবে দিদি? জল তেষ্টা পেয়েছে?

রাঙাদি কহিলেন—দাঁড়া একটু জল প'ড়ে দি।

রাঙাদি জল ভরিয়া আনিয়া ঘটিটার উপরে কয়েকটা ফুঁ দিয়া কহিলেন —নে খেয়ে নে, কুসুম।

কুসুম একটু জল খাইয়া যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল—গুরুচরণ আস্‌বে কেমন ক'রে, সে এলেই ত আবার সড়কি মারামারি হবে—আর তার আসার দরকারও ত' নেই। সে দেখে গেলেই কি আর আমি ভাল হ'য়ে যাবো?

একটা উদগ্র অভিমান সহসা কুসুমের কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া দিল।

*

এতদিন বোঝা যায় নাই কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হইলে বোঝা গেল যে শুক্লপক্ষ যাইতেছে। হয় ত আজ অষ্টমী কি নমবী হইবে। আকাশের প্রান্তে বাঁকা একখানা চাঁদ উঠিয়াছে—স্বচ্ছ চলমান মেঘের ফাঁকে অত্যন্ত স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে পৃথিবীর শ্যামলতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। রসিক মাঠের মাঝে ডোঙ্গায় চড়িয়া 'জেয়ালা' পাহারা দিতেছিল—রাত্রি প্রায় প্রহরেক হইবে। অতি দূরে অস্পষ্ট আলোকে তাহার বাড়ীখানি দেখা যায়—জলের উপর যেন ঘর তিনখানি ভাসিতেছে। শয়নঘরে রুগ্ন কুসুমের শিয়রে একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছে—তাহার আলো দীর্ঘ একটা কম্পমান রেখায় তরঙ্গায়িত জলের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া চিক্‌মিক করিতেছে। একটা মাছ যেন বঁড়শীতে বাধিয়া জলের মাঝে পুচ্ছ তাড়নার একটা শব্দ করিল। রসিক তাড়াতাড়ি ডোঙ্গা বাহিয়া যাইয়া দেখে মাছ, বেশ বড় একটা বোয়াল। সে সেটাকে ডোঙ্গার মধ্য ফেলিয়া আবার একটা জেয়ালা গাঁথিয়া দিল।

নিস্তব্ধ জলপ্লাবিত মাঠের মাঝে একটা আবছা আলোক সমস্ত ধার ঘিরিয়া রহিয়াছে—মনে হয় পৃথিবী যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কিসের শঙ্কায় প্রতীক্ষমান। রসিকের কেমন ভয় ভয় করিতেছিল—শোনা যায় এই মাঠে মাছ ধরিতে আসিয়া নিবারণের ঠাকুর্দ্দা ভূতের হাতে মারা পড়িয়াছিল—ভূতে তাহাকে জলের মধ্যে চুবাইয়া মারিয়া রাখিয়াছিল।

পরদিন যখন তাহার দেহ আবিষ্কৃত হইল তখন দেখা গেল তাহার মাথার অনেকখানি কাদার ভিতর পুঁতিয়া গিয়াছে। রসিকের গায়ের মধ্যে ছম্ ছম্ করিতেছিল, মনে মনে ভাবিল—মাছ ত একটা হইয়াছে আর দরকার কি? বাড়ী ফিরিয়া যাইবে ভাবিতেছে এমনি সময়ে একটা শব্দ হইল—ছপ্ আবার ছপ্, আবার—

কিসের শব্দ? রসিক কাণ পাতিয়া শুনিল—কে যেন 'পলো' দিয়া মাছ ধরিতেছে। কোন দিক হইতে সে বুঝিতে পারিল না, তবুও যা হয় একটা দিক অনুমান করিয়া সে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—কে? কে ওখানে?

কোন জবাব আসিল না।

রসিক পুনরায় ভাবিল—মাজা জলে 'পলো' দিয়া কে মাছ ধরে! ইহা ত স্বাভাবিক নয়, সে আবার হাঁকিল—কে? কে মাছ ধরে? কে পলো চাবায়?

কোন জবাব আসিল না, রসিক আরও ভীত হইয়া ডোঙ্গা ঠেলিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে আরম্ভ করিল। কে যেন একটা লোক সত্যই পলো লইয়া আগাইতেছে। সে আবার হাঁকিল—কে? কে পলো চাবায়?

জবাব আসিল—আমি, গুরুচরণ।

রসিক ডোঙ্গা লইয়া নিকটবর্ত্তী হইতেই চিনিল গুরুচরণ মাজা জলে দাঁড়াইয়া পলো চাবাইতেছে। সে শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কি রে? কি রে গুরো?

গুরুচরণ কহিল—মস্ত বোয়াল, একটুর থেকে ফসকে যাচ্ছে—একহাত দূরে ডাফি দেয়।

রসিক কহিল—থাক্, তোর মাছ ধরে দরকার নেই, ওঠ্ ডোঙ্গায় ওঠ্।

—এখানেই আছে মাছটা, একটু দাঁড়াও।

—না, না, চল্ মাছ আমি দেব তোকে, চল্—

একটু এগিয়ে দেখি—

—না রে, ও মাছ নয় গুরো—তুই উঠে আয়।

মাছ নয়! গুরুচরণ হঠাৎ থামিয়া গেল, গায়ের মাঝে কেমন যেন একটা ঝাঁকি দিয়া লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিল, সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া রসিকের ডোঙ্গায় উঠিয়া বসিল।

লগি খোঁচাইয়া ধানের জমির মধ্য দিয়া রসিক বাড়ীর ঘাটে আসিয়া থামিল। মাছটাকে হাতে লইয়া ডোঙ্গাটাকে বাঁধিয়া কহিল—আয় গুরো, তামুক খেয়ে যা।

—হ্যাঁ, তোমার বাড়ী যাই আর তুমি সড়কি দিয়ে ফুটো ক'রে দাও আর কি? গুরুচরণ রসিকের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পলো হাতে নামিয়া আসিল। হাসিয়া কহিল—রসিকদা, তুমি সড়কি মারবে এ যে স্বপ্নেও ভাবিনি।

রসিক কহিল—আয়, আয় ফাজলামো করিস্‌নে।

গুরুচরণ ভিজা কাপড়ে একখানা পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল—ওটা কি রসিকদা?

—দাঁড়া বলছি। রসিক ল্যাম্পটা চৌকির উপর রাখিয়া আসিয়া কহিল—আমি না থাক্‌লে তুই ত গেছিলি আজ, অমনি মাজা জলে পলো নিয়ে কেউ যায়?

গুরুচরণ কহিল—তাই ত! ঠিকই পাইনি যে মাজ জল।

রসিক তামাকু সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে কহিল—নিবারণের ঠাকুর্দ্দা মরেছিল কি ক'রে জানিস্? আষাঢ় মাসে অমনি বোয়াল মাছের ডাফি শুনতে শুনতে সে এগুতে আরম্ভ ক'রলে। অন্ধকার রাত্রি, টুপটাপ্ বৃষ্টি হ'চ্ছে। মাছটা পলোর ঠিক বাইরে ডাফি দেয়, একটু

এগোয় পলোর মাঝে খড় খড় করে ওঠে, হাত দিয়ে দেখে কিছু নেই। এগোতে এগোতে গলা জলে যখন গেল তখন মাছটা মুখের সাম্‌নে এসে হিঃ হিঃ করে হেসে উঠ্‌লো, তার পরে ঘাড়টা ধ'রে কাদার মাঝে পুঁতে রেখে চলে গেল। এ মাঠে একটা মেছোভূত আছে জানিস্—সে ওই চেষ্টায়ই থাকে, আজই এত বার ডাফি দিলে কিন্তু দাওন ছেড়ে নড়িনি।

গুরুচরণের গায়ের মধ্যেও ছম্ ছম্ করিয়া উঠিতেছিল, সে ভীতকণ্ঠে কহিল—সত্যি রসিকদা ?

—হ্যাঁ, আর একটু এগোলেই হ'য়েছিল—আমি সেই জন্তেই "গাঠ্‌রি" না ক'রে মাঠে যাইনে। শ্বেত অপরাজিতার শেকড় মাজায় বেঁধে যাস্, বুঝলি। ওর বাপেরও সাধ্যি নেই যে কিছু করে।

গুরুচরণ কহিল—আচ্ছা।

কুসুম ঘর হইতে প্রশ্ন করিল—ওগো এসেছ ? আমার একা থাকৃতে ভয় করে না ?

রসিক ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—ওই ছাখ্, সকলেরই আজ ভয় করে, এদিকে আনাগোনা ক'রছে কিনা !

উচ্চকণ্ঠে কুসুমের উদ্দেশে কহিল—কুসুম, গুরো এসেছে একটা পান দে না ?

কুসুম শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া একটা পান তৈয়ারী করিয়া গুরুচরণের হাতে দিল। স্বল্প অবগুণ্ঠনের মাঝে গুরুচরণের চোখের দিকে একবারটি চাহিয়া থাকিয়া ফিরিয়া গেল। এই একটিমাত্র চাহনি গুরুচরণের অন্তরকে যেন মথিত করিয়া দিয়া গেল—শুষ্ক মরুর মত হৃদয় যেন সহসা করুণায়, স্নেহে আর্দ্র হইয়া উঠিল। গুরুচরণ কহিল—উঃ সইএর শরীর কি হ'য়েছে রসিকদা ! এত বড় অসুখ তা তো বলো নি—

—বল্‌বো কি, ওই তালেই ব্যস্ত তার মধ্যে আবার ফৌজদারী মামলা।

গুরুচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ও তাই। টাকায় ঠেক্‌লে আমাকে ব'ল্‌লে না কেন? কুসুমের চিকিচ্ছের জন্যে আমি কিছু ধার দিলে ত আর অশুদ্ধ হ'ত না।

রসিক একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—যাক ভাল ত হ'য়েছে, যেমন হ'য়েছিল ভাবিনি যে আবার উঠ্‌বে।

—কি অসুখ?

—ও মেয়েমানুষের অসুখ, জড়িতের ব্যায়রাম।

গুরুচরণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—চিকিচ্ছে ক'রেছে রাঙাদি ত?

রসিক একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—হ্যাঁ।

গুরুচরণের চোখে আর একটা দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল—সেদিন গভীর রাত্রে যে দ্রব্যটিকে সে নদীর মাঝখানে ফেলিয়া দিয়াছিল তাহা কি, গুরুচরণের বুঝিতে বাকী রহিল না। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—ওঃ, তাই, বুঝেছি কিন্তু—

রসিক জবাব দিল না, গুরুচরণের হাতে হুঁকাটি দিয়া প্রসঙ্গান্তরে কহিল—নে তামাক খা। ভাল তামাক—বালাখানা তামাক মেশানো—

গুরুচরণ পরিহাস না করিয়া হুঁকাতে সংক্ষিপ্ত কয়েকটা টান দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ভিজে কাপড়ে আর কতক্ষণ থাকি, যাই রসিকদা।

—আচ্ছা আয়, ডোঙ্গাটা নিয়ে যা 'দোয়াড়' দেখে ফিরবার সময় নিয়ে আসবো।

গুরুচরণ নিঃশব্দে উঠিয়া আসিল। ঘরের পানে একবার ফিরিয়া চাহিল—সেখানে কুসুম নাই, দরজার ফাঁকেও কোন উদ্বেগ-আকুল আঁখি তাহার দিকে চাহিয়া রহিল না।

*

গুরুচরণ আবছা আলোয় ডোঙ্গা চালাইতে চালাইতে কহিল—কুসুম ত এমনি তন্দ্রাময় বিলোল আঁখিতে বহুবার বহুদিন তাহার দিকে তাকাইয়াছে কিন্তু এমনি স্নেহ, এমনি ব্যাকুল করুণা কোনদিন সে চাহনি দিয়া ঠিকরিয়া পড়ে নাই। কুসুম কেন এমন ভাবে চাহিল—এ যেন বিদায় বেলার ব্যাকুল মিনতিভরা চাহনি, প্রিয়তমকে নিস্ফল আশায় বার বার ফিরিয়া দেখা……এমনি করিয়া কুসুমকে ভালবাসিয়া সে কি ভাল করে নাই? দিগম্বরী ত বড় হইয়া উঠিয়াছে, তবে কেন কুসুমকে এমনি ভাবে ভালবাসিল?

বাড়ীর ঘাটে ডোঙ্গা লাগাইয়া সে নামিয়া আসিল। মাকে ডাকিয়া কহিল—আমার কাপড়খানা দাও ত।

মাতা আসিল না কিন্তু দিগম্বরী একহাতে ল্যাম্প ও অন্যহাতে একখানা কাপড় লইয়া তাহাকে দিল। গুরুচরণ দিগম্বরীর মুখের পানে চাহিল—ল্যাম্পের আলোক তাহার মুখের উপর একটী অনবদ্য রক্তিমাভা ছড়াইয়া দিয়াছে। উদ্ভিন্ন-যৌবনা দিগম্বরীর মুখখানি অতি সুন্দর মানাইয়াছে—কপালের কাঁচপোকার টিপখানা জ্বল জ্বল করিতেছে। দিগম্বরী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—জলে প'ড়ে গেছিলি?

—পড়বো কেন রে? মাছ মারতে গেলে কাপড় ভেজে না?

—ও বাবা! মাছ কই দেখি?

—মাছ কাল পাবি।

দিগম্বরী হি হি করিয়া হাসিয়া মুহূর্ত্তে গুরুচরণকে অপদার্থ প্রমাণ করিয়া দিল। মাছ না পাওয়া ও কাপড় ভেজা এই দুটি অসঙ্গত ব্যাপার একসঙ্গে জড়াইয়া যেন অত্যন্ত হাস্যকর হইয়া উঠিল। গুরুচরণ কহিল —মাছ মারতে গেলে বুঝতিস্—বেকুব কোথাকার?

দিগম্বরী আবার হাসিয়া উঠিল—জবাবটা যেন আরও হাস্তকর হইয়া উঠিয়াছে।

গুরুচরণ দিগম্বরীকে ঝাপটাইয়া ধরিয়া কহিল—দাঁড়া, বুঝিয়ে দিচ্ছি।

দিগম্বরী কাতর স্বরে উ-হু করিয়া উঠিয়া কহিল—ছাড়্ ছাড়্—উহু হু—

গুরুচরণ ছাড়িয়া দিতেই, দিগম্বরী আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল—ধ্যেৎ, বদমাইস, তোর বাবা জেগে আছে না?

গুরুচরণ জবাব দিবার পূর্ব্বেই দিগম্বরী ঘরের মাঝে প্রবেশ করিল। গুরুচরণ কাপড় ছাড়িয়া সেদিনের মত শুইয়া পড়িল—মনে হইল—দিগম্বরীর এই হাসি আর কথাগুলি যেন সত্যই মোহময়। ধরা-দিয়া-সরিয়া যাওয়া যেন তাহাকে আরও আকর্ষনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কাল ফাঁক পাইলে ইহার প্রতিশোধ সে অবশ্যই লইবে।

কয়েক দিন পরে—

কুসুম বেশ ভাল হইয়া গিয়াছে এবং কাজকর্ম্ম করিতেছে। মাঝে মাঝে ভদ্র পাড়ায় কাজকর্ম্মও করিতে যায়। শ্রাবণের মাঝামাঝি। গ্রামখানি জলে ডুবিয়া গিয়াছে, রসিকের বাড়ী হইতে পার হইয়া রাস্তায় উঠিলে ডাঙ্গায় ডাঙ্গায় গুরুচরণের বাড়ীর উপর দিয়া নদী তীরের বটগাছ পর্য্যন্ত আসা যায়। নদীর ধার দিয়া পায়ে-চলা পথটা মাঝে মাঝে ডুবিয়া গিয়াছে—কিছুদিনের মধ্যে বটগাছের নিকটবর্ত্তী স্থানটুকু ছাড়া সমস্তই ডুবিয়া যাইবে। রসিক নিত্য প্রচুর মৎস্য শীকার করিয়া আনে। দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ প্রায় টাকায় ছয় সের দরে বিক্রয় হয়, দত্ত মহাশয় জোগান লইয়াছেন। প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া টাকা পাওয়া যায়। বাড়ীর পশ্চাতে কুমড়ার মাচায় অনেকগুলি কুমড়া ফলিয়াছে।

রসিক নারিকেল গাছ বাছিয়া কতকগুলি নারিকেল পাইয়াছিল। কুসুম অপরাহ্ণে বাহিরের উনানে বসিয়া নাড়ু তৈয়ারী করিতেছিল। রসিক শশা, নারিকেলের নাড়ু ও নতুন ধানের চিড়া খাইতে চাহিয়াছে। বাড়ীর নীচু দিয়া কে যেন কাঠের ডোঙ্গা বাহিয়া গেল—কুসুম চিনিল—এ বিপিন।

নাড়ুগুলি হাতে পাকাইতে পাকাইতে কুসুম ভাবিতেছিল—গুরুচরণের কথা। সে ত এ বাড়ী আসে, সেদিন আসিয়াছিল তবে পুনরায় সে আসে না কেন? কত কথা কহিবার ছিল কিন্তু অকস্মাৎ সমস্ত ঘটনাস্রোত কেমন হইয়া গেল, কিছুই বলা হইল না। গুরুচরণ কি এখনও তাহাকে তেমনি ভালবাসে, না সব ভুলিয়া সংসারের মাঝে সমাহিত হইয়া পড়িয়াছে! রসিককে ত্যাগ করা যায় না, সে তাহাকে ভালবাসে কিন্তু গুরুচরণকে ভুলিয়া যাওয়াও সম্ভব নয়।

বিপিন রাঙাদিকে পার করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাঙাদি উঠানের প্রান্ত হইতে কহিলেন—কি লো কুসুম, কেমন আছিস্, জলে ভরে গেছে তাই আস্তে পারি নি। বাঃ, বেশ চেহারাটা খুলেছে ত রে! নাড়ু তৈরী করিস্—বেশ বেশ রসিক নাড়ু খেতে ভালবাসে।

কুসুম কহিল—বসো রাঙাদি, হাত আটকা, পীঁড়িখানা টেনে নাও।

রাঙাদি অবান্তর বহু আলাপআলোচনার পরে, বিপিনের মহানুভবতার অতিরঞ্জিত বহু কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিলেন—বিপিনকে আস্তে বলবো ত রে হাটবারে।

কুসুম রাঙাদির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সে কহিল—কেন?

—কেন আবার কি লো? এতকাল পরে আবার নেকী হয়েছিস্ না কি?

—বিপিন আমার কাছে আসবে কেন? একজনের বাড়ীর ঝি বৌএর কাছে আস্‌বে কেন?

রাঙাদি একগাল গুড়াসংযুক্ত পিচ ফেলিয়া কহিলেন—ওরে আমার তিন পুরুষে বিয়ে করা ঘরের বৌ রে! ও সব ঠাট্ রেখে দে, বয়স থাকতে আখের গুছিয়ে নে।

কুসুম তীব্র উষ্মাপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিল—আমি কি ব্যবসা করতে বসেছি নাকি?

—ওরে আমার সতীলক্ষ্মী, তবুও যদি গুরোর সঙ্গে আশনাই না জানতুম। থাক্ তোর আর ন্যাকামী করতে হবে না। কবে আস্‌বে তাই বল্।

—সে এলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেব! আমাকে কি পেয়েছ তোমরা।

রাঙাদি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—বটে! একবারে হয় নি তোমার। সে ঝাল ভুলে গেছিস্ বুঝি। এক সের চালের ঝাল তুলেছি এবার এই 'অনুরাগের' ঝাল তুলবো। রাঙাদি তোর বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ায় তা জানিস্।

কুসুম উচ্চ কণ্ঠেই কহিল—আর ভয় দেখিও না। হ'য়েছে—সে ভয় আর ত নেই।

—ওঃ আচ্ছা। ওরে মুখপুড়ী ধর্ম্মখাকী পার হ'লে পাটনী শালা। তোর জন্যে বনে-বাদাড়ে ঘুরে শেকড়-বাকড় জোগাড় করেছি! তোর পুতের মাথা খেয়ে—

কুসুম উত্তেজিত হইয়া কহিল—পুতের মাথা ত খেয়েছই।

—ওরে আমার পুতের মা লো! তার আবার বড়াই। ওরে ধর্ম্মখাকী—বিপিনের কাছে যে দশ টাকা নিয়েছি তার কি ক'রবি?

কুসুম গম্ভীর ভাবে কহিল—তুমি ব্যবস্থা করো, আর তুমি ও সব কথা ব'লবে ত এ বাড়ীতে এসো না।

—ওরে, আমার সাত পুরুষে ভাতারের বাড়ী লো—তার আবার ঠেকার দেখো না।

বচসা ধীরে ধীরে গুরুতর হইয়া উঠিল। রাঙাদি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—আমি যদি বেঁচে থাকি তবে তোকে দূর ক'রব, ক'রব, করব।

রাঙাদি অত্যন্ত ক্রোধে জল ভাঙ্গিয়াই চলিয়া গেলেন এবং তারপরে যে কথা প্রচার করিতে করিতে গেলেন সে কথা কুসুমের পক্ষে খুব শুভ নহে। কুসুম দাওয়ায় বসিয়া এক দৃষ্টিতে এই গতিহীন বীভৎসতাকে দেখিতে দেখিতে স্পষ্টই বুঝিল এ গ্রামে বসবাসের আয়ু তাহার ফুরাইয়াছে।

এই রসিক, এই দুগ্ধবতী গাভী উহাকে সে প্রাণপণ যত্নে খাওয়াইয়াছে, ওই কুমড়া গাছ উহাকে স্বহস্তে রোপণ করিয়াছে, ওই মাচা সে বহু কষ্টে কঞ্চি টানিয়া আনিয়া রচনা করিয়াছে, ওই মোরগফুলের গাছটা সে দত্ত মহাশয়ের বাড়ী হইতে আনিয়া লাগাইয়াছে,এ সকলই, ওই বন্ধু গুরুচরণ তাহাকেও ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে—কোথায় তাহা কে জানে? আজই এই মুহূর্তেই যেন তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে এমনি একটা বিষাদে এবং ওই রাঙাদির প্রতি একটা নিষ্ফল ক্রোধে বার বার সে কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া সে যেন এর একটা প্রতিবাদ করিতে চায়।

গুরুচরণ বাঁধাল দিতেছিল। কিন্তু খালের মাঝে এত বেগে স্রোত চলিতেছে যে বাঁধাল ঠেকান দুষ্কর। এপারে ওপারে গাছে টানা বাঁধিয়াছে তবুও বাঁধাল থর থর করিয়া কাঁপিতেছে এবং দেখিতে দেখিতে 'বানা'র গোড়ার মাটি ধুইয়া লইয়া তাহা ফাঁক করিয়া ফেলিতেছে। গুরুচরণ তাই বহুশ্রমে তাহা পুনরায় বসাইতেছিল, তাহা ছাড়া রাত্রে

'ফালা'য় মাছ ধরিবার জন্যে জাল পাতিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কাল রাত্রে চার-পাঁচটা রুই মাছ লাফাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

রসিক ও পাড়ার আর কয়েকজন একখানা নৌকায় হাটে যাইতেছিল। বাঁধাল পার হইবার সময় রসিক কহিল—কিরে গুরো, কি মাছ পড়ে—

—আর রসিকদা, কাল যে রুই সব চলে গেছে। আজ ফালা দেবই—হাটে যাচ্ছো নাকি? বাবাকে তোমাদের নায়ে নিয়ে এস। হাটুরে নায় ফিরতে দেরী হবে।

কেদার কহিল—আচ্ছা আনবো রে ষষ্ঠীখুড়কে। দাঁড়া, রাত্রে ফালা আমিও পাহারা দেব। গুরুচরণ কহিল—এস, কেদারদা, একা একা যেন ভয় করে।

নৌকায় ছয়-সাতখানা বৈঠার সাহায্যে দ্রুত উজাইয়া চলিয়া গেল। গুরুচরণ ফালার জাল টানাইতে টানাইতে ভাবিল—রসিকদার আসিতে রাত্রি এক পহরের কম নয়। কুসুমের কাছে অনেক কথা কিছুই বলা হয় নাই, আজ সন্ধ্যার সময় সমস্ত বলিয়া আসিবে, যদি অপরাধ থাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাহিয়া আসিবে। আহা, তাহার জন্যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, রসিকদা না-জানি কতই মারিয়াছে!

ভাবিতে ভাবিতে গুরুচরণের অন্তর স্নেহ-করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। কেন সে এমনি করিয়া তাহাকে বিপন্ন করিল, ইহাতে ত কোন লাভ ছিল না, কোন লাভ নাই। সেদিন সে যেমন ভাবে কহিয়াছিল তাহার মাঝে যেন কত গোপন-বেদনা রহিয়াছে, এ যেন তাহার কাছে নীরব আবেদন জানান।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাঁধালে কাজ করিয়া গুরুচরণ বাড়ী ফিরিল। আজ অতি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—তন্দ্রাগত পৃথিবীর মাঝে দূরাগত জলের কলধ্বনি ছাড়া কোন শব্দ শোনা যায় না। গুরুচরণ ডোঙ্গাটা লইয়া

ধীরে ধীরে, মাঠের পথে রসিকের বাড়ীতে পৌছাইল। পিছনের ঘাটে ডোঙ্গাটা বাঁধিয়া রাখিয়া, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল কুসুম দাওয়ার উপরে ল্যাম্প জ্বালিয়া বসিয়া খই বাছিতেছে কিন্তু তাহার মনটা যেন খই ও তুষের অনেক উর্দ্ধে কোথায় বিচরণ করিতেছে। মাথায় কাপড় নাই, অঙ্গের বস্ত্রও ঈষৎ স্খলিত। গুরুচবণ আস্তে আস্তে নিকটবর্ত্তী হইতেই কুসুম চমকিয়া উঠিয়া কহিল—কে?

—আমি গুরুচরণ।

কুসুম ম্লান একটু হাসিয়া কহিল—বন্ধু! এতদিন পরে? তোমার কথাই ভাবছিলাম—

গুরুচরণ অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়াই দাওয়ার উপরে পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল? আমার কথা ভাবছিলে, শুনেও সুখ—যাক্ শরীর ভাল?

—ভাল! হ্যাঁ ভাল বই-কি? এতদিন পরে হঠাৎ মনে প'ড়ল কেন?

গুরুচরণ এমনি প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে কহিল—আস্‌লে কি রসিক আস্ত রাখ্‌ত, সড়কি দিয়ে ফুটো ক'রে দিত।

কুসুম হাসিয়া কহিল—সেই ভয়ে! তা না হ'লে আস্‌তে?

—আস্‌তাম বই কি।

—কেন আস্‌তে? সই কেমন আছে?

—দিগম্বরী? ভালই আছে।

—কেন আস্‌তে?

—আস্‌তাম কেন? সে কথা বল্‌লে কি বুঝবে?

কুসুম একদৃষ্টিতে খানিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—বুঝতাম না—না?

—আমার জন্যে তুমি কত কষ্ট পেয়েছ, রসিক কত মেরেছে! কেন এমন ক'রে ডাক্‌লে? তুমি ডাক্‌লে যে থাক্‌তে পারি না।

কুসুম গুরুচরণের পানে একটু হাসিয়া কহিল—আমি ডেকেছি—কিন্তু সে মনে মনে, তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে ?

—ও জানা যায়। আজ আস্‌ব তুমি জান না ?

—একদিন আস্‌বে তা জানতাম কিন্তু আজই—তা ভাবি নি ? কিন্তু আর এসে লাভ ? আমাকে ত যেতেই হবে।

—কেন ? কোথায় যাবে ?

কুসুম মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল—কোথায় ? তা ত জানি না।

গুরুচরণ অবাক হইয়া কুসুমের মুখের পানে চাহিল। কুসুমের রক্তহীন গৌর দেহখানা ল্যাম্পের আলোয় রক্তাভ গোলাপের মত সুন্দর হইয়াছে। চোখের কোণে কিসের যেন একটা প্রশান্ততা তাহাকে আরও মদির করিয়া তুলিয়াছে।

আশে পাশে কেহ নাই। নির্জ্জন বাড়ীখানা বড় একখানা নৌকার মত জলে ভাসিতেছে—গোহাল হইতে গরুর পুচ্ছ তাড়নার একটু শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। দূরদিগন্তে জ্যোৎস্নার অস্বচ্ছ আলোয় ক্ষীণ আবছা মসীরেখার মত বনশ্রেণী আকাশ ও জলকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। একটা বাঁশের দীর্ঘ শীর্ষদেশের ছায়া উঠানের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পড়িয়া তাহাকেও বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এমনি সময়ে, এমনি নির্জ্জন নীরবতার মাঝে কুসুম যেন শতবাহুর আকর্ষণে গুরুচরণের দেহের প্রতি অণুপরমাণুকে টানিতেছে। গুরুচরণ কুসুমের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—কোথায় যাবে কুসুম ? আমাদের ফেলে রেখে চলে যাবে ?

কুসুম আপত্তি করিল না, গুরুচরণের আকর্ষণে দেহখানা গুরুচরণের প্রশান্ত বুকের মাঝে অতি সন্তর্পণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গুরুচরণ পুনরায় প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবে কুসুম ?

কুসুম কহিল—জানি না ত বন্ধু, তবে যেতেই হবে। তোমরা ত রাখলে না—আমার ঠাঁই নেই এখানে।

—কুসুমের স্বল্পদেহখানাকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া গুরুচরণ কহিল—চলো কুসুম আমার ওখানে থাক্‌বে।

—তোমার ওখানে দিগম্বরী থাকতে দেবে কেন?

—দেবে, আমি রাখবো।

কুসুম গুরুচরণের বাহু জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—ঝগড়া করে থাকবো? যার ঠাঁই নেই তার যাওয়াই ভাল।

গুরুচরণ তাহার মুখখানি কুসুমের ওষ্ঠের অতি সন্নিকটে আনিয়া কহিল—আমাকে কি ভালবাসো কুসুম—আমাকে ভালবেসেছিলে?

কুসুম ভিজাকণ্ঠে কহিল—এতদিনেও কি বোঝো নি বন্ধু! তোমার জন্যে যে দুঃখ পেয়েছি, তাইতে আমি দুঃখিত নয়, ও আমাকে মেরে কি ক'রবে? মনের রোগ ত মেরে সারানো যায় না!

গুরুচরণ কুসুমের বিবশ দেহখানাকে আগ্রহে বুকে চাপিয়া ধরিল—যেন বহু দিবসের পরে কোন দুর্লভ রত্ন তাহার অতি সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গুরুচরণ অর্থহীন প্রলাপের মত কহিল—আজ আমার দিন সার্থক!

বুকের মাঝে কিসের একটা উষ্ণতা অনুভব করিয়া গুরুচরণ চাহিয়া দেখিল—কুসুমের চোখের জলে তাহার বুক ভিজিয়া গিয়াছে, কুসুম তাহার বুকের মাঝে মুখ লুকাইয়া কহিল—তুমি কি ভালবাসো বন্ধু?

গুরুচরণ জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু একটা শব্দ অকস্মাৎ কাণে প্রবেশ করিল। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, কে যেন নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, বৈঠা নৌকার 'ডালি'তে লাগিয়া খট্ খট্ করিতেছিল। কুসুম তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করিয়া কহিল—কে?

—কি জানি !

একটু পরেই একটা অত্যন্ত বীভৎস অক্ষম গানের সুর কাণে আসিল। বিপিন গাহিয়া যাইতেছে—

পোড়ারমুখী কলঙ্কিনী রাই লো
তোর মত কুল মজানী গোকুলে আর নাই লো।

গুরুচরণ তাড়াতাড়ি কহিল—আমি যাই কুসুম। যাই—

কুসুমের জবাব দিবার পূর্ব্বেই গুরুচরণ আসিয়া নিঃশব্দে আপন ডোঙ্গায় উঠিল। ছায়া-ঢাকা খালের পথে বাঁধালে ফিরিয়া আসিয়া দেখে একটা মাঝারি রুইমাছ ফালার জালের মধ্যে পড়িয়া ছটফট করিতেছে—সে সোল্লাসে তাহাকে ডোঙ্গায় তুলিয়া লইল।

রসিক হাট হইতে ফিরিয়া আহারাদি অন্তে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছে—এমন জোছনা রাত্রে ঘরে থাকা যায় না। নির্ম্মেঘ আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ হাসিতেছে—নবীন বৈরাগী একতারা বাজাইয়া গান গাহিতেছে। দূরে নদীতে মাঝিরা পাল তুলিয়া দিয়া নৌকার ছাদে বসিয়া গান গাহিতেছে। বাড়ীর আশে পাশে শালুকফুল ফুটিয়া একটা আর্দ্র সুগন্ধ পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। দীর্ঘকায় গাছগুলি নিঃশব্দে আকাশের গায়ে ছবির মত লাগিয়া রহিয়াছে—চাঁদের আলো বিলের তরঙ্গায়িত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝিকমিক্ করিতেছে—কুসুম একটা পুলক আবেশে ঘুমাইতে পারিতেছে না। গুরুচরণের এই স্পর্শটুকু তাহার মৃত-প্রায় দেহের প্রতি রক্তবিন্দুকে যেন নূতন জীবন দিয়া সঞ্জীবিত করিয়া দিয়াছে। সে বার বার চোখ বুজিয়া সেই স্পর্শটুকুকে যেন অনুভব করিতেছে—রসিকের বুকখানা এমনি প্রশান্ত নয়, এমনি ব্যাকুলতা ভরা

বাহু তাহার নাই, এমনি স্পর্শ তাহার নহে! রসিকের বুক হইতে এমনি করিয়া স্নেহ প্রীতি অমৃতের মত ঝরিয়া পড়ে না।

রসিক ডাকিল—কুসুম, দরজা খোল্।

কুসুম দরজা খুলিয়া দিল। রসিক সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিয়া কহিল—বল্, গুরো আজ আবার তোর কাছে এসেছিল কেন? তোকে আজ খুন ক'রবো। ঘরে থেকে আস্‌নাই ক'রবে—আবার শরীর খারাপ।

কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—কেউ আসে নি!

—আসে নি? মিথ্যাবাদী—শালী—রসিক তাহার হাত মোড়াইয়া বসাইয়া ফেলিল।

কুসুম আর্ত্তকণ্ঠে কহিল—উ হু হু, বল্‌ছি বলছি—

রসিক হাতখানাকে একটু ছাড়িয়া দিতেই কুসুম কহিল—রাঙাদি বলেছে ত?

—হ্যাঁ, রাঙাদি বলেছে, আর বিপিন দেখেছে।

—বিপিনকে আস্‌তে না করেছি তাই রাঙাদি রেগে মিথ্যা বলেছে।

রসিক তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিয়া কয়েকটা আঘাত করিয়া কহিল—আবার মিথ্যা কথা, তোর কত সয় দেখবো, চল্ ঘরে—সড়কি দিয়ে তোকে আজ—

কুসুমকে বসাইয়া রাখিয়া রসিক সড়কি বাহির করিয়া আনিল। সড়কির উজ্জ্বল ফলকটা বুকের উপর রাখিয়া সে কহিল—বল্, গুরো তোর কে? যাবি ত এক্ষুনি তার বাড়ী যা—তোর—

কুসুমের অতৃপ্ত-কামনা উল্লেখ করিয়া রসিক অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিল, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অশেষ ভাবে অত্যাচার করিল, কিন্তু কুসুম কোন

উত্তর করিল না। নীরবে কেবল চোখের জল ফেলিল, একবারও কহিল না—আর পারি না, আর মেরো না।

রসিক অত্যাচার করিতে করিতে ক্রমশঃই উত্তেজিত হইতেছিল—কুসুমের নির্ব্বাক সহনীয়তা তাহাকে যেন আরও ক্ষিপ্ত করিয়া দিল। রসিক শাসাইল—কাল চিম্‌টে-পোড়া দিয়ে দাগ দিয়ে দেব। তোর মত মাগী নিয়ে ঘরে থাক্‌বো, কখনই না—দূর ক'রে দেব। যা—

সঙ্গে সঙ্গে পদাঘাত করিয়া কুসুমকে সে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। কুসুম কাতরোক্তি করিল না, আর উঠিল না। রসিক ফিরিয়াও দেখিল না, যে কুসুমের রুগ্ন শক্তিহীন দেহখানা সংজ্ঞাহীন হইয়া সমস্ত যাতনার অতীত হইয়া পড়িয়াছে।

রসিক প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া কুসুমকে ডাকিল কিন্তু সে জবাব দিল না। তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ তখনও মাচার অদূরে পড়িয়াছিল। রসিক পা দিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিল—আবার মুচ্ছো গেছে, মর শালী এমনি ক'রে—বালাই যায়।

রসিকের হৃদয়ে আজ কোন করুণা, কোন মমতা ছিল না। একটা দুর্ব্বার নিষ্ফল প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার অনুশোচনা তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে মূর্চ্ছিত কুসুমের পানে না চাহিয়াই 'দোয়াড়' দেখিতে গেল।

কুসুম যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল তখন বেশ বেলা হইয়াছে—বাহিরে পরিষ্কার রৌদ্র ঝলমল করিতেছে কিন্তু রসিক কোথায়ও নাই। এমনি অবস্থায় যে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সে কেমন করিয়া এ গৃহে থাকিবে? ভাবিতে ভাবিতে তাহার অভিযোগ গুরুত্ব

লাভ করিল, আনন্দহীন গৃহে কেবল অসহায়ের মত লাঞ্ছনা সে কেন সহ্য করিবে! তাহার কি কোন উপায় নাই? ধীরে ধীরে উঠিয়া দেখে—কাপড়ের একটা স্থান রক্তাক্ত। রসিকের পায়ের নখ লাগিয়া একটা স্থান কাটিয়া কাপড়ে রক্ত লাগিয়াছে। কাল সে কাঁদে নাই কিন্তু রক্তাক্ত বস্ত্রের অংশটুকু সামনে ধরিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। এমন করিয়া কি মানুষ মানুষকে মারে। পদাঘাতের বেদনাটা সে যেন নতুন করিয়া এবং দ্বিগুণ করিয়া বোধ করিতেছে।

কুসুম গৃহদ্বার হইতেই দেখিল, একখানা ছৈ-দেওয়া নৌকা ঘাটে ভিড়িল। একটি আধাবয়সী বৈরাগী ও বছর উনিশ-কুড়ি বছরের একটি স্বাস্থ্যবতী বৈষ্ণবী নামিয়া আসিয়া কহিল—ভিক্ষে দাও মা।

কুসুম কহিল—বোসো।

বৈরাগী একতারা বাজাইয়া ও বৈষ্ণবী জুড়ি বাজাইয়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমের একটা গান করিল। কুসুম কিছুক্ষণ শুনিয়া বাহিরে আসিল। গান থামিলে বৈষ্ণবীকে প্রশ্ন করিল—আখড়া কোথায়?

—ওই ত এই বিলের ওপার। শ্যামপুরের আখড়া—

বৈরাগী কুসুমের ম্লান মুখ লক্ষ্য করিয়া কহিল—মনের দুঃখ এক শ্রীকৃষ্ট ছাড়া কেউ বোঝে না ভাই—হরিনাম বিনে আর গতি নেই; তার পায়েই মুক্তি—

বৈষ্ণবী একগাল হাসিয়া, পানের ছিবড়েগুলিকে দাঁতের উপর হইতে গালের মধ্যে নামাইয়া কহিল—ঘরে কি শান্তি আছে! কেবল লাঞ্ছনা গঞ্জনা—শ্রীকৃষ্টের পায়ে যদি সব সমর্পণ ক'রতে পারো তবেই—তোমাদের এখানে আজ তাঁর ভোগ দেওয়া যায়!

কুসুম কি যেন একটু ভাবিয়া কহিল—হ্যাঁ, এখানেই আজ ঠাকুরের ভোগ দাও, আমি রান্নার জোগাড় করেছি, তবে আমরা গরীব?

—গরীবের পূজোই ত নন্দলাল নেন, তিনি যে গোয়ালার ছেলে।

কুসুম কহিল—তবে তাই হোক্, কেমন ?

বৈরাগী ও বৈষ্ণবী রাঁধিতে আরম্ভ করিল। গ্রামে গ্রামে নৌকাসহ ভিক্ষা করা এবং ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ইহারা বর্ষাকাল কাটাইয়া দেয়। বৈষ্ণবী কুসুমের সঙ্গে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। কথা প্রসঙ্গে নবীন বৈরাগীর কথা উঠিল, বৈষ্ণবী একটু ব্যঙ্গ করিযা কহিল—ও ত ভণ্ড, সহজ প্রেম ছাড়া কি কৃষ্ট প্রেম হয় ?

—সহজ প্রেম ?

—হ্যাঁ, যে মানুষকে ভালবাসলে না সে ভগবানকে ভালবাসে ? আমার ঠাকুর প্রেমিকের কাছেই ভগবান প্রেম রয়েছে।

কুসুম একটু ভাবিয়া কহিল—কিন্তু মানুষের ভালবাসা কি মেলে ?

বৈষ্ণবী কথা প্রসঙ্গে কুসুমকে সান্ত্বনা দিল—এই সান্ত্বনা প্রসঙ্গে কুসুমের রুদ্ধ বেদনার স্রোত বাঁধ ভাঙ্গিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল—এমনি মার, আর লাঞ্ছনা ত আর সহ্য করিতে পারি নে ভাই !

বৈষ্ণবী কহিল—আর কেঁদো না ভাই, শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়ে তাকে ভাবো, ভালবাসো—

বৈরাগী ও বৈষ্ণবী অনেক কথা কহিল, তাহাদের কথার মাঝে কুসুম যেন একটা পরম তৃপ্তি পাইল। এমনি সান্ত্বনা. এমনি সমবেদনা যেন সে কোথাও পায় নাই।

রসিক বাড়ী ফিরিয়া এই অতিথিগণকে দেখিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার বাড়ীতে, তাহার বিনানুমতিতে, অনুপস্থিতিতে এই অপচয় ও ব্যসন যে একটা ঘোর অন্যায় তাহা সে সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত

করিয়া ফেলিল কিন্তু উহাদের সাম্‌নে কিছু বলিল না। কুসুম উঠিয়া যে রাঁধিতেছে তাহা দেখিয়া একটা স্বস্তিও বোধ করিতেছিল—ক্রুদ্ধ অবস্থায় অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে বটে কিন্তু গৃহে মূর্চ্ছিত কুসুমের কথা ভাবিয়া একটা অস্বস্তিও বোধ করিয়াছে।

রসিক আহারাদি করিয়া কোথায় যেন আবার চলিয়া গেল। বৈষ্ণবী ও বৈরাগী কুসুমের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া অপরাহ্নে নৌকা ছাড়িয়া চলিয়া গেল কিন্তু গ্রাম ছাড়িল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রসিক কতকগুলি বড় বড় চিংড়িমাছ লইয়া ফিরিল। কুসুমকে উদ্দেশ করিয়া ক্রোধকর্কশ স্বরে কহিল—তাড়াতাড়ি রেঁধে দে—

কুসুম জবাব দিল না। রসিক মুখ ভেংচাইয়া কহিল—দজ্জাল মাগী, এটা দানছত্তর পেয়েছো, না? বোষ্টম খাওয়ানো হয় কার হুকুমে? নিজে রোজগার করে পুণ্যি কর গে।

—দুটো লোকও কি খাওযাতে পারি না? কুসুম জবাব দিল। তাহার প্রশ্নটা ছিল এই অধিকারটুকুও কি তাহার নাই? কথাটার মধ্যে একটা তীব্র অভিমানের ঝাঁজ ছিল রসিক তাহা বুঝিল না। রসিক মুখ খিঁচাইয়া একটা অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া কহিল—লোক খাওয়াবি, এটা—পেয়েছিস্?

কুসুম আর কোন কথা কহিল না, নিঃশব্দে চিংড়ি মাছ কুটিতে বসিল।

রসিক মাছ ধরিবার যন্ত্রাদি কিছু কিছু সংস্কার করিয়া, সন্ধ্যার অনতিকাল পরে খাইয়া বাহির হইয়া গেল কুসুমকে কিছুই বলিয়া গেল না।

সেদিনও তেমনি চাঁদ উঠিয়াছিল কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। একটা ফিকে অস্পষ্ট আলোয় বস্তু ও ব্যক্তির সীমারেখা বোঝা যাইতেছে কিন্তু

তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। পাতলা মেঘের দল হাল্‌কা ভাবে উড়িয়া চলিয়াছে। আকাশের প্রান্তে একটা তারা জ্বল জ্বল করিতেছে। কুসুম লক্ষ্য করে নাই এতদিন—সবুজ তারাটা এত উজ্জ্বল কখন হইল! ওটা কি?

দাওয়ার উপরে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কুসুম পৈঠায় পা ঝুলাইয়া খুঁটি হেলান দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। দূরে—দূরে—বহু দূরে ঐ যে নীল আকাশ উহা কি, ওর ওপারে কি পৃথিবীর মত এমনি দেশ আছে! সেখানে এমনি সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নায় সংসার চলে! সেখানে এমনি রঙীন পৃথিবী, ফল ফুল লতা পুষ্প জলস্থলময় এই পৃথিবীর মত কোন পৃথিবী আছে? সেখানে কি তাহার মত করিয়া কেহ ভালবাসিয়াছে—সেখানে কি এমনি নর-নারী আছে। সেখানেও কি তৃপ্তিহীন, আশ্রয়হীন গৃহ আছে, এমনি লাঞ্ছনা আছে, এমনি অবিচার আছে? কুসুম বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবে—

রাত্রি কত হইয়াছে কে জানে! "কুল্লো" বহুক্ষণ পূর্ব্বে এক প্রহর ঘোষণা করিয়াছে—পাখী দুইটির চীৎকার জলপ্লাবিত গ্রামে প্রতিধ্বনিত হইয়া গিয়াছে—সেও কতক্ষণ আগে। চাঁদ মাথার উপর আসিয়াছে—উঠানে ছায়াগুলি ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া আসিয়াছে, বারান্দায় যে নারিকেলের গাছের অস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছিল তাহাও উঠানে নামিয়াছে।

রসিক ঘাটে ডোঙ্গা বাঁধিয়া আসিয়া ডাকিল—কুসুম।

কুসুম জবাব দিল না, জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

রসিক কটূক্তি করিল—মুখ পুড়েছে নাকি রে, কথা বল্‌তে পারিস্‌ নে?

কুসুম জবাব দিল না। রসিক আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া

কহিল—গুরো আবার আজ এসেছিল কেন? বল? তোর—আজ দেখে নেব কত সয়—

কুসুম কোন জবাব দিল না, রসিকেরআকর্ষণে কতকগুলি চুল পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল, সে কোনও কাতরোক্তি করিল না। রসিক নির্ম্মম ভাবে তাহার বাহুর একটা স্থান দুই আঙুলের মাঝে ধরিয়া মোড়াইতে মোড়াইতে কহিল—ভেবেছিস্ আমি চলে গেছি, না? লোক লাগিয়ে গিছি তোমার সতীপনা দেখ্‌তে—সন্ধ্যায় গুরো আসে নি?

কুসুম একটু কাতরোক্তি করিয়া কহিল—উহুঃ—কেউ ত আসে নি?

—নাঃ সাধু। রাঙাদি যে পাহারা ছিল, এতক্ষণ তা জানিস?

—না।

—তা জানবি কেন? গুরো এসেছিল তা জানিস্?

—না কেউ আসে নি, না গো কেউ আসে নি—উঃ—

রসিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—শালী তোর এত জেদ। দাঁড়া। বলদ জব্দ ক'রলাম আর তোকে পারবো না—ঘর হইতে নড়িখানা আনিয়া সে আঘাত করিতে করিতে কহিল—কেমন?

কুসুম এইবার চীৎকার করিয়া উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আর পারি নে, আর মেরো না, পায়ে পড়ি—আমায় দূর করে দাও চলে চাই—

—যা দূর হ'য়ে যা—

কুসুম দাওয়ায় আহত কবুতরের মত ছটফট করিতেছিল। রসিক তাহাকে ঘরের মেঝেয় টানিয়া লইয়া গিয়া কহিল—থাক্ এখানে, কাল সকালে তোর নড়া চড়ার দফা শেষ ক'র্‌বো। মুগুর দিয়ে হাত পা টুণ্ডুমুণ্ডু করে থোবো।

কুসুম মেঝেয় পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল? নড়ির

আঘাত কয়েকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে, হাতে তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। সমস্ত মাথায়, চুলের গোড়ায় একটা অসহ্য বেদনা হইয়াছে—হাতের কব্জিতে যে আঘাত লাগিয়াছে তাহার জন্যে হাতটা সোজা করিবার উপায় নাই। কুসুম হাতড়াইয়া দেখিল—একটা আহত স্থান হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতেছে। সে নিশ্চেষ্ট নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল।

রসিক বিছানায় শুইয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে, হয় ত কুসুমের জিদ ভাঙ্গিবার একটা নূতনতম নিপীড়ন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিতেছে। কুসুম শিহরিয়া উঠিল—নিত্য লাঞ্ছনার চেয়ে মৃত্যু ত অনেক ভাল।

রাত্রি নিশীথ।

কুসুম ঘুমায় নাই, শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগে সে জাগিয়া অনেক কথা ভাবিতেছিল—এই গ্রাম কি সুন্দর। এমনি স্বচ্ছতোয় নদী, এমনি বাঁশবনঘেরা ঘাটের পথ। এরা যেন বড় আপনার, বড় প্রিয়— এমনি জলভরা মাঠ, এ যেন পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই।

রসিক ঘুমাইয়াছিল—তাহার নাসিকাধ্বনি থাকিয়া থাকিয়া কুসুমকে চমকাইয়া দিতেছে।

কুসুম উঠিয়া বসিল, ঘরের মধ্যে মাছ ধরিবার যন্ত্রাদির জন্যে বহু "সলা" ছিল তাহার কয়েকটি হাতে করিয়া সে বাহিরে আসিল। দরজার শিকলটা ভাল করিয়া দিয়া, তালার পরিবর্ত্তে সলা কয়েকটি লৌহছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিল। তাহাকে আজ যাইতেই হইবে—এমনি করিয়া আর চলে না। এ গৃহ তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে—বাহিরে তেমনি জ্যোৎস্না। তন্দ্রাগত পৃথিবীর মুখের পানে চাঁদখানা এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। শঙ্কা-ব্যাকুল পৃথিবী যেন মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে—পল্লব ঘন বাঁশবনের ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। শালুক ফুলগুলি জোছনায় ঝিকমিক করিতেছে—

ধানের ক্ষেতের অঞ্চলপ্রান্তে জরির ফুলের মত—কুসুম চারিপাশে চাহিয়া দেখিল, বড় সুন্দর !

গোহালে দুগ্ধবতী গাভীটার গায়ে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, সে চোখ বুজিয়া রোমন্থন-নিরত। কুসুম ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, চিরদিনের অভ্যাসমত গাভীটি গলা বাড়াইয়া দিয়া কুসুমের হাতখানা চাটিল। কুসুম তাহার গলাটা চুলকাইয়া দিয়া মনে মনে কহিল—এই শেষ, ধবলী আর দেখা হইবে না। চিরদিনের মত আমি যাইতেছি, আমার কথা মনে করিয়া আর লাভ নাই। জ্বলন্ত বুক চিরিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ডে নামিয়া আসিল। রক্তাক্ত বস্ত্রের প্রান্তে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া আবার মনে মনে কহিল—চলিলাম, আমার কথা ভুলিয়া যাইও, আমি ত থাকিতে পারিলাম না।

গরুটির সর্ব্বাঙ্গে সস্নেহ হাতখানি বুলাইয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারই উপ্ত গাছে কুমড়া ফলিয়াছে—একটি কুমড়ার উপর চাঁদের আলো ঝিকমিক্ করিতেছে। কুসুম হাত বুলাইয়া দেখিল—পাকিতে আর বিলম্ব নাই। রসিক কুমড়ার সেকৃচি ভালবাসিত, কে তাহাকে রাঁধিয়া দিবে—দাওয়ায় মাটি দিয়া লেপন-কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। তবুও যাইতেই হইবে, কুসুমের চোখ ফাটিয়া জল আসিল। মনে মনে সে রসিককে প্রশ্ন করিল—এমন ক'রে আমায় তাড়ালে কেন ?

পিছন ফিরিয়া বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গে একটা স্নেহার্দ্র দৃষ্টি বুলাইয়া সে জলে নামিয়া পড়িল—এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া গিয়া রাস্তায় উঠিল। তরুচ্ছায়াময় রাস্তার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া জলবেষ্টিত বাড়ীখানির প্রতি আর একবার চাহিল—হায় হায়, এর প্রতিটি রেণুকে সে কত ভালবাসিয়াছিল, কতদিনের কত শ্রম, কত আগ্রহ, কত আশা ঐ

বাড়ীখানিকে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়াছিল। সবই রহিল, শুধু তাহাকেই চলিয়া যাইতে হইবে। একটু আশ্বাস, একটু ভালবাসা পাইলে সে ফিরিয়া যাইত—রসিক যাহাকে হত্যা করিয়াছে, সে যদি "মা" বলিয়া ডাকিত তবে সে রসিকের অত্যাচারে প্রাণ দিতে পারিত কিন্তু এই ভিটা ছাড়িত না।

অন্ধকারের মাঝে মন্থরগতিতে কুসুম চলিল—নিস্তব্ধ গ্রামের উপরে প্রসুপ্তির ঘনান্ধকার—ঘুমন্তপুরীর মত সকলই নীরব।

কুসুম সন্তর্পণে জল ভাঙ্গিয়া গুরুচরণের বাড়ীর উপরে উঠিল। গুরুচরণ বাহিরেই শুইয়া আছে—তাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে হইবে—যাহার সঙ্গীত শুনিবার আকাঙ্খায় সে রান্নাঘরে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

কুসুম গুরুচরণকে ঠেলিয়া জাগাইয়া মুখ চাপিয়া ধরিল, ইঙ্গিতে জানাইল—এসো।

গুরুচরণ মন্ত্রচালিতের মত তাহার পিছন পিছন নদীর ধারে বটের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। স্থানটি এখনও ডুবিয়া যায় নাই। দত্ত মহাশয়ের আমের বাগান তখনও জলে ভরিয়া যায় নাই, পাশের জঙ্গলটার কোলে মাত্র জল গিয়াছে।

গুরুচরণ কুসুমের হাত ধরিয়া থামাইয়া কহিল—কি কুসুম?

কুসুম দুইবাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মাঝে মুখ লুকাইল। গুরুচরণ বুঝিল, কুসুমের উষ্ণ অশ্রুধারায় তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। কুসুম অত্যন্ত কাতরতাকম্পিত আর্দ্রকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া কহিল—একটা কথা ব'লব?

—বল।

—আমাকে কি ভালবাস্‌তে বন্ধু?

গুরুচরণ কহিল—হ্যাঁ, কুসুম তা কি আজও জানো না। তোমার

জন্যে—গুরুচরণেরও কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল—সে নিরুপায়, কেমন করিয়া সে আজ বুঝাইবে যে কুসুমই তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া রঙীন মেঘের মত বসিয়া আছে।

কুসুম কহিল—আমি যাচ্ছি বন্ধু—মনে রেখো তোমাকে একজন প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসেছিল।

গুরুচরণ শঙ্কাব্যাকুল প্রশ্ন জানাইল—কোথায় যাবে? কেন যাবে?

—তোমরা রাখলে না, তাড়িয়ে দিলে তাই ত যাবো। নইলে তুমি জানো না বন্ধু তোমাদেরকে, তোমাদের গ্রামকে কত ভালবেসেছিলাম। কুসুম আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। যাহা সে চহিয়াছিল তাহা ত তাহাদের সমাজ দিল না।

গুরুচরণ কহিল—কেন যাবে? তবে কেন যাবে?

কুসুম গুরুচরণের হাতখানা ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল—কোন ফাঁকে তাহার মুখের উপর শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে—তরল একটি জলধারা গণ্ডের উপর ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। আর এক ফোঁটা—আর এক ফোঁটা গড়াইয়া আসিয়া গুরুচরণের হাতের উপর পড়িল।

গুরুচরণ সমস্ত ভুলিয়া কেবল ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া গমনোন্মুখ কুসুমকে আজ সে আটকাইতে পারে, এমন কোন শক্তি তাহার আছে যাহা দ্বারা সে আজ আটকাইতে পারে। এ গ্রামকে যে এত ভাল-বাসিয়াছিল সে আজ কেন যাইবে। কিছুতেই নয়, কুসুমকে সে কিছুতেই যাইতে দিবে না। যদি ভালবাসিয়াছে তবে কেন সে যাইবে—কিসের একটা শব্দ হইল। গুরুচরণ বটগাছের অন্তরালটা ভাল করিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিল চাহিয়া দেখে কুসুম নাই—এদিক ওদিক চাহিল—কুসুম নাই। মুহূর্তে সে কোথায় গেল? পাশের জঙ্গলের অন্তরালে

আত্মগোপন করিয়াছে কি ? গুরুচরণ চাপা কণ্ঠে ডাক দিল—কুসুম, কুসুম যেও না লক্ষ্মীটি !

কোন শব্দ নাই। আমবাগানের মাঝে যাইয়া ডাকিল—কুসুম। কেহ উত্তর দিল না—জঙ্গলের প্রান্তে দাঁড়াইয়া ডাকিল, কেহ উত্তর দিল না। যতখানি ডাঙ্গা জায়গা আছে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল কিন্তু তাহার ডাকে কেহ সাড়া দিল না। গুরুচরণের বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল—কেন সে বিমনা হইল, কেন সে তাহাকে ধরিয়া রাখিল না।

গ্রামের সড়ক দিয়া ছুটিতে ছুটিতে সে ডাকিল—কুসুম। তবুও কেহ জবাব দিল না। কিন্তু জলে নামিলে ত শব্দ হইত—জলে সে নিশ্চয়ই নামে নাই। গুরুচরণ আবার বটতলায় ফিরিয়া গেল কিন্তু শত ডাকেও কেহ আর উত্তর দিল না। গুরুচরণ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—কুসুম। তাহার ডাক নদীর ওপারে প্রতিধ্বনিত হইয়া মিলাইয়া গেল।

খালের মুখে অন্ধকার বনচ্ছায়ায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর যে ডিঙ্গিখানা বাঁধা ছিল তাহা ততক্ষণে স্রোতের বেগে ভাসিয়া গিয়া বিলের মাঝে পৌঁছিয়া গিয়াছে—সেখানে গুরুচরণের ডাক আর পৌঁছিবে না।

গুরুচরণ খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ দেখে প্রভাত হইয়াছে—সে হাতের পাতায় চোখ মুছিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। মনে মনে কহিল—কুসুম, তুমি আর আসিবে না ?

বাড়ীতে তখন ঘন ঘন হুলুধ্বনি পড়িতেছে—দিগম্বরীর দ্বিতীয় বিবাহ কাল সমুপস্থিত।

প্রায় ছয় বৎসর পরের কথা—

শীতকাল—মাঘের প্রথম হইবে। সকালবেলা পূর্বদিক হইতে উষ্ণ

রৌদ্র গুরুচরণের উঠানে আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরের উনানে খেজুর রস জ্বাল হইতেছিল, তাহারই উত্তাপে বসিয়া গুরুচরণ ও রসিক তামাক খাইতেছিল আর অলস গল্প করিয়া যাইতেছিল। অদূরে গুরুচরণের ছেলে একখানা ভাঙা কাটারী লইয়া নিবিষ্ট মনে একটা গাছের ডাল মাঝ উঠানে লাগাইতেছিল। একখানা ন'হাতী ধুতী দুই ভাঁজ করিয়া তাহার গায়ে বাঁধিয়া দেওয়া। ঘাড়ের কাছে বড় কাপড়ের গিঁট্টি কাটারী চালনার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। সকালে প্রাতঃরাশ হিসাবে একটা মুড়ির মোয়া খাইয়াছিল তাহার ধ্বংসাবশেষ সর্ব্বমুখে জড়াইয়া আছে। ক্ষুদ্র মানবকটি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া নিরুদ্বেগে গর্ত্ত খুঁচিয়া যাইতেছে।

গ্রামটা যেমন চলিত তেমনি চলিতেছে, কোথায়ও বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। বৃদ্ধ ষষ্ঠীচরণ মারা গিয়াছে, রসিকের চাষআবাদ করা একটু কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু অবশেষে গুরুচরণের সহিত "গাঁতায়" কাজ আরম্ভ করে। নিজের সামান্য জমির সহিত গুরুচরণের জমি চাষ করে এবং তাহারই বাড়ীতে খায়। নবীন বৈরাগী তাহার দুর্ব্বল পা খানার উপর ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গ্রামে গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। কুসুমের কথা আজ সব ভুলিয়া গিয়াছে—কিছুদিন আলোচনা হইয়াছিল, কোথায় গেল! কেহ কেহ বলিল—শ্যামপুরের আখড়ায় গিয়াছে, তারপরে সেখান হইতেও সে চলিয়া গিয়াছে—কোথায়, কেহ জানে না।

রসিক কহিল—বিষ্টুপুরের মেলায় কবিগান এয়েছে রে গুরো, চল একদিন শুনে আসি।

—সরকার কে?

—হরিমতী আর শ্রীমন্ত দাস।

—তা হলে কবি ভালই জমবে রসিকদা একদিন যাওয়া দরকার।

—যাবি ? চল আজই যাই।

গুরুচরণ কহিল—আজ কি হয় ! হাট না ক'রলেই নয়—তারপরে কি আর ন'দশ মাইল রাস্তা যাওয়া যায়, যেতে যেতে গান যাবে শেষ হ'য়ে !

—তবে কাল—কেমন ? শুন্‌ছি শ্রীমন্ত নাকি খুব ভাল 'লালি' গায়।

—তুমি ত 'লালি' কবিই শোনো, আমার ত ঘেন্না করে।

—থাম্ গুরো, থাম্, লালি খারাপ লাগে অত সাধু কে আছে ?

নবীন বৈরাগী একতারা হাতে করিয়া আসিয়া কহিল—গুরো সর, একটু তাতাই। শীতে পা দু'টো একেবারে অবশ হ'যে গেছে।

নবীন উনুনের পাশে বসিয়া পা সেঁকিতে সেঁকিতে কহিল—উঃ মাটি যেন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে ! পায়ে লাগলে মাথা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করে। অদূরে পাণ্ডুর শীতার্ত্ত মৃত্তিকার পানে চাহিয়া সে চুপ করিল।

—হোঁচট লেগেছে নবীনদা ?

—হ্যাঁ, খোঁড়া পা-ই খালে পড়ে।

নবীনের উরুদেশের খানিকটা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুচরণ রসিকের সড়কির দাগটাকে দেখাইয়া কহিল—রসিকদার কীর্ত্তি, সড়কি মারলে নবীনদাকে !

রসিক কহিল—ওকথা আর তুলিস্ সে গুরো, বড় লজ্জা করে।

—তোমার মাথাটা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল রসিকদা—কুসুম গেল, পরদিন তোমার সে কি কান্না ! এতই যদি কাঁদলে, তবে আগের দিনে অমন মারলে কেন ?

রসিক হাসিয়া কহিল—নে হ'য়েছে, মেয়েমানুষের জন্যে অমন মাথা খারাপ অনেকেরই হয়, তার আবার কি ? নবীনদা, কি তোমার সে গানটা ?

নবীন কিছু কহিল না। গুরুচরণ একটু সুর করিয়া গাহিল—

'ও মেয়ের প্রেম করিস নে ভাই তোরা!
মেয়ের সঙ্গে প্রেম করিলে হবি জারাজরা।
মেয়ের জন্যে রাম যায় বনে দশরথ বাসি মরা।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিয়া কহিল—রসিকদার কি কান্না। কেন তাকে মারলাম! কেন তাকে লাথি মারলাম!

রসিক লজ্জায় মাথা নত করিল—কুসুমকে লাথি মারিয়াছিল বলিয়া নয়, কুসুমের বিদায়ের পরের দিন কাঁদিয়াছিল বলিয়া। একটা সামান্য স্ত্রীলোকের জন্যে কাঁদিয়া যে অপৌরুষের কার্য্য হইয়াছে তাহার জন্যে সে মনে মনে সত্যই লজ্জিত হইয়া পড়িল। কহিল—থাম্, সে সব কথা আর কেন?

নবীনের মুখের দিকে চাহিয়া উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া গেল—তাহার নিষ্প্রভ চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। নবীন ধীরে ধীরে কহিল—তোরাই ত তাকে থাক্‌তে দিলি নে! মেরে ধ'রে অত্যাচার করে তাড়িয়ে তবে ছাড়লি! সে যে এ গ্রামখানাকে কত ভালবাসত—তা ত তোরা জানিস্ নে! কোথায় গেছে কে জানে! কত কষ্ট পাচ্ছে, পেটের দায়ে কি ক'রছে কে জানে।

নবীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই ফোঁটা চোখের জল তাহার শুভ্র দাড়ির উপর দিয়া গড়াইয়া কণ্ঠে আসিয়া থামিল। গুরুচরণ কহিল—নবীনদার ত সব তাতেই কান্না। যারা গেছে তার জন্যে কেঁদে কি হবে? তারা কি ফিরে আস্‌বে?

নবীন ধীরে ধীরে কহিল—ফিরে কি আর আসে? কিন্তু কান্না পায় তাই কাঁদি, ফিরবে বলে কি কাঁদি।

নবীন তাহার সুতীর চাদরের প্রান্তে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া, কহিল—

কুসুম চ'লে যাওয়ার পরে, তারই লাগানো মোরগ ফুলের গাছে ফুল ফুটেছিল—জলের মাঝে তার ছায়া কেমন খেলা ক'রত। তুলসীতলাটা কেমন সুন্দর পরিষ্কার থাকৃত—বাড়ীখানা ঝম্ ঝম্ তক্ তক্ ক'রত।

গুরুচরণ কহিল—মেয়েমানুষ বাড়ীতে থাকলে অমন থাকেই, এসব কি পুরুষের কাজ?

নবীন উনুনের আগুনের উপরে শীতার্ত্ত হাতখানা বিছাইয়া দিয়া কহিল—হ্যাঁ, তাই ত হয়। রসিক বাড়ী ছেড়ে আজ ত তোর বাড়ীতে উঠেছে—ওর উঠানে জমেছে কত আগাছা। ওখানে জন্মাবে বড় বড় হিজল, তেঁতুল, বাঁশের ঝাড়।

রসিক পরিহাস করিল—আমি বেঁচে থাকৃতেই?

—না রে না, মোহনের বাড়ীতে যেমন জন্মেছে অমনি জন্মাবে—বহু দিন পরে। লোকে কেবল ব'লবে রসিকের ভিটে—ব্যস্, আর একটা ভিটে খালি হ'য়ে গেল—তোরা কি বুঝিস্? কুসুম যদি থাকৃত—তোরা কেন তাকে এমনি ক'রে দূর ক'রে দিলি?

রসিক ও গুরুচরণ চুপ করিয়া উভয়ের মুখের দিকে চাহিল। রসিক অকস্মাৎ বোধ করিল—মৃত্যুর পরে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন শূন্যতাময় —ওই বাড়ীটা হইয়াছে মৃত রসিকের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটে!

নবীন দূর দিগন্তের পানে চাহিয়া কহিল—মোহন, নটবরের ভিটেয় আমি কত রাত্রি গিয়ে বসে থাকি, তারা আমার কাছে কত নালিশ করে! তোরা কি গ্রামে বাস করিস্? এ যে শ্মশান, একেবারেই শ্মশান, কেবল ভূতপ্রেত ঘুরে বেড়ায়।

নবীন রসিকের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া আস্তে আস্তে টানিতে টানিতে কহিল—সেদিন দুপুর রাত্রে রসিকের বাড়ীতে বসেছিলাম—দেখলাম কুসুম একগলা ঘোমটা দিয়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। ডাক্লাম

—কুসুম, কি খুঁজিস্? কুসুম কথা ব'ল্‌লে না, কেবল কাঁদতে লাগলো। রসিক যাকে খুন করেছে সে একা একা তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপরে সে শুধোলে—গরু কোথায়? সে কুমড়োর মাচা কোথায়? আমি ব'ললুম—নেই। সে কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেল। তারপরে শুনি কে যেন কাঁদছে—ছোট্টো ছেলের মত কাঁদছে আর ডাক্‌ছে—মা! মা! জানিস্ তারা ওখানে রোজ আসে—রাত্রে গিয়ে দেখিস্।

নবীনের মুখে এমনি ভূতের গল্প শুনিতে সকলে অভ্যস্ত ছিল। গুরুচরণ একটু হাসিয়া কহিল—গ্রামের যত ভূত আর প্রেতের সঙ্গে কি তোমারই দেখা হয় নবীনদা!

নবীন সহসা কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পরে কহিল—তোরা কি দেখ্‌তে জানিস্, তা দেখ্‌লে দেখ্‌তিস্ ওরা তোর কাছেও আস্‌ত কথা ব'লত।

—আমরা ত কখনও কিছু দেখি না।

নবীন হাসিয়া কহিল—দেখ্‌তে ত পারিস্‌ই না, তা হ'লে ওরা কি অমনি ক'রে কাঁদে। তা হ'লে কুসুমই কি চলে যায়!

নবীনের চক্ষু আর একবার জলে ভরিয়া উঠিল। সে ব্যথিত আর্দ্র-কণ্ঠে কহিল—আমি কি দেখি জানিস্? এ গ্রাম ফৌৎ হ'য়ে গেছে, এক ঘরও মানুষ নেই, সব বাঁশবন আর জঙ্গল। আমি যেন সেই জঙ্গলের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াই, আর ওরা—চারিপাশ থেকে আমায় ঘিরে ধরে, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে—তোদের নামে নালিশ করে। অভিশাপ দেয়—শ্মশান হ'য়ে যাবে এ গ্রাম—সব শ্মশান হ'য়ে যাবে।

রসিক আর গুরুচরণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, একটা অনির্দ্দিষ্ট অপরিজ্ঞাত বেদনা ও ব্যর্থতা যেন তাহাদের অন্তরকেও ব্যথিত করিয়া তুলিল।

নবীন অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কহিল—কুসুমকে এমনি ক'রে তোরা তাড়িয়ে দিলি, আর তাই মনে ক'রে হাঁসিস্? তোরা কি মানুষ রে গুরো?

নবীন আপন উত্তরীয়প্রান্ত কোটরগত নিষ্প্রভ চোখের উপর চাপিয়া ধরিল। একটুক্ষণ পরে দূরদিগন্তের কোলে ধূসর-শীতার্ত্ত পাণ্ডুর মাঠের পানে চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—যাই, ভাই বার বাড়ী সাধতে হবে—

নবীন চলিয়া গেলে—দূরে, বহু দূরে জনহীন বন্ধুর মাঠের পাংশু পথের রেখার উপর দিয়া নবীন চলিয়াছে, গ্রামান্তরে ভিক্ষার্থে। উত্তরের শীতল বাতাসে উত্তরীয়প্রান্ত উড়িয়া উড়িয়া তাহাকে বার বার বিপর্য্যস্ত করিতেছে।

গুরুচরণ ও রসিক চাহিয়া চাহিয়া নবীনের গমনশীল ভগ্ন জীর্ণ দেহখানা দেখিতেছিল, অকস্মাৎ পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া উভয়েই হাসিয়া উঠিল। নবীনের এই অবান্তর কাহিনা ও অসংলগ্ন অশ্রুমোচন সবই যেন একেবারে অর্থহীন—হাস্যকর।

পরের দিন আহারান্তে রসিক ও গুরুচরণ মেলায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। একখানা লাঠি ও কম্বল লইয়া জামা গায়ে দিয়া যাইবার পূর্ব্বক্ষণে রসিক কহিল—পান বিড়ির খরচ কিছু নিয়েছিস্ গুরো? আর তোর ছেলের জন্যে কিছু-মিছু আন্‌তে হবে ত!

গুরুচরণ কিছু লইয়াছিল কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয় মনে করিয়া সে আবার ঘরে গেল—একটা হাড়ির তলা হাতড়াইয়া আর একটা টাকা বাহির করিতেছিল, দিগম্বরী পিছন হইতে কহিল—আবার টাকা কিসের, বুড়োকালে মেলায় যেয়ে মিঠাই খাবে?

খাবো, তোর কি ?

—খাও, খুব খাও। একখানা বঁটি এনো, মাছ কোটা বঁটি।

—হ্যাঁ, দশ মাইল রাস্তা তোর বঁটি টেনে আনি আর কি ? ও বাজার থেকে গড়িয়ে আনবো।

দিগম্বরী একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়া কহিল—সে আজ বছরখানেক ধরে আসছে—বঁটি আনতে পারো না, ভারি নবাব কিনা !

—যা, নিজের কাজে যা—যাচ্ছি গান শুনতে, বঁটি আনবো তোর জন্যে !

গুরুচরণ আর কথা না কহিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার দিগম্বর পুত্র আবদার করিল—বাবা তিলেখাজা—

—হ্যাঁ, বাবা আনবো তিলেখাজা, গুড়ের সন্দেশ—

—ছন্দেশ ?

—হ্যাঁ। যা—

গুরুচরণের পুত্র পুলকিত চিত্তে মাতাকে এ সুসংবাদ জানাইতে ছুটিল। রসিক ও গুরুচরণ তামাকুতে শেষ টান দিয়া রওনা হইল।

৬

দক্ষিণবাহিনী নদীর পশ্চিম পারে মেলা বসিয়াছে—মণিহারী দোকান, মিঠাই দোকান, কত রকমের দোকান, তাহার উত্তরে গানের আসর। সমস্ত মেলায় লোক জম জম করিতেছে। গানের আসরে বিছানা দেওয়া হয় নাই তবুও এখনই ভীড় হইযাছে।

সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। উত্তরের হিমশীতল বাতাস নদীতীরের বালু উড়াইয়া বহিয়া যাইতেছে। কনকনে শীতে সকলেই জড়োসড়ো হইয়া রহিয়াছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া মেলার স্থানটাকে দিনের মত করিয়া ফেলিয়াছে।

চিড়া ও খাগড়াই মুড়কী খাইয়া, পান বিড়ি কিনিয়া লইয়া তাহারা

গানের আসরের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানে বসিবার জায়গা করিয়া লইল। রসিক পান চিবাইতে চিবাইতে বিড়ি টানিতে টানিতে একটা দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কহিল—ওটা কি জানিস গুরো ?

উত্তর প্রান্তে সারি সারি কতকগুলি কুঁড়ে ঘর অন্ধকারের মাঝে মিশিয়া ছিল—নিবু নিবু ক্ষীণ একটু একটু আলো সেখানকার অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে—এবং কুঁড়ে ঘরগুলিকে অন্ধকারের পট-ভূমিকায় দৃশ্যমান করিয়া রাখিয়াছে। গুরুচরণ সেগুলি নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—কি রসিকদা ?

—ওই ত—পাড়া। যাবি দেখতে ?

—নাঃ ছিঃ। ওখানে যেয়ে কি হবে!

—পান খেয়ে আস্‌বি।

—পান ত খেলাম।

—ধ্যেৎ বেকুব কোথাকার—

কিছুক্ষণ বাদে গান আরম্ভ হইল। কবি গান রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে বেশ জমিয়াও উঠিল। নিদারুণ শীতের মাঝে শ্রোতৃমণ্ডলী কম্বল মুড়ি দিয়া স্থির চিত্তে বসিয়া শুনিতেছে। কেহ কেহ মাঝে মাঝে ‘বাহার’ দিতেছে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের প্রথম পাদে কয়েকজন উৎসাহী শ্রোতা তারস্বরে কহিয়া উঠিল—লালি ধরো—লালি। কবিওয়ালাদ্বয় মেলার কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনে ক্রমে ‘লালি’ ধরিল। অত্যন্ত অশ্লীল, কামনার তীব্র দুর্গন্ধ ও বীভৎসতাময় সঙ্গীত আরম্ভ হইল। শ্রোতৃমণ্ডলীর মাঝে যাহারা ঝিমাইতেছিল তাহারা তাড়াতাড়ি জাগিয়া ভাল হইয়া বসিল। অশিক্ষিত অন্তরে তীব্র কামনার লালসা জাগাইয়া হরিমতী অশ্লীল সঙ্গীত অত্যন্ত অশ্লীল ভঙ্গিতে গাহিতে লাগিল।

রসিক শুনিতে শুনিতে গুরুচরণের পিঠে চাপ দিয়া শুধাইতেছিল—কেমন? কেমন শুন্‌ছিস্?

গুরুচরণের কাছে এই নগ্নতা তেমন ভাল লাগে নাই, তবুও রসিকের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কহিল—ভালই।

—চল্ পান খেয়ে আসি। যাবি!

গুরুচরণ কহিল—চল—

চারি পাশে নিবিড় অন্ধকারের মাঝে মাঝে এক একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছে—তাহার স্বল্প আলোকের আলোছায়ার মাঝে কত লোক কিলবিল করিয়া সংকীর্ণ পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছে। কোন একখানা কুঁড়ে হইতে একটা অস্বচ্ছ টপ্পাগানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। লোকগুলি যেন সাপের মত কুঁড়ে ঘরের অরণ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। রসিক আগাইয়া গেল; গুরুচরণ পাছে পাছে অন্যমনস্ক ভাবে যাইতেছিল—এমনি পাড়ায় সে পূর্ব্বে কখনও আসে নাই।

তাহাদেরই সাম্‌নে একটা কুঁড়ে ঘরের দরজা খুলিয়া একটা লোক বাহির হইয়া আসিল—এক মুখ দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত পান চিবাইতে চিবাইতে। গুরুচরণের গায়ের মধ্যে ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল।

তাহার পিছনে পিছনে একটি স্বল্পদেহা নারীমূর্ত্তি কেরোসিনের ডিবা হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। রসিক ও গুরুচরণ তাহার দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নারীমূর্ত্তি ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গি করিয়া কহিল—পছন্দ হয়? রসিক আর্ত্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—কুসুম!

গুরুচরণ শঙ্কাব্যাকুলকণ্ঠে কহিল—কুসুম?

কুসুম ল্যাম্পের আলোয় তাহাদের মুখ দুইখানি দেখিয়া কহিল—

কে? কে? তাহার পরে মুহূর্ত্তে চিনিয়া তাড়াতাড়ি কুঁড়ে ঘরের মাঝে ঢুকিয়া দরজা দিল। গুরুচরণ কহিল—চলো, চলো রসিকদা।

গুরুচরণ রসিকের জন্য অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত পদে মাঠের পথে নামিয়া পড়িল।

গুরুচরণ শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাবৃত আইলের উপর দিয়া চলিতে চলিতে ভাবিতেছিল—কুসুম আজ এখানে, এমনি করিয়া জীবন কাটাইতেছে। রসিক আর সে উভয়ে মিলিয়াই তাহাকে তাড়াইয়াছে। তাহার মনে পড়ে আর একদিন। বিদায়ের দিনে বটের তলায় দাঁড়াইয়া সে কত আগ্রহে প্রশ্ন করিয়াছিল—আমাকে কি ভালোবাসো বন্ধু? বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিয়াছিল—তোমাদের গ্রামখানিকে কত ভালবাসিয়াছিলাম বন্ধু, কিন্তু থাকিতে দিলে না। গুরুচরণের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল—আজ সেই কুসুমের চোখের কোণে অশ্রান্ত অত্যাচারের কালিমা চিহ্ন পড়িয়াছে, দেহের মাঝে সে কমনীয়তা নাই, সে মাদকতা নাই, শীর্ণ শুষ্ক বিদীর্ণ পাণ্ডুর মৃত্তিকার মত শ্রীহীন। দুই হাতে বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া গুরুচরণ চলিতেছিল—ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল, একফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া তাহার হাতের উপর পড়িল। কুসুমের যাইবার দিন এমনি করিয়া একফোঁটা চোখের জল এই হাতখানার উপরেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল—গুরুচরণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া দ্রুতপদে চলিতেছিল।

রসিক গুরুচরণকে আকর্ষণ করিয়া কহিল—এও কি সহ্য ক'রবি গুরো? এ দেখে কি বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে?

—কি করবে? যাকে তাড়িয়ে দিলে—গুরুচরণ আর কহিতে পারিল না কাঁদিয়া ফেলিল।

রসিক গুরুচরণের হাতখানা মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—চল্ ওকে খুন ক'রে রেখে যাই।

গুরুচরণ ক্ষণিক দাঁড়াইয়া কহিল—হ্যাঁ তাই, রসিকদা ওকে খুন ক'রব।

দুইজনে দ্রুতপায়ে আবার মেলায় ফিরিয়া আসিল—দা-বঁটি-কাস্তির দোকানে দরদস্তুর করিয়া গুরুচরণ দশ আনায় একখানা দা কিনিয়া বাহিরে আসিল। রসিক ধার পরীক্ষা করিয়া কহিল—ধার ত তেমন নেই, বালি দিতে হবে, চল্ চর থেকে বালি দিয়ে আনি।

একখানা বাঁশের বাখারী সংগ্রহ করিয়া রসিক চরের বালি কুড়াইয়া নিবিষ্ট মনে দায়ে ধার দিতেছিল।

ধার হইয়াছে অনুমান করিয়া সে কহিল—ছাখ গুরো এক কোপে হবে ত?

গুরুচরণ ধার পরীক্ষা করিয়া কহিল—আর একটু ডলো।

রসিক আবার ধার দিতে লাগিল। গুরুচরণ কহিল—খুন ক'রে কি হবে রসিকদা? একবার খুন ত আমরাই ক'রেছি, দু'বার না হয়—নাই ক'রলাম। তাকে এখানে পাঠিয়েছি ত আমরাই। দা যদি ঐ কাজে লাগাতে হয় তবে তোমার আমার গলায়ই লাগানো দরকার—ছিঃ ছিঃ কি ক'রলে রসিকদা?

রসিক কথাটা না বুঝিয়াই কহিল—ওর কথা ভেবে যে থাকা যায় না।

—কিন্তু যা দেখেছ তা ত আর ভুলতে পার না। আর তার জন্যে আমরাই ত দায়ী—যাবার দিনে ও বলেছিল—তোমাদের গ্রামখানিকে কত ভালই বেসেছিলাম।

রসিক ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল—যদি আমি না মারতাম! কেন মারলাম, ঘরের বৌ ত আর নয়। ওকে বিয়ে ক'রে যদি এক ঘরে হ'য়েও থাকতাম তবে ত এ দেখ্‌তে হ'ত না।

দুইজনেই বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তার পর গুরুচরণ কহিল—চলো রসিকদা বাড়ী যাই।

—চল্।

পরদিন অপরাহ্নে গুরুচরণ নূতন দা খানা দিয়া কি যেন কাটিতেছিল। দিগম্বরী পিছনে দাঁড়াইয়া কহিল—বঁটি আন্‌তে বলেছিলাম তা আন্‌তে পারলে না। সাতখানা দা থাকতে আর একখানা দিয়ে কি হবে? সংসারের কাজ ত আর কাজ নয়।

গুরুচরণের ছেলে একখানা ভাঙ্গা কাটারী লইয়া উঠানে গর্ত্ত করিতেছিল। গুরুচরণ তাহাকে দেখাইয়া কহিল—তোমার ছেলের জন্যে কি আর দা থাক্‌বার যো আছে—সব ক'খানায় বুক ফেলে দিয়েছে।

—হ্যাঁ, ও বুক ফেলেছে কি না!

—না, কে ফেল্‌লে? সস্তা পেলাম তাই—নিয়ে এলাম।

—বঁটি বুঝি খুব আক্কারা?

গুরুচরণ হাসিয়া কহিল—বঁটি ত আছে, তোমার ছেলের জন্যে দা ত থাকে না।

দিগম্বরী কটাক্ষ করিয়া কহিল—আমার ছেলের জন্যে, না তোমার ছেলের জন্যে? আমার ছেলে হ'লে ও দা ধরতেই পারতো না।

গুরুচরণ মুখ ভেংচাইয়া কহিল—তুই যেমন, তোর ছেলেও ত তেমনি হবে।

দিগম্বরী হাসিয়া কহিল—বাপকা বেটা, বড় লক্ষ্মী রে। ভাগ্যি কুসুম গাঁয়ে নেই।

গুরুচরণ দিগম্বরীর পরিহাসে ম্লান হাসিয়া পরাজয় স্বীকার করিল।

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা